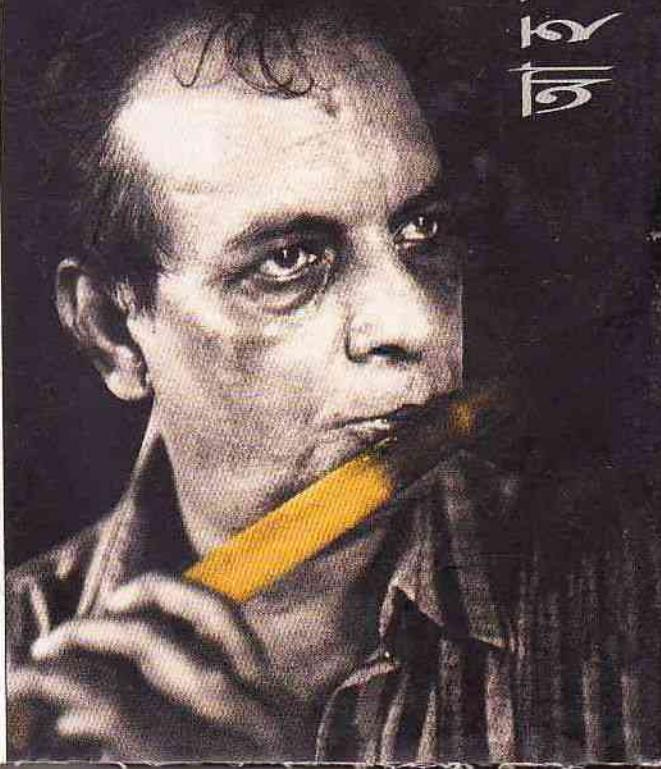


মেহত বিপ্লব ১৯৭১

সলিমুল্লাহ খান
সম্পাদিত



আইন চৰা মহাকুর জানা

বিহাত বিপ্লব ১৯৭১

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অপর নাম ১৯৭১। এই যুদ্ধের খোদ নায়ক এই দেশেরই পামর জাতি বা জনগণ। অন্য কেহ ইহার নায়ক হয়েন না— বলিয়াছেন আহমদ ছফা। সলিমুল্লাহ খান এই প্রস্তাবকেই ‘আহমদ ছফার প্রথম উপপাদ্য’ নাম দিয়াছেন।

কৃষি বিপ্লবের লেনিন, চিনের মাও জেদৎ, কুবার চে গেভারা কিংবা আলজিরিয়ার ফ্রান্সেস ফান্নোর মতন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কোন বড় তত্ত্বকার ফলাফল নাই। ফলনের মধ্যে সবেধন আহমদ ছফা। এই পামর জাতির মন তিনি যতখানি ধরিতে পারিয়াছেন আর কেহ তত্ত্বান্তি পারিয়াছেন কিনা সংশয়ের কারণ আছে।

এই দেশের মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর বিচার করিয়া আহমদ ছফা ১৯৭৭ সালে যে প্রস্তাব প্রচার করিয়াছিলেন আহমদ ছফা মহাফেজখানা প্রথম খণ্ডের প্রধান সম্পদ তাহাই। প্রবন্ধটি হারাইয়া যাইতে বসিয়াছিল। এইখানে প্রায়লুণ্ঠ সম্পদ পুনরুদ্ধার করা হইল।

আহমদ ছফার উপপাদ্য অনুসারে ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাহে নাই। কারণ তাহাদের ভয় ছিল এই দেশের স্বাধীনতা এই দেশের নিপীড়িত সংখ্যাগুরু জাতি-বিজাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের সম্মুখে উদাহরণ হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হইবার তিনি যুগ পরও এই দেশ যে আপনকার পাদুকা পরিয়া দাঁড়াইবার পারিল না তাহার কারণ এই দেশের মুক্তিযুদ্ধের ফল অপরে আত্মসাং করিয়াছে। বিপ্লব বেহাত হইয়াছে। তাই ১৯৭১ সালের অপর নাম দাঁড়াইতেছে বেহাত বিপ্লব।

ইতালিদেশের তত্ত্বকার আঙ্গনিয়ো গ্রামসির প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯৭১ সালের বিচার সম্ভবত এই প্রথম।

সলিমুল্লাহ খান সম্পাদিত

আহমদ ছফা মহাফেজখানা ॥ প্রথম খণ্ড

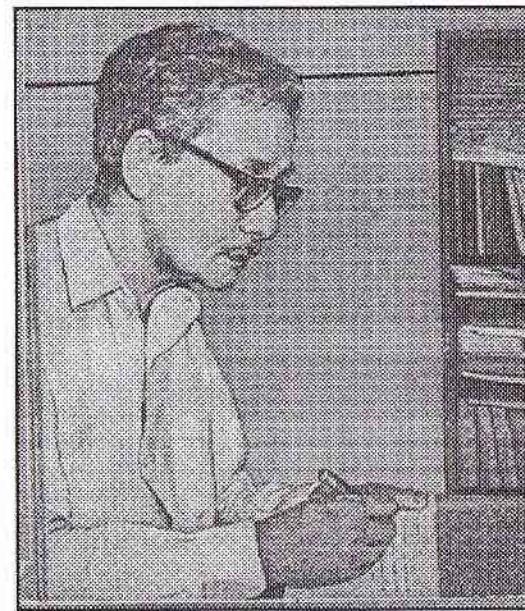
বেহাত বিপ্লব ১৯৭১



অদ্যেষা

অদ্যেষা প্রকাশন
এশীয় শিল্প ও সংস্কৃতি সভা

উৎসর্গ



সলিমুল্লাহ খান
সম্পাদক

জাহিরুল ইসলাম কচি
বিধান রিপোর্ট
আবুল খয়ের মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান
যুগ্ম সম্পাদক

শুমান আরেফিন
সম্পাদনা সহকারী

যোবারক হোসেন শিটন
ঝড়দ

হেরা প্রিন্টার্স
৩০/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, সৃতাপুর, ঢাকা ১০০০
মুদ্রাকর

মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন
অবেষ্য প্রকাশন
৯ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
annesha_prokashon@yahoo.com
ঝকাশক

ফাল্গুন ১৪১৩ ॥ ফেব্রুয়ারি ২০০৭
প্রথম প্রকাশ

লেখক অথবা উন্নতাধিকারীগণ
©

Behat Biplob 1971
Ahmad Sofa Mahafejkhana, Volume 1
Edited by Salimullah Khan
Phalgun 1413 BE February 2007
PRINTED IN BANGLADESH

984-32-2545-7
ISBN

মূল্য ১২০০ টাকা

মুক্তির গান

সলিমুল্লাহ খান

যে যুদ্ধ করেছিল সে মুক্তিযোদ্ধা
যে যুদ্ধ করে নাই সেও মুক্তিযোদ্ধা

ওসমানির কাগজ পেয়েছিল যে সে মুক্তিযোদ্ধা
যে সই দিয়েছিল নিজের কাগজে সেও মুক্তিযোদ্ধা

যে ভেবেছিল যুদ্ধ হবে দীর্ঘস্থায়ী সে মুক্তিযোদ্ধা
আমেরিকা এসে যাবে ধরে নিয়েছিল যে সেও মুক্তিযোদ্ধা

এক পাও উড়ে গেছে যার কামালপুরে সে মুক্তিযোদ্ধা
খণ্ডের গলায় কথেছে ফাসির রজ্জু যে সেও মুক্তিযোদ্ধা

নয় মাস দৈনিক লিখেছে পাকিস্তানে যে সে মুক্তিযোদ্ধা
রায়ের বাজার গড়ে লাশের পরে লাশ ফেলেছে যে সেও মুক্তিযোদ্ধা

গুনি বাংলাদেশ (ব্রিটিশ) তামাক কোম্পানি
সিঙ্গার সেলাইকল সত্ত্ব গুনি বিশ্বব্যাংক সেও মুক্তিযোদ্ধা

একদিন নিশ্চয় শুনব জেনারেল এহিয়া
ছিল ছদ্মবেশে সেও মুক্তিযোদ্ধা

আমি আর বিস্মিত হব না

সৃষ্টিপত্র

প্রার্থনা

অবেশিকা

১
১৮

বেহাত বিপ্লব ১৯৭১

- | | | |
|---|--|-----|
| ১ | একাত্তর: মহাসিঙ্গুর ক঳োল
আহমদ ছফা | ২৫ |
| ২ | ছফাচন্দিকা: বেহাত বিপ্লব ১৯৭১
সলিমুল্লাহ খান | ৪২ |
| ৩ | বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা
আহমদ ছফা | ৮৯ |
| ৪ | ডাক দিয়ে যায়: ২৩ অক্টোবর ১৯৭১
নূর মোহাম্মদ | ১৪০ |
| ৫ | বাঙালি জাতি, বাঙালি মুসলমান, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশ
সৈয়দ আবুল মকসুদ | ১৫৭ |
| ৬ | রাষ্ট্র ও বাসনা: আহমদ ছফা'র 'বিষাদ-সিঙ্কু'
সলিমুল্লাহ খান | ১৬৮ |

পরিষিষ্ঠ

- | | | |
|---|--|-----|
| ৭ | Glories and Ignominies:
<i>On Strategies of the Bangladesh Liberation War 1971</i>
Salimullah Khan | ১৮৫ |
|---|--|-----|

প্রার্থনা

সলিমুল্লাহ খান

কোন কোন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এই বহির নাম আহমদ ছফা মহাফেজখানা হইল
কেন। 'মহাফেজখানা' পদখানি কি আমরা চাপাইয়া দিতেছি না? ইহার উন্নত কী
আমাদের জানা নাই। তবে আরেক প্রশ্ন তোলা যাইতে পারে।

ইংরাজ 'আকাইভস' কিংবা সৎসৃত 'অভিলেখ্যাগার' শব্দেও হয়তো একই কাজ
চলিত, তবে একই লাভ হইত কিনা নিশ্চিত হইতে পারিতেছি না। শুন্ধ বলিব কথাটি
উঠাইয়া দেওনের দরকার কী? 'মহাফেজখানা' কথাটি বাংলার চলিতেছে কয়েক শত
বৎসর হইল। ইহা কি সত্য নহে? সকলেই জানেন বাঙালা মূলুকে কয়েক ঘর মুসলমান
বাস করিতেছে কয়েকশত বৎসর হইল। হয়তো উহাদেরই অঙ্গীয় কয়েকটি 'বিদেশি'
শব্দ দেশি ভাষায় চলিতেছে। এই ফতোয়ায় দোষের কী আছে?

১

আহমদ ছফা দেহ রাখিয়াছেন আজ দেখিতে দেখিতে পাঁচ বৎসরের উপর। আমরা—
মানে তাঁহার কয়েকজন লঘু—তাঁহাকে আমাদের শিক্ষক গণ্য করিতাম। তবে হলপ
করিয়া বলিতে পারিব না আমাদিগকে তিনি কতখানি তাঁহার ছাত্র গণিতেন। তাঁহার
দক্ষিণা আদায় করিব হেন ধৃষ্টভা আমাদিগের কোনদিনই হয় নাই। স্থীকার করিতে
দোষ নাই—একবার কি দুইবার সাহস হইয়াছিল তাঁহার কর্জ স্থীকার করি। আহমদ
ছফার জীবনের বাতি যখন নিবিয়া যায় যায় তখন একবার ইচ্ছা করিয়াছিল এক বালাম
বই ছাপাইয়া গুরুসংবর্ধনা করি। আমরা ভাবিলাম এক আর পরম প্রভু করিলেন আর।

মা বৈ, একথে আহমদ ছফা মহাফেজখানা বাহির হইতেছে। দুঃখের মধ্যে,
সংবর্ধনা আকারে নহে নিতান্ত শ্রাদ্ধস্বরূপ। পাঁচ বৎসর পরে এবং খণ্ডে খণ্ডে। এতদ্বিস
বিলম্বের জনক শুন্ধ কাল আর দেশ নহে, আমাদের ভাগ্যও হয়তো কিয়ৎ পরিমাণ

দায়ী। সন্তুষ্ট হইলে এই গ্রন্থের অপরাপর বালামও আলোকের মুখ দেখিবে। আজ ওয়াদা দেওন সন্তুষ্টবপর হইতেছে না।

মহাফেজখানা'র মতলব সামান্য। শুন্দি আহমদ ছফার অ বা আধ প্রচারিত লেখা প্রকাশ তাহার মধ্যে এক নম্বর। দুই নম্বরে তাঁহার লেখা সমস্কে আলোচনার ঠাঁই। তিনি যেই সকল বিষয়ে দুর্ভাবনা করিতেন সেই সকল বিষয়ে লেখাশোনা থাকিবে তিনি নম্বরে।

হাতের বালামের বিষয় ১৯৭১। যে কোন বিচারেই ১৯৭১ বাংলাদেশের ইতিহাসে বড় ঘটনা। এই ঘটনা আমদের ইতিহাসের গড় করখানি বদলাইতে পারিল সেই প্রশ্ন উঠিবে। অস্তত আহমদ ছফা উঠাইয়াছেন। আজিকালি যেই ভূখণ্ডকে দক্ষিণ এশিয়া বলা হইতেছে আহমদ ছফার বিচারে সেই খণ্ডের অধীমাংসিত জাতিসমস্যা সমাধানের 'সিসিম খোল' আওয়াজ বাংলাদেশের মুক্তিযুক্ত।

বাংলাদেশে জাতিরট্রি প্রতিষ্ঠার উদাহরণ যদি সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া মহাদেশ আমলে লয় তবেই না এই মহাদেশের জাতিসমস্যার উত্তম রাহ হয়। দক্ষিণ এশিয়ার দুর্ধর্ষতম রাষ্ট্র ভারত ইউনিয়ন তাহা মানিবে কেন? খুব সন্তুষ্ট এই কারণেই আজ পর্যন্ত ইতিহাসের গড় যেই আলোকে ছিল সেই আলোকেই রহিয়া গেল। পাকিস্তান থাকিল পাকিস্তান। আর বাংলাদেশও যাত্রা করিল আরেক পাকিস্তান অভিমুখে। এই যাত্রায়, বলিয়া রাখা ভাল, আমাদিগের সায় নাই। সহি বাংলাদেশনামা ইহা হইতে পারে না। বাংলাদেশের উত্তর কী? এই সওয়ালের জওয়াবস্থরূপ ভারত বলিতেছে: বাংলাদেশের উত্তরে উত্তর নাই। বলিতেছে উত্তরে আহোম, মেঘালয়, অরুণাচল, কাশ্মীর কি সিকিম, তিব্বত কি মণিপুর মনে করা ভুল। আহমদ ছফা বলিয়াছেন: না, বাংলাদেশের উত্তরে উত্তর রহিয়াছে। যেমন ভারতের দক্ষিণেও রহিয়াছে দক্ষিণ।

নাই ও আছের এই বিবাদ ভঙ্গইবার সাধ্য কাহার! মহাভারতের হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তানবাদীগণ কহিতেছেন বাংলাদেশ বাংলাদেশ নহে, আরেক টুকরা পাকিস্তান মাত্র। ভারত হইতে এই দুই দেশের আলাদা থাকিবার একমাত্র কারণ এসলাম। আহমদ ছফা কহিতেছেন: ইহা সত্য নহে। মণিপুরের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম। অহোম, মিজোরাম বা নাগাদেশ ভারতবর্ষ হইতে আলাদা থাকিতে চাহে তো চাহিবে কি হিন্দু, শুন্দি বা নাসারাধর্মের গুণে, নাকি অন্য কোন (বাসনা) পূরণে? জাতিতে জাতিতে ন্যায়বিচারের লড়াই কোন বছর কোন মাস কত তারিখে শেষ হইবে কেহই জানে না।

মহাআ আহমদ ছফা আশঙ্কা করিতেন বাংলাদেশের যথা (১৯৭১) আর সকলকেও তথ্য লইয়া যাইবে। নাবালক বালকও জানে ভারতের সকল ছেট জাতিকে এসলামি শিরনির দাওয়াত দিয়া তথ্য নেওন যাইবে না। কাজেকাজেই ইসলামের ছুতা দিয়া কাশ্মীর-দমন সন্তুষ্ট হইলেও হইতে পারে, তামিল-দমন চলিবে না। জাতির যাত্রার ধরনি—বাংলাদেশ বলিতেছে—গুণিতে কি পাও?

সেই ১৯৭৭ আমলেই, আগেই বলিয়াছি, বাংলাদেশ আরেক পাকিস্তান অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। আহমদ ছফা এই বঙ্গীয় পাক্যাত্মার রেখাচিত্র আঁকিয়াছিলেন। সদেহ

হয় তদ্বিচিত বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা দেখিবেন। ইহা বর্তমান খণ্ডের প্রধান প্রবন্ধ।

শ্মর্বৰ্ব্য এই প্রবন্ধ তিরিশ বৎসর আগের। বর্তমানখণ্ডে স্থাপিত আর সকল রচনাও বিগত তিরিশ বছরেরই ফসল। আজিকালি অবশ্য ফসল হানে 'উৎপাদ' বলিবার রীতি চলিতেছে। আহমদ ছফার উৎপাদের কথা বলিবার উদ্দেশ্যে আমি গত বৎসর পত্রিকা ও সাময়িকপত্রে তিনটি প্রবন্ধ ছাপাইয়াছিলাম। সেই তিনি প্রবন্ধের সমাহার বর্তমান খণ্ডে 'ছফাচন্দ্রিকা' নাম ধারণ করিল। ছফা মনে করিতেন ১৯৭১ বাংলাদেশের ইতিহাসে হাজার বৎসরের জরার বদন ছাড়িয়া দিয়াছে। ভাবনাটি এক, তাহার ফলাফল অন্য। অর্থাৎ আমরা ভাবিলাম 'সমাজ-বিপ্লব' আর পরম প্রভু করিলেন 'গঙ্গোল'। এখন ইহার নাম 'বিশ্বায়ন'। এই জাতীয় ঘটনাকেই ইতালির মহাআ আন্তিমিয়ো গ্রামসি ডাকেন 'বেহাত বিপ্লব' নামে।

আহমদ ছফার অপর লেখা 'একান্তর: মহাসিদ্ধুর কঠোল' রচিত হয় ১৩৯৯ মৌতাবেক ১৯৯৩ ইংরাজি সালে। এই প্রবন্ধ ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিকে ছাপা হওলের পর মনে হইয়াছিল যেন বোলতার চাকে চিল পড়িয়াছে। কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী পত্রিকায় চিঠি লিখিয়া বিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদিগের বিবাদ ছিল অন্দের হস্তির্দশনের মতন। অথচ ছফা দাবি করিয়াছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুক্ত ছিল অনুচ্ছা। তাহার কোন নায়ক ছিল না। এই বা সেই বুদ্ধিজীবী, এই বা সেই নেতা, এই বা সেই সিপাহসালার মুক্তিযুদ্ধের সূত্রপাত করিয়াছিলেন বলিয়া রাষ্ট্রের হাতে যেই বোলেবোলা তাহা সেরেফ বিজ্ঞাপন, খাঁটি মিথলজি। সহি ছফানামা অনুসারে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-প্রসূতি মুক্তিযুদ্ধের আচার করিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী ২৫ মার্চ ১৯৭১ দিবাগত রাতে। তবে সেই আচারের শেষবিচার বাংলাদেশের জনগণ জাতিগঠনের মধ্য দিয়াই হয়তো করিবে। ইহা এখনো দেখিবার বিষয়।

কেহ কেহ প্রচার করিতেছেন, ১৯৭১ ছিল নিছক সিপাহি মুদ্দের বৎসর। কেহ কেহ বলিতেছেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র সকল মিত্রবাহিনীর আত্মাগ়। প্রচারসংখ্যার চূড়ায় উঠিয়াছেন এমন কোন কোন প্রচারকর্তা জানাইতেছেন মুদ্রণ (আমেরিকা ও এয়ুরোপ) প্রবাসী কূটনীতিক কিংবা বিদেশি বঙ্গবন্ধুদিগের (যথা আর্চার ব্রাড, র্জে হ্যারিসন প্রমুখ) দান। আহমদ ছফার ধারণা বাংলাদেশের মুক্তিযুক্ত এই জাতির জাতীয় আন্তিমিয়োল লড়াই। ইহার কর্তা আর কেহ নহে, স্বয়ং জনগণ। সত্য কী একমাত্র আল্পাহতায়ালাই ওয়াকেবহাল। আমরা কেবল দেখিতেছি মুক্তিযুক্ত লইয়া বিচার শুরু হইয়াছে। উপসর্গযোগে মনে হয় আহমদ ছফার ১৯৭১ বিচার ইহাদের কাহারো মনঃপূত হইতেছে না।

বর্তমান গ্রন্থের অন্যতর প্রধান লেখা মহাআ নূর মোহাম্মদের 'ডাক দিয়ে যায়: ২৩ অক্টোবর ১৯৭১'। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে এই দেশের চিনপঞ্চি কমিউনিস্টগণ (বিরোধীর যাহাদিগকে 'মাওবাদী' বলিয়া থাকেন) শরিক হন নাই বলিয়া প্রচার আছে। তবে এই প্রচার প্রচারই। নূর মোহাম্মদের লেখা পড়িলে প্রচার ও সত্য যে ষেল আন এক নয় সেই সত্য মাথাচাড়া দিয়া উঠিবে। এই শরিফ লেখাটির আশু উপদেশ ১৯৭১

সনের যুদ্ধে শহীদ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতিপূরণ। আমাদিগের বিচারে ইহার তাৎপর্য স্মৃতির অধিক। পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ওরফে এম.এল.) এই যোদ্ধারা জনগণতাত্ত্বিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ওয়াদা করিয়াছিলেন। নূর মোহাম্মদ সেই সত্য স্বরণ করিয়াছেন। উল্লেখ করা যাইতে পারে মহাআ নূর মোহাম্মদ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির (এম.এল.) যশোহর জেলা শাখার কমরেড এবং নাতিশুদ্র এই রাজনৈতিক দলগঠিত জাতীয় সামরিক কমিশনের আহ্বায়ক ছিলেন।

কমরেড নূর মোহাম্মদের লেখাটি ছাপা হইয়াছিল ১৯৯৫ সালে, যশোহর হইতে প্রকাশিত একটি সঙ্কলনে। বর্তমান সংস্করণের জন্য তিনি অনুগ্রহ করিয়া একটি নতুন ভূমিকা সংযোজন করিয়াছেন। ইহাতে লেখাটির উদ্বৃত্ত মূল্য আরো উদ্বৃত্ত হইল।

আমাদের আরেক সঙ্গে মনীষী সৈয়দ আবুল মকসুদের প্রবন্ধ ‘বাঙালি জাতি, বাঙালি মুসলমান, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশ’। ইহা তৎপ্রদত্ত ২০০৩ সালীন ‘আবু জাফর শামসুদ্দীন স্মারক বক্তৃতা’। মহাআ সৈয়দ আবুল মকসুদ মনে করেন ১৯৭১ বাঙালি জনগণের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ ঘটনা। দেখিতে পাই আহমদ ছফার মতন তিনিও ‘জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার’ অর্থে কথনে কথনে ‘জাতীয়তাবাদ’ কথাটি এন্টেমাল করিতেছেন। ইহাতে অপ্রস্তু ভুল বোাবুবির সুযোগ তৈরি হয়। কারণ ‘জাতীয়তাবাদ’ শব্দ আত্মনিয়ন্ত্রণের মতবাদই নহে, ছেট ছেট জাতির উপর বড় বড় জাতির পাণিপীড়ণের হতিয়ারও বটে। বক্তৃতাটি এই বহিতে ছাপাইবার এজাজত দান করিয়া সৈয়দ আবুল মকসুদ আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিলেন।

মৎপ্রণীত ‘রাষ্ট্র’ ও বাসনা: আহমদ ছফার বিষাদ-সিদ্ধু^১ লেখাটির ইতিহাসও কম বিষদের নহে। আহমদ ছফা যেই দিবস পরলোকযাত্রা করিলেন ইহা ছাপা হইয়াছিল তাহার পূর্বদিবস মানে ২৭ জুলাই ২০০১ তারিখে। সেই দিন গুরুবার ছিল। শুনিয়াছি, কাহারো মুখ হইতে এই লেখাটির পাঠ তিনি শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। ইহাই সাম্মত।

২

আহমদ ছফার তাৎপর্য আমাদের কাল সম্যক ঠাহর করিয়াছে বলিতে পারিতেছি না। তাহার তিরোভাব-সংবাদ কাগজে ছাপা হইয়াছিল অপ্রধান স্তরে—ইহা আমাদের নজর এড়ায় নাই। বলিব না এই দোষ শুন্দ আমাদের দেশের। ইংল্যন্ডের প্রধান কবি বলিয়া আজ যাঁহার নামে রটনা সেই শেকসপিয়র মরিলেন ইংরাজি ১৬১৬ সালের কোন এক দিন। সেই দিন এয়রোপে তাহার নামে কোন শোকসভা হইয়াছিল কি? সম্ভুদ্ধপারে কেহ তাঁহার নাম শুনিয়াছিলেন কিনা কহা কঠিন। মরণের একশত বৎসর পরও এই সামান্যবস্তুর ব্যয়-পরিবর্তন বিশেষ হয় নাই।

শেকসপিয়রের যুগে এয়রোপে হর্তাকর্তা বিধাতাগণ সকলেই লিখিতেন লাভিন ভাষায়। উহাই ছিল বিধিলিপি। শেকসপিয়রের লেখা বিধাতাদিগের নাকের নিচে পড়িয়া গিয়াছিল, চোখে পড়ে নাই। এই অবস্থা উনবিংশ শতকিয়া অবধি বাহাল ছিল। ততদিনে ‘সাহিত্য’ বলিয়া এক বস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে। আবিষ্কারক ইংল্যন্ড নহে, নবীন রোমান্টিক জার্মানি। সেই আবিষ্ক্রিয়ারই সেরেভিপিটি বা চরণঘীপ্যরূপ আমাদের সুপরিচিত মহাআ শেকসপিয়র জন্মস্থান করিলেন।

শেকসপিয়রকে রিয়ালবাদী (মানে বাস্তববাদী) বলাৰ একটি রেওয়াজ চালু আছে। ইহাও উনবিংশ শতকিয়া পণ্ডিতগণের কীর্তি। শেকসপিয়র যাহা লিখিতেছিলেন তাহা মোটেও চিরস্তন কিংবা বিশ্বসাহিত্য ভান করিয়া লিখিতেছিলেন না। অস্তত হলপ করিয়া এই কথা বলা চলিবে না। তবে নিশ্চয় বলা চলিবে এইসব কথা চালু হইয়াছে পশ্চিম এয়রোপে আধুনিক জন্মান প্রতিষ্ঠিত হইবার পর। কারণ এই জন্মান নিজেই নিজের ফসল। মহাআ হেগেল বলেন যেই ফসল নিজেই নিজের কৃষক তাহাকেই ‘ইতিহাস’ বলে। তাহাতে কী? সত্য তো গোপন রাখিতে হইবে। জাক লাক্কা এই কথাই অন্য ভাষায় প্রকাশ করেন: সত্য সচরাচর হাজিৱা দেয় মিথ্যার আলখাল্লা গায়ে। চিরস্তন মানবতা বা বিশ্বসাহিত্য প্রভৃতি কথার শান ইহা ছাড়া আর কী!১

ভাষা ও নাহিত্যের নিয়তিই এই বকম। আজিকালি ইংরাজির যেই রাজত্ব তাহার আগে এয়রোপখনে একদা ফরাসির, দ্বিতীয়দা স্পেনির, তৃতীয়দা ইতালির আধিপত্য কায়েম-মোকাম ছিল। এয়রোপের একনম্বর ভাষা ইতালির তোসকানা (Toscana) এলাকায় গড়িয়া দাঁড়াইল সুসাবি চতুর্বিংশ শতকিয়ার গোড়ায়। এই নতুন ভাষারই লেখক মহাআ দান্তে। তিনি মরিলেন ১৩২৯ সনে। দান্তে নিজেকে এয়রোপের ওমেরোস, ওভিদ, লুকিয়ান, হোরেস ও ভার্জিল—এই পাঁচ পুরানা কবির পঞ্জক্ষণ্যায়ি দোসর মনে করিতেন। নিজের সম্পর্কে যেই ধারণা তিনি পোষণ করিতেন তাহা এক্ষণে দুইশত বৎসর মতন হইল সত্য মনে হইতেছে। কিন্তু জীবন্দশ্য দান্তে কি এই স্থীরুত্বির চাঁদ হাতে পাইয়াছিলেন?

^১ ‘To the poets and playwrights trained in Latin, the ‘universal tongue’ of their time, Shakespeare’s work was beneath consideration. It continued to be ignored until the nineteenth century, when the German Romantic movement discovered Shakespeare along with ‘literature’. It was at this juncture that the image of Shakespeare—individual of genius, self-conscious artist, poet at once realist and romantic—was born. But Shakespeare’s drama was quite different from realism; ... Shakespeare was not a realist, and he was not attempting to represent what was ‘human’. When the notion of universality was established in nineteenth-century Europe, its own historicity had to be concealed. (Kojin 1993: 13)

^২ Petrarch and Boccaccio are not on a par with him, they are on a far lower plane. (Curtius 1953: 595)

যেই বৎসর তিনি মরেন সেই ১৩২৯ সনে রোম শহরে তাঁহার বড় কেতাব পোড়ানো হয়। খ্রিস্টান ধর্মসভা ও ধর্মপিতার সমালোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বিশেষ বই নিয়ন্ত হয়। দান্তে বলিতেন, নিকারি সাধু পাথর ওরফে সেন্ট পিটারের ওয়ারিশানের কর্তব্য সাধু পাথর সাহেবের পদাক অনুসরণপূর্বক গরিবির গলায় বরমাল্য প্রদান।

বিগত এক হাজার বৎসর ধরিয়া খ্রিস্টান দুনিয়া ভুল পথে ইঁটিতেছে—এই বাণী প্রচারের দোষে তাঁহার নিকুঠি হইল। কিন্তু আজিকালি এই কথা প্রমাণ করিতে আমাকে কেতাব দেখাইতে হইবে। বরফ সহজে গলিবে না। দান্তে এখন দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ খ্রিস্টান কবি। নহিলে টমাস স্টর্ন এলিয়ট প্রভৃতি নব্য-নাসারা কবি তাঁহার হিসাববাবদ এত কাহিনী খরচ করিবেন কেন?

দেশমাত্কা ফ্রেনেপকে ছাড়িয়াও কথা বলেন নাই দান্তে। তবে তাঁহার অগ্রস্যত্বার পর দেশমাত্কা আপনকার ভুল বুঝিতে পারিয়াছিল। দান্তের মূল্য নিরূপণ করিবার গুরুত্বার চাপানো হয় ডেকামেরন ওরফে দশদিবস নামক জগদ্ধিক্ষ্যাত কেতাবের লেখক মহামতি বোকাচিয়োর কক্ষে। তিনি দান্তের জবানের তারিফ করিলেন। বাকিটুকু বুঝিলেন না। ইসা নবীর পঞ্চদশ শত বৎসর পর লোকে বলাবলি করিতে থাকিল তোসকানা ভাষায় তিনি বড় কবি—দান্তে, পেত্রার্ক ও বোকাচিয়ো।

আমাদের যুগের বা বিগত শতকের অধ্যাপকমণ্ডলি এই কথায় হাসাহাসি করিতেছেন। তাঁহারা ভাবিতেছেন কোথায় আদিনাথের পাহাড়! জার্মান প্রতিত কার্টিবস বলিয়াছেন: পেত্রার্ক ও বোকাচিয়ো মোটেও দান্তের সমতুল্য নহেন, তাঁহাদের জায়গা তো নিচের তলায়, অনেক নিচে।^১

পরের যুগের লোকজন দান্তেকে আরো ছোট করিয়া দেখিতে থাকেন। ইসাবি ১৮০০ নাগাদ তাঁহার নাম লোকের ভূলিয়া যাইবার দশা। ইতালিতে ‘একরন্ত্র একদেশ’ বা জাতীয় (রিসার্জিমেন্ট) আন্দোলনের সময় শেষমেয়ে দান্তের নাম আরেকবার জাহের হইতে শুরু করিল। তাঁহাকে বলা হইল ইতালির শ্রেষ্ঠ একতাসাধক। এখন—মানে গত শতকিয়া ধরিয়া বলিতেছি—তাঁহাকে বলা হইতেছে এযুরোপখণ্ডের একতাসঙ্গীবনী সুরা।

একই কথা বলা যাইবে জার্মান মহাআ কবিগুরু গ্যেটে প্রসঙ্গেও। গ্যেটের আড়াই শত বৎসর ভরিবার বৎসর—অর্থাৎ ১৯৯৯ সালে—নানান সভা ও সম্মিলনী তাঁহাকে এযুরোপের ঐক্যপথিক বলিয়া ডাকিয়াছে। অথচ গ্যেটে ভাবিতেন তিনি একাধারে জার্মানির, অন্যাধারে জগৎসভার কবি। দুনিয়া জয় না করা পর্যন্ত তিনি থামিবেন কেন? তিনি বলিতেন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বলিয়া কিছু নাই—সকলের মালিক স্বয়ং আল্লাহ! কালিদাস পড়ুয়া আর হাফিজ পাঠক গ্যেটেজি এই প্রাচ্য কবি মহাআদিগের সমজদারি করিতেন শুন্দি কি লোক দেখাইতে? ‘তুফান’ নাট-কবিতায় শেকসপিয়ারের মিরান্দাদেবী যাহা কহিতেছেন তাহা কি গ্যেটের কথাও নহে?

O Wonder!
How many goodly creatures are there here!
How beauteous mankind is! O brave new world
That has such people in't!

—Shakespeare (1988: *Tempest*, Act 1, Scene 5, ll. 184-187)

বাংলা তর্জমায়:

হে বিস্ময়!
কিমার্চর্যম প্রাণের বিহার এইখানে!
কী সুন্দর এই মানবের জাত! নির্ভর্য হে নবীন দুনিয়া!
এমন জাতের ঠাই তাঁহার ভিটায়!

পাঠক ভবিতে পারেন খ্যাতির এই বিধি কি শুন্দি এযুরোপীয় সংস্কার? আমি চিনা ভাষায় নিরক্ষর বট। সেই দিন ঘটনাচক্রে ভারতীয় বটতলার ইংরাজিসিন্দ কবি বিক্রম শ্রেষ্ঠ মহাশয়ের লেখা একখানা ছোট চিনা বহির তর্জমা পড়িতেছিলাম। দেখি শ্রীমেষ্টও একই কাহিনী লিখিয়াছেন। তাঁহার অনুদিত তিনি কবির এক কবির নাম দু ফু। মহাআ ধরিয়াছিলেন ইসাবি ৭৭০ সনে। মরণের দুই আড়াই শত বৎসর পর অবধি তাঁহার কবিতা কোথাও কোন সকলনে কলিত হয় নাই। (শ্রেষ্ঠ ১৯৯২: xxii)

সকলনে ছাপা না হওনের মানে বারবার মরা। কী কারণে জানি ১০০০ সনের দিকে হাওয়া ফিরিল। তিনি বাঁচিলেন। আজো সেই পুরাল হাওয়া বহিতেছে। আজিকালি সকলেই জানেন মহাআ দু ফু চিনা ভাষার একজন সর্দার কবি। নহিলে কেন তিনি বিক্রম শেষের হাতে পড়িবেন? ঐ দেশের জগদ্ধিক্ষ্যাত কয়েকগুলি সেরা কবির এক সেরা দু ফু। তাঁহার পদসংহিতার এক পদ চিপিয়া দেখা যাউক।

Thoughts while Travelling at Night

Light breeze on the fine grass.
I stand alone at the mast.
Stars lean on the vast wild plain.
Moon bobs in the Great river's spate.
Letters have brought no fame.
Office? Too old to obtain.
Drifting, what am I like?
A gull between earth and sky.

—Seth (1992: 35)

বাংলা তর্জমায়:

সফরি রাতের জারি

নরম ঘাস ঢাকে মন্দমধুর হাওয়া
হল ধরে বসে আছি একা।
আলিশান জঙ্গল প্রান্তেরে হেলানো তারা
মহানদরুকে টান উঠছে টান ডুবছে।
লেখাপড়া হল বেশ, নাম তো হল না
পন্টদ? আশার ছলন নাই, বয়স হয়েছে।
ভেসে আসি ভেসে যাই। কার ন্যায়?
জামিন ও আসমান টেনে গাঙচিন যায়।

৩

আহমদ ছফা বড় কবি এমন কথা তাঁহার বক্সবাদীর পর্যন্ত বলিবেন কিনা সংশয়ের কারণ আছে। আমরাও বিপ্লবী নাই। তবু ধারণা করি এমন একদিন আসিবে যেই দিন কেহ না কেহ ছফার মূল্য পরিমাপ করিবেন। ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইলে তাঁহার কিছু কিছু বচনা কালের প্রহার হইতে রফা পায়—অন্তত এই প্রত্যয় তো করিতেই হয়।

আমরা বিচারকের কেদারায় বসিয়া নাই। ঠাই আমাদের কাঠগড়ার। গত পঁয়তিরিশ বৎসর বাংলাদেশের রাজনীতির আকাশে অনেক লেখার তারকা উদিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কি জ্যেতিপ্রভায় কি ভাঁটায়পাড়ায় আহমদ ছফার সমান উজ্জ্বল দ্বিতীয় কেন নয়নতারা আজো দেখা দেয় নাই। এই কথা হল করিয়া বলিবার সাহস আমাদিগের নাই। শার্ধীন প্রাচীন চিনের আকাশে দু ফু নামক হলুদতারা যেই রকম, শুক্র বলিব, পরাবীন নবীন বাংলার ভাগ্যকাশে আহমদ ছফা নামক খয়েরি নক্ষত্রও তেমনই আলো বলমল হইয়া জুলিবেন। ইহাই প্রার্থনা। ইতি আদি।

১৯৭১ সনে আহমদ ছফা কলিকাতায় আশ্রয় পাইয়াছিলেন মহাত্মা কমরেড মুজফ্ফর আহমদের ডেরায়। সেই কথা তিনি আমাকে বহুবার বলিয়াছিলেন। ইনিই সেই মুজফ্ফর আহমদ যাঁহার সন্দীপের ভিটায় বসিয়া কাজী নজরুল ইসলাম 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি' কবিতাটি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। মীর মশাররফ হোসেনের পরকালীন বাঙালি মুসলমান সমাজে একমাত্র এই কাজী নজরুলকে ছাড়িয়া দিলে আহমদ ছফার সমান মনীষী আর জন্মায় নাই। আমি আমার এক প্রবক্ষে এই কথা আগেই বলিয়া রাখিয়াছি। ইহা হয়তো আমার অনুর্বর মগজের আগাছা কলনা, হয়তো নয়। কমরেড মুজফ্ফর আহমদও কি তাহা ঠাহার করিয়াছিলেন?

আহমদ ছফা মুক্তিযোদ্ধা। সবচেয়ে বড় কথা জনগণত্বের মুক্তিযোদ্ধা। কিন্তু শহীদ হইবার ভাগ্য তাঁহার হয় নাই। সুযোগ হয় নাই দেরাদুনে প্রশিক্ষণ লইবারও।

অল্পাতচক্র নামা উপন্যাসের নায়ক দানিয়েলের মতন স্রষ্টা আহমদ ছফাও ১৯৭১ সালীন মুক্তিযুদ্ধে হাজির হইয়াছিলেন হাতে একজোড়া খাতা-কলম আর কয়েক প্যাকেট চারমিলার লইয়া। ১৯৭১ সনের ২৮ জুলাই আহমদ ছফার জগতে বাংলাদেশ নামা একব্যানা বহি কলিকাতা হইতে প্রকাশ পায়। আর সেই ছফাই মরিলেন ঢাকায়, ২০০১ সনের একই দিনে। বলা বিস্প্রয়োজন: ইহা হয়তো কাকতালীয়।

মাঘ ১৪১৩

দোহাই

1. Karatani Kojin, *Origins of Modern Japanese Literature*, Brett de Bary, ed. (Durham: Duke University Press, 1993).
2. Ernst Robert Curtius, *European Literature and Latin Middle Ages*, Williard R. Trask, trans. (London: Routledge & Kegan Paul, 1953).
3. Vikram Seth, *Three Chinese Poets: Translations of Poems by Wang Wei, Li Bai and Du Fu* (London: Faber and Faber, 1992).
4. William Shakespeare, 'The Tempest,' in *The Oxford Shakespeare: The Complete Works*, Stanley Wells and Gary Taylor, eds. (Oxford: Clarendon Press, 1988).

চিহ্নিত করা হয়েছে। আর শেষ রচনাটি মুক্তিযুক্তের বর্ণনাত্ত্বর বিশ্লেষণ। রচনাটির ভাস্তু ইংরাজি বলেও ও সাদিকবোধে সঙ্গতি হল।

মুক্তিযুক্তের মধ্যে একটি সামাজিক বিপ্লব হতে হতেও হয়ে উঠল না। এই কথা সংক্ষিপ্ত রচনাগুলোতে এই কথা বাসবার মুরে ফিরে এসেছে। তাই আমাদের পফল বাস্তু চূড়ান্ত ইত্ব ১৯৭১: বেহাত বিপ্লব নামে।

প্রবেশিকা

আবুল খায়ের মোহাম্মদ জাতিকুজ্জামান

অনেকদিন থেকেই ‘আহমদ ছফা মহাফেজখানা’ নামে একটা হাতুমালা প্রকাশ করার কথা ভাবছিলাম—কিন্তু প্রথম ফুলটি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এমন সময়, বছরখনেক আগে, আহমদ ছফার হারাতে বসা বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা বইটির একটি পৃষ্ঠার সংক্ষরণের সন্ধান পাই আমরা। বইটির নকল হতে আসার পর আমাদের উভেজনা বেড়ে যায়। গাঁথা ওরুল জন্ম এর থেকে শুভ আর কী হতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা রাজনৈতিক জটিলতা আজো একই রকম ভরতাজা।

কেবল এই রচনা দিয়ে প্রথম বালাম প্রকাশের সিদ্ধান্তে কাজ শুরু হল। ছফার মৃত্যুবর্ষিকী এসে গেল। মহাফেজখানার সম্পাদক সলিমুল্লাহ খান ছফার লইটির পুনর্পাঠ প্রচার করলেন পত্রিকায়। রাজনৈতিক জটিলতার বক্তব্য এত বিস্তৃত ও সুগভীর যে এক প্রকারে সবটা প্রচার করা গেল না, লিখতে হল আরো দুটি প্রকার। এই প্রবন্ধগুলো নিয়ে মহাফেজখানার পয়লা বালামের বাড়ি বাড়ুল, নাম ঠিক হল ১৯৭১।

পথিমধ্যে সন্ধান পেলাম করলেও নূর মোহাম্মদের ডাক দিয়ে যায়’ এবং সৈয়দ আবুল মকসুদের ‘বাঙালি জাতি, বাঙালি মুসলিমান, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশ’ রচনা দৃঢ়ি। যুদ্ধকালে রঞ্জিত একজন কমিউনিস্টের বয়ানে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কমিউনিস্টদের ভাবনা দৃঢ়িচারণ আকারে হাজির করেছেন নূর মোহাম্মদ। সৈয়দ আবুল মকসুদ ১৯৭১ সালের ঝুঁকের মূল ভাবদর্শ বিষয়ে আপন মতামত প্রকাশ করেছিলেন। আহমদ ছফার চিত্তাভাবনার সঙ্গে তাঁর ভাবনার মিল খুবই উল্লেখ করার মতো ঘটনা। এই রচনা দৃঢ়িকে ১৯৭১ আলেচনায় বিদেশ মনে করে সঙ্গে নেয়া হল।

বালামের পূর্ণতার জন্ম খুঁজে বের করা হল মুক্তিযুক্তের ছফার বাস্তিগত অভিজ্ঞতার বয়ান ‘একাত্তর: মহাসিদ্ধুর কল্পল’ এবং সলিমুল্লাহ খানের ‘রাষ্ট্র ও বাসনা’ ও ‘গৌরব ও চজ্জ্বল: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কৌশল’ প্রসঙ্গে প্রবন্ধগুলো। ‘রাষ্ট্র ও বাসনা’য় ছফার মুক্তিযুদ্ধতত্ত্বিক দ্রোট উপন্যাস অগ্রতচ্ছ্রমায়ে বড় সহিতের নানান আলাদাত

১

বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতার প্রথম প্রকাশ দিগন্ত নামের একটি অনিয়মিত সাময়িকীতে। সম্পাদকের নাম কলিমদাদ খান। রচনাটি প্রথম এন্ট্রিক করে দিগন্ত প্রকাশনা, ১৯৭৮ সালে। বইটি উৎসর্গ করা হয় ফরহাদ ফজলার ও হারুনুর রশীদকে। ছফার বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও বাঙালী জাতি লইতে লেখাটি আবার ছাপা হয়। কিন্তু শেষ অধ্যায়টি বাদ পড়ে যায়। আমরা এখানে দিগন্ত প্রকাশনী সংস্করণেরই পূর্ণাঙ্গ পুনর্মুদ্রণ করছি। ‘একাত্তর: মহাসিদ্ধুর কল্পল’ পুনর্মুদ্রণ করা হচ্ছে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক প্রবন্ধ লইটি থেকে। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন লেখাটি প্রথম ছাপা হয় দৈনিক ভোরের কাগজ পত্রিকার ১৯৯৩ সালের ২৪ মার্চ তারিখে।

আগেই বলেছি সলিমুল্লাহ খান ১৯৭১ নিয়ে ছফার বিচারের বিশ্লেষণ করেছিলেন তিনটি নিবন্ধে। এগুলোর সমষ্টি ও পরিমার্জিত রূপ ছফাট্রিকা; বেহাত বিপ্লব ১৯৭১। তিনি নিবন্ধের প্রথমটি ‘বাংলায় জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্তর্জাতিক তাত্পর্য অথবা আহমদ ছফার জটিলিচার’ শিরোনামে দৈনিক সমকাল পত্রিকার গুরুবারের সাময়িকী ‘কালের খেয়া’ ২৮ জুলাই ২০০৬ তারিখে প্রকাশিত। দ্বিতীয়টি ‘আহমদ ছফার বিচ.ৰ: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মধ্যাবিত্ত শ্রেণী’ শিরোনামে ৩১ অগস্ট ২০০৬ তারিখে একটি দৈনিকের ১ম প্রতিষ্ঠাবর্তিকী (২০০৬) বিশেষ সংখ্যায় এবং শেষটি সাতাহিক ২০০৩ দিন সংখ্যায় (২০০৬) ‘বেহাত বিপ্লব ১৯৭১: আহমদ ছফার বিচার’ শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

সলিমুল্লাহ খানের ‘রাষ্ট্র ও বাসনা’ লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয় আহমদ ছফার মৃত্যার টিক আগের দিন, ২৭ জুলাই ২০০১ তারিখে। ছফা রচনাটি পড়েছিলেন, আনন্দে কৌনেও ছিলেন। ‘রাষ্ট্র ও বাসনা’ অথবা আহমদ ছফার বিষয়-সমাজ-সিদ্ধু’ শিরোনামে লেখাটির প্রকাশ দৈনিক মুগ্ধতার পত্রিকার সাহিত্য সময়সূচীতে। ইংরাজি রচনাটি নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত দি ভয়েস অফ বাংলাদেশ পত্রিকায় (প্রথম দর্শ প্রথম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৩) প্রথম ছাপা হয়।

‘ডাক দিয়ে যায়’ প্রবন্ধের ভূমিকা অংশ এই বালামের জনাই লেখা। মূল অংশ উকার করা হয়েছে প্রবন্ধের লেখক নূর মোহাম্মদের ইতিহাস সমাজ-রাষ্ট্র-সংস্কৃতি (২০০৪) বই থেকে। সৈয়দ আবুল মকসুদের লেখাটি ৩০ অগস্ট ২০০৩ তারিখে আবু জাফর শামসুদ্দীন স্মৃতি বক্তৃতা স্মরণ পাঠ করা হয়েছিল।

প্রবন্ধগুলির লেখক এবং উৎস হিসারে ব্যবহৃত বই, সংবাদপত্র বা সাময়িকীর সম্পাদককের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে ঝুঁতড়।

২

বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতার লেখক ভাবে আহমদ ছফাই ভুল বানান, শুধু বাকা, ভাষার অপব্যবহারসহ 'মারাত্ক জটি বিচ্ছিন্ন' নায় সীকার করেছেন। ছফাই পক্ষে সে সব ক্রটি সংশোধন আমাদের দায়িত্ব মানছি। সংশোধন যথাসত্ত্বে সীমিত রাখা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে ভাষা স্পষ্টতর করার ক্ষতিগ্রস্ত দু একটি শব্দ সংযোজন করেছি; সম্পদকীয় মন্তব্য বা ব্যাখ্যা যোগ করেছি তৃতীয় বন্দনানৈতে। কিছু ক্ষেত্রে যতিচ্ছ সংযোজন, কিছু ক্ষেত্রে বিয়োজন করতে হয়েছে। অনুচ্ছেদ বিভাজনেও সামান্য পরিবর্তন আনা হয়েছে।

এছাড়া ভাষায় গতিশীলতা আনতে এবং সমসাময়িক পাঠকের সুবিধার্থে লেখাটি আধুনিক বানানবীতিতে পরিবর্তন করা হয়েছে।

১. যেসব ক্ষেত্রে ই, ঈ বা ই-কার, ঈ-কার উভয়ই শুল্ক, সেসব ক্ষেত্রে ই বা ই-কার ব্যবহৃত হয়েছে এবং ই, ঈ বা ই-কার, ঈ-কার-এর ভুল ব্যবহারকে শুল্ক করা হয়েছে (জাইয়ে > জাইয়ে, আমদানী > আমদানি, বাংলাদেশী > বাংলাদেশি, হিন্দী > হিন্দি, কর্মসূচী > কর্মসূচি, গোষ্ঠী > গোষ্ঠী)।
২. সমসবক্ষ শব্দগুলো নিয়মানুযায়ী একত্রে লেখা হয়েছে (হয় দফা > ছফদফা, মুক্তি সংহার > মুক্তিসংহার); বিশেষ ক্ষেত্রে হাইফেন (-) দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে (জালানো-পোড়ানো)।
৩. বাহ্যল্যদোষে বর্জন করা হয়েছে (শুধুবক্ষ > শুধু, চলাকালীন সময়ে > চলাকালীন/সময়)।
৪. ছফার ব্যবহৃত শব্দশোধের অন্যোজনীয় এ-কার, ও-কার এবং বিসর্গ (ঃ) ভুলে নেয়া হয়েছে (সরসময়ে > সরসময়, জন্যে > জন্য, বৃহত্তরো > বৃহত্তর, অধিকতরো > অধিকতর, করতো > করত, লাগলো > লাগল, ছিলো > ছিল, মূলতঃ > মূলত, প্রথমতঃ > প্রথমত)।
৫. বচনায় উত্ত্বিত বিভিন্ন ব্যক্তির নামের বানান (তাজুল্লিন > তাজুল্লীন) যথাযথ করা হয়েছে, ভিন্নদেশীদের নাম লেখা হয়েছে উচ্চারণ অনুযায়ী (গ্যাটে > গেটে)।
৬. ছফা, নিজব বীতিতে, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রের বাইরেও (বিভিন্ন শ্রেণী বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে, যেমন- আওয়ামী লীগ, দেশবাহিনী, জনগণ) সম্মাতুক সর্বনাম বা ত্বিয়াকপ ব্যবহার করেছেন। প্রয়োজনীয় অংশে সম্মাতুক এবং অন্যথায় সাধারণ পদক্রমে (যারা > যারা, তাঁদের > তাদের, মধ্যবিত্ত শ্রেণী...পড়েন >

মধ্যবিত্ত শ্রেণী পড়ে, জনগণ...করোইছেন > জনগণ...করেছিল) পরিবর্তন করেছি আমরা।

৭. অন্যান্য সাধারণ ভুলও সংশোধন করা হয়েছে (বেয়ে > গিয়ে, তাবত > তাবৎ, মুখ্য > মুখ্য)।

পাঠক, বুন্দেলহাই পারবেন, বাংলা একাডেমী প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০০) যথাসম্ভব মেনে টলা হয়েছে। কিছু সম্ভব হয়ে উঠল না, যেমন- বাংলা একাডেমীর নিয়মে, কিছু শব্দের শেষে ও-কার যুক্ত না করলে 'অর্থ অনুধাবনে ভাস্তি বা বিলম্ব ঘটিতে পারে' যুক্তিতে ও-কার ব্যবহারের কথা বলা হলেও, যুক্তিটি কুযুক্তি বিধায় আমরা মানতে পারি নাই (ভালো > ভাল, মতে (অনুরূপ) > মত, হতে > হত)।

আর সকল রচনাতেও একই রকম পরিমার্জনা করা হয়েছে।

উচ্চতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা জেনেওনে পাপ করেছি—মূল রচনার পুঞ্জানুপুঞ্জ যথাযথতা বজায় রাখা হয়নি, কিছু বানান পরিবর্তন করতে হয়েছে প্রৱো সকলনে সমর্পণতা আনতে গিয়ে। যথাযথ উৎসের উল্লেখ শাকায়, প্রয়োজনে, পাঠক মূল রচনাও দেখে নিতে পারবেন। এ যুক্তি আমরা দিতেই পারি।

এত সংশোধনের প্রাণ দাবি করতে পারব না— সকলনাটি একেবারে নির্ভুল। দোষ নিয়ন্ত্রের নয়, নিয়ন্ত্রিত। আপনারাই মার্জিনের মালিক।

৩

আহমদ ছফন মহাফেজখানার পঃয়লা বালাম ১৯৭১: বেহাত বিপ্লব উৎসর্গ করা হল কমরেড মুজফ্ফর আহমদকে। তিনি ১৯৭১ সালে কলকাতায় আহমদ ছফন অন্যতম আশ্রয়দাতা ছিলেন। এ কথা আমরা খোদ আহমদ ছফন মুখে শনেছি। বাঙালি মুসলমান সমাজের দুই প্রধান লেখক কাঞ্জী নঙ্গেল ইসলাম ও আহমদ ছফন মধ্যখানে মুজফ্ফর আহমদ। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন সেতুবদ্ধ হয়ে।

এই সংকলনে সংগৃহিত 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা'র মূল কঠিপ ধার দিয়েছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির দ্রষ্টান্বকারী জনাব করিম ইসলাম, তাঁকে ধন্যবাদ। প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দেওয়ার আহমদ ছফন অন্যতম উচ্চরাষ্ট্রিকারী জনাব নূরুল আনন্দয়ারের কাছে আমরা ঝুঁতড়।

বেহাত বিপ্লব ১৯৭১

একাত্তর: মহাসিন্ধুর কল্পোল

আহমদ ছফা

ইতিহাসে কোন কোন সময় আসে যখন এক একটা মিনিটের বাস্তি, গভীরতা এবং ঘনত্ব হাজার বছরকে ছাড়িয়ে যায়। আমাদের জীবনে একাত্তর সাল সে রকম। একাত্তর সাল যারা দেখেছে, ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে যারা বড় হয়েছে, একাত্তর সালের মর্মবাণী যোহন সুন্দর বজ্রনিনাদে যাদের বুকে বেঞ্জেছে, তারা ছাড়া অন্য কেউ একাত্তরের তাৎপর্য উপলক্ষি করতে পারবে বলে আমার মনে হয় না।

আমাকে যখন কেউ ছাড়া-ছাড়াভাবে একাত্তর সম্পর্কে কিছু লিখতে বলেন কিংবা কোন মন্তব্য করতে বলেন, আমার ভীষণ রাগ ধরে যায়। কারণ একাত্তর সালে যা কিছু ঘটেছে, আমি যা কিছু দেখেছি—যে সকল ঘটনা এবং কর্মকাণ্ডে আমি এবং আমার বন্ধুরা অংশ নিয়েছি; আমার জাতির যে জোগরণ, যে প্রতিরোধ, যে দৃঢ় সংকল্প; মৃত্যুর যে সরল প্রস্তুতি, জয়ের যে নেশা, যে আত্মাগ, যে বোকাখি এবং উন্মাদনা আমি দেখেছি—সর্বিচ্ছকে একটা বিরাট সত্ত্বার অবিভাজ্য অংশ মনে হয়। চোখ বুঁজে একাত্তরের কথা চিন্তা করলে আমার কানে মহাসিন্ধুর কল্পোল ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

একাত্তর সাল পেরিয়ে এসেছি, কিন্তু সে একাত্তরের কথা বলার চিন্তা যখন করি, আমার শিরদীঢ়া বেয়ে একটা প্রবল আতঙ্কদ্রোত প্রবাহিত হতে থাকে, একটা মহান পবিত্র ভীতি সর্বসত্ত্ব গ্রাস করে ফেলে, আমার মনে হয়, একাত্তর সম্পর্কে কোন কিছু আমি কশ্মিনকালেও ভুলতে পারব না। তবু পত্রপত্রিকা থেকে যখন অনুরোধ আসে, ‘একাত্তর সম্পর্কে কিছু বলুন’, তখন আমার মাথায় খুন চেপে যায়। মহাসমুদ্রের কোন তত্ত্বালাশ না করে তাঁরা সকলে এক এক ঘটি জল চাইছেন, যা দিয়ে পাঠকরা প্রাতরাশ করতে পারেন।

বয়স বেড়ে যাচ্ছে। দিনে-রাতে চবিশ ঘন্টা সময়। একাত্তরের ভিতর কল্পনায় ঝাপিয়ে পড়ে সে সময়টা আবার নতুন করে সৃজন করব, এ রকম একটি অন্তৃচ্ছ আকাঙ্ক্ষা অনেক দিন থেকে আমাকে পেয়ে বসেছে। জীবনের দেবতা আমাকে সে

রকম একটি ফুলু অবকাশ দেবেন কিমনো? অসুখ, উৎকণ্ঠা, সক্ষত, সমস্যা, জীবনযাপনের প্রাণ, প্রাণধারণের আর্ত, বাদ-প্রতিবাদ, ঘৃণা, নিল্প এসবের ভিতরেই তো ফুলে আছে। যে সময়ের সব্দে বসি করছি সেটা একটা জানুফটা সময়, কোন আপগাম্ভীর নেই—“Times is out of joint, there is no one to set it right.”^১

শুধু একাত্তর সালের লেখক শিখিয়াচি ভিতরে বেড়ে উঠেছিল সেই ক্ষমিনী এবং তার প্রতিপ্রতি উপস্থিতি প্রভুরে দিব্যত করার চেষ্টা করে। নিজের মুখে শখন বলছি সে সহজে তো আবার নভুন করে মূজন করছি। অবস্থের কেন্দ্রবিন্দুতে নিজেকে ঢাগন করতে না পাবল, অন্তর্ভুক্ত উপর সুবিচার করতে পারে না মানুষ। বিজের আত্মার উপর আবিতর অনেক প্রতি হাতি কে কখন সুবিচার করতে পেরেছে?

তাম্রে উক্ত কথা যাক।

১

একাত্তরের আনন্দ বেকে আমরা ছেটি ছেটি সাহিত্যসভা করে আসছিলাম। শুরু করেছিলাম কাথান বাজারের হোটেল নাইল ভাবিতে। আবুল হাসান, শশাংক পাল, নিমিসেন্দু গুণ, কবি আবুল কাশেম, কায়েস আহমদ, মেহেরুদ্দিন শাহজাহান, সানাউল হক খান, বক্ত নাম্ব বক্তব। শশাংক সেই, আবুল হাসান বিগত, কায়েস গলায় দড়ি দিল, যোহুয়ান শাহজাহান এই সেদিন গেল, যদি কাশেমের ভোক্তুনামে কংগ্রেসের এখনো কামে বাজে। আবুল মানুষটি সেই। নাইল ভাবিতে আমাদের সাংগৃহিক আসরটা ঢায়ী ইন না। চলে যেলাই ফরাশগঙ্গের পালকাটিতে। শুধানে একটা ছেটি পাইকুরিতে সাংগৃহিক অনুষ্ঠান চলত। সচরাচরিন উৎক্ষেপ মুদ্রজাহি মিউনিসিপালিটির কর্মচারী ছিলেন। এক ধরনের পাগলভোক। মাঝে মাঝে উন্নান হয়ে চেতেন। তখন পরনে বক্তের বেশবাজে থাকত না। অবশ্য পায়লাহোর সমরটা খুব সংশ্লিষ্ট। ধরন মাসে-হামাসে একবাদ। বুস্তিভাইয়ের চাকরি কিভাবে যে টিকে থাকত আস্তাই জানেন। মুসিভাই বুস্তিভাইকে নিমন আভাসন হলের লাইব্রেরিতি আমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিতেন, বই ধার দিতেন।

শালকুরির সেই সাহিত্যসভায় অনেকেই আসতেন। লড়াদের মধ্যে আসতেন নারি শামসুর রাহমান, শিল্পী হারাবন বৰ্মন। আহা! পঁচিশে মার্চের রাতে প্রকান্তিম আর্মি নেচারির হারাবন বৰ্মনকে হত্যা করে। একদিন ফরাশগঙ্গে, মাওলা সর্দার সাহেব আমাদের জন্য শালকুরি বক্ত করে দিলেন। উনি এই এপ্লকোর সর্দার বা চেয়ারম্যান গোছের একটা কিছু ছিলেন। আমাদের আভাসটি উত্তৰ করে হয়ে আছে। আমরা ছাড়া-ছাড়াভাবে বসতে ধাকলাম। কখনো নারিন্দ্রাবী বিকল সন্ধ্যামতের বোনের বাড়িতে। অবশ্য এখন তিনি সেরায়াবাত দেখেন। শেখ মুজিবের ভগ্নিপতি বৰ নেওন্যোবাতের চাচাত ভাই। এই বাড়িতে ছিল কবি জিসিমউদ্দীনের নির্মিত আলগোন।

নিমন্দা পৌত্রীয় মাঠের বিপরীতে রাফিকদের পাড়ি চিলেকোঠাতি সংকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। ছয়াঢ়া হাড়-হাড়াতে কবি, সেৱক, প্রয়োগ, শিল্পী রাজনৈতিক কর্মী যে ধখন ইচ্ছে শুনিয়ে থাকতে, জাহাঙ্গী দিকে, প্রান্তৰ্বিহীনে আগত্বাপাতি করে যেতে পারত। কু বেৱাল বাবতে হত করি জিসিমউদ্দীন সাহেব আছেন কিনা। কবি সাহেব থাকলে একটি অসুবিধা হত। কবি সাহেবকে আমরা যিক পছন্দ করতাম না। আধুনিক কবিতার প্রতি তিনি দিলগ ছিলেন—চাই অপহাসের একাত্তর কানপ নয়। সুদর্শন কিশোরদের প্রতি কবিল অনুস্মৃতির বিধি আমরা জানতাম। বেসর কৰা থাক।

বাফিক সেবনিয়াবাতের বাড়ি ভাড়াও আমাদের আভাস বসত বাল্লাবাজারের বিউটি বোর্ডিংস্যো, সোবিন্সের চৌরঙ্গি বেস্টেলেনে, জামাতখানার গঞ্জাতে চৌমাদার দেৱকানে। গোবিল মাঝা গেছে, টেম্পলও। বিউটি বেস্টিংয়ের মানিক এহলাদ বাবুকে পানিস্তুল আর্বি খুল করেছে। এপন বাল্লাবাজারের পারে কাছে কেৰাও আভাস নামগুৰু নেই। এ আভাস না ধাকাব কফল কী হয়েছে বৰ্তমান বাল্লাবাজারের চেহারা দেখলে যে কেউ অনুগ্রাম করতে পারবে। বাল্লা সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশের মধ্যে আভাস একটি অদ্যুষ্ম সংস্কর বর্তমান। আভাস সঙ্গে সম্পর্কহীন যে সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে এঙ্গোকে সাহিত্য না বলে এতপ্য বলাই সন্দেহ।

আমাদের আলোচনায় ছিলো আসি। আমরা সংগ্রহে কি পানের দিনে বসার নতুন নাতুন জাগুগা খুঁজে বের করাইলাম এবং বিকাড়িতও দিলিলাম। সে সময় আমার একটি কি দৃটি বই প্রকাশিত হয়ে গেছে। সে সুবাদে লেখের সত্ত্বে সেনের সঙ্গে আমার একটু ঘনিষ্ঠা সৃষ্টি হয়েছে। সনেমন্দা আমাদের সিয়ে এলজীড়া পাতুলের বাড়িতে। তখন আজ গুপ্তায় গুপ্তায় বৰীমুসলীত শিল্পী সন্তোষী আগুমা কেত না; আমাদের তাৰ্থনের কাছে সন্তোষী আপা এবং তার গুমী বৰাহাহনুল হকের খুব একটা উজ্জ্বল অভ্যন্তর ছিল। বতুর মনে পড়ে, তার বাড়িতে চার পাটী সভা আমাদের বসতিল। সন্তোষী আগুম মূল অঞ্চল ছিল সন্দেহে। আমরা যেতাম আমাদের বেগু পড়তে, অগোচৰ কলতে এবং প্রাণখনে আভাস দিতে। এক ধরনের রামীন্দ্ৰিক রঞ্জনগীল পুহুচৰাড়িতে এ দুর্ব প্রাণ খেলা অসমুব হয়ে সৈকান্ত। সুতৰাই আমরা আপনে চলে প্রাণ।

একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করি। কবি শামসুর রাহমানকেও একাধিক বৈঠকে সন্তোষী আগুম বাড়িতে টেকে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলাম। সত্ত্বেও তো থাকতেনই। তিনি স্পন্দনের সামৰে জোড়া বন্দে রেখে আটোয়া উপর পা ছাড়িয়ে বসতেন এবং শুরু শুন্দর কাজে হস্তেন, হমন সুন্দর যিৰি মোলায়ের শিতুর মত নিষ্পুণ নির্মল হাসি আগু এ পর্যন্ত বেনু শামসুর হাসতে দেখিনি। একদিন ইল কি, প্রতিভাময়ী বৰীমুসলীত শিল্পী সন্তোষী পাতুল, যিনি সন্তোষী আগুর কবিয়া, একটি পাব গেয়েছিলেন। গাম ওৰ হালে ওয়াহিদ ভাই বাতি নিজিয়ে দিয়েছিলেন। শামসুর রাহমান সাহেব এই মিনি ঝাকাইজী পুরুই উপভোগ করেছিলেন। এই স্পন্দনায় আভাসেৰিয়ারের অনেক তাৰিখও তিনি কৰেছিলেন। আর্মি আকে দেবতা বলতাম। বলেছিলাম: দেবতা, আসলে ওটা তিপ তু তু পৰিৱেশ। সে সময় তিনি সন্তোষী

খত্তনের গান গাওয়া নিয়ে বেশ সুন্দর একটা কবিতা নিখেছিলেন। ফাহমিদা কবিতাটি খুব পছন্দ করেছিলেন। কবিতার নাইলে সম্পর্কের কোন শিকড় গজিয়েছিল কিনা আমি বলতে পারব না।

এরই মধ্যে প্রায় আট ন মাস গজিয়ে গেছে। আমরা একটা স্থায়ী জায়গা পেয়ে গেলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের শিক্ষক ড. আহমদ শরীফ আমাদের সাদের তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টারের ড্রাইং রুমে বৈঠক করার অনুমতি দিলেন। তিনি ছিলেন আমার শিক্ষক। এক সময় আমি বাংলাতে ভর্তি হয়েছিলাম। ছাত্র থাকাকালীন শরীফ সাহেবের সঙ্গে আমার সম্পর্কটি বিশেষ ভাল ছিল না। কিন্তু এ সময় তাঁর সঙ্গে আমার একটি সুসম্পর্ক সৃষ্টি হতে যাচ্ছিল। আইয়ুব খান সাহেবের ঢাকাইয়া মন্ত্রী খাজা শাহাবুল্লিম রেডিও-টিভিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। সমাজে তাঁর একটি ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হল। গভর্নর মোনায়েম খান সাহেবের বাংলাবিভাগের চেয়ারম্যান হাই সাহেবকে গভর্নর হাউজে ডেকে নিয়ে ধর্মক দিয়ে বললেন, আপনারা বসে কি কাঁচকলাটা করেন? রবীন্দ্রসঙ্গীত লিখতে পারেন না? চারদিকে বর্ণীর ফলার মত ধারালো চকচকে প্রতিবাদ জেগে উঠেছিল। বাঙালি ভদ্রলোকদের রাগ-বাল-উচ্চা ও উত্তেজনা খড়ের আগন্তের মত, এই জুনে এই নেতে।

আমরা একটু অন্যরকম চিন্তা করলাম। ঠিক করলাম দেশের সমস্ত কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষক, আইনজীবী এবং রাজনৈতিক কর্মীদের লেখা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের উপর একটা বড়সড় ঝঁঝ প্রকাশ করব। আমি এবং আমার বড়ু কাজী সিবাজ স্টুডেন্ট ওয়েজে পিয়ে অগ্রজপ্রতিম অহিন্দুলাকে ধৰে বসলাম, তখনকার দিনে চলিশ হাজার টাকা খরচ করে এই বইটা তাঁকে ছাপতে হবে। অহিদ ভাই ছিলেন শান্তিষ্ঠ রাজনীতিবিদ্যুৎ একজন বৃচ্ছিম ভদ্রলোক। তিনি এক্সার্টা গ্রহণ করলেন। তারপর আমরা এলাম আমাদের শিক্ষক ড. আনিসুজ্জামানের কাছে। বললাম প্রাচী আপনাকে সম্পাদনা করতে হবে। তিনি এক কথায় বাজি হয়ে গেলেন, এই ড. আনিসুজ্জামানকে নিয়ে আমার অনেক অহঙ্কার, অনেক গর্ব এবং অনেক নালিশ আছে। আমার দুঃখ আমারই, কাউকে জানাব না। যাহোক, ঐ সকলনে প্রায় পঞ্চাশজন লেখক লিখেছিলেন। আমিও একটা লেখা চোলাই করে দিতে পেরেছিলাম। সে কাহিনী এখন বলব না। কলকাতায় রবি ঠাকুরের নাতি স্বর্গত নোমেন্টনাথ ঠাকুর এই প্রহের একটি বিশৃঙ্খল সমালোচনা করেছিলেন সেন্টচেম্বান প্রতিক্রিয়া। ড. আহমদ শরীফ এবং এই অভাজনের লেখার খবর তারিখ করেছিলেন তিনি এবং অংশবিশেষ ইংরেজিতে অনুবাদ করে উন্মুক্ত করেছিলেন। ড. শরীফের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার এটি একটি কারণ।

ড. আহমদ শরীফ সাহেবের মত অভিথিপ্রায়ণ, উদার, দিলদিয়া স্বভাবের মানুষ আমি বেশি দেখিনি। তাঁর বাড়িতে প্রতি সপ্তাহে আমরা মিলিত হতাম। তরুণদের মধ্যে অস্ত ফরহদ ফজলুর, হৃষায়ন কর্মীর, মুনতাসীর মায়ন, মুহম্মদ মুর্কল ছদ্ম, রফিক কায়সার, রফিক নওশাদ, হেলাল হাফিজ, আবরার চৌধুরী, মাওলুর রহমান চৌধুরী, পাহলুর খান, বেলী মওন্দ এবং আরো অনেকে। সকলের নাম মনে করতে পারছি না।

বড়দের মধ্যে আসতেন ড. মমতাজুর রহমান তরফদার, ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বোরহান উদ্দিন খান জাহানীর, অধ্যাপক আহসানুল হক, কবীর চৌধুরী, ড. হিরুব্যান সেনগুপ্ত, ড. অজয় রায় প্রমুখ। আরো অনেকেই তো আসতেন, সবার নাম মনে পড়তে না। একাধিক সভায় শেখ সাহেবের মন্ত্রী ড. মফিজ চৌধুরী এসেছেন। আমি বলতে ভুলে গেছি ইতৎপূর্বে ড. মফিজ চৌধুরী সাহেবের ইন্দিয়া গোড়ের বাড়িতেও পাঁচ-সাতটা বৈঠক হয়েছিল। আমার পিতৃপ্রতিম সহেপরায়ণ প্রাণবান এই মানুষটি আজ পক্ষাঘাতে রোগে শ্যাশারী। মানুষের কথা না বলে ঘটনার কথা বলব কেমন করে।

মানুষ জন্ম-মৃত্যুর অধীন। দৃতবাং যখন কাহিনীটি বলছি, যেসব মানুষ আমাদের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাদের থেকেও আজ চলমান জীবনস্তোত্ত থেকে বাদ পড়ে গেছেন, তাঁদের কথা তো বলতেই হবে। হৃষায়ন কর্মীর চরমপট্টি রাজনীতির শিকার হয়ে আত্মত্যার শুলিতে প্রাণ দিল। শাহনূর, কবি শাহনূর, গোগে ভুগে মারা গেল। যতই ব্যবস হচ্ছে, বেঁচে থাকার একটি উদ্দেশ্যই আমার কাছে স্পষ্ট হচ্ছে। আমাকে যথাসম্মত সৎ থেকে আমার স্বর্গত বন্ধনের কথাই বলতে হবে। আমার মনে হয়, যাদের সঙ্গে অবাধে ভাব বিনিয়ো করতে পারতাম তাদের অনেকেই জীবনের অপর পারে চলে গেছে। আহা! 'অভাগী দুঃখের গাথা লিখবে চিরকাল।' নতুন যাদের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে, আমার আশক্তা, তারা আমাকে বুঝবে না। তাদের কাছে আমার ভিতরটি, উন্মুক্ত করতে শক্তি হই।

ড. শরীফের বাড়িতে আভাজি আমরা অনেকদিন পর্যন্ত চালিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলাম। তার একটি নেপথ্য কারণ তো অবশ্যই ছিল। শরীফ সাহেব সবাইকে খাওয়াতেন। যাদের টিফিন খাওয়ার পয়সা জুটত না, তাদের অনেকেই সংস্কৃতিভঙ্গের উদ্দেশ্যে নীলাক্ষেত্রে সাইত্রিশের সি কোয়ার্টারে আসত। শরীফ সাহেব গুড়ুক গুড়ুক হঁকা টানতেন এবং বড় আওয়াজ করে ডাক দিতেন, আনা চা দাও, নাস্তা দাও। আমার বিশ্বাস, নিজের কঠস্তর শুনে তিনি নিজেই বিশ্বিত এবং চমৎকৃত হতেন। শরীফ সাহেবের ছিল একটি কর্তৃত্বাব্ধ কঠ। তা দিয়ে অনেক দিন সাহিত্য-সংস্কৃতির আসর গৱাম রেখেছিলেন তিনি। এখন বোধ হয় সেই স্বরের উত্তাপ অনেকাংশে থিতিয়ে এসেছে।

২

আমাদের কথায় আসি। সে সময়টিতে ফরহাদ মজহাব এবং কবি হৃষায়ন কর্মীর দুজনের সঙ্গে আমার পরিচয় নিবিড় হয়ে ওঠে। গোটা দেশের রাজনীতিতে একটা উন্নত তরঙ্গ ফুসে ফুসে উঠেছিল। মওলানা ভাসানীর জালাও পোড়াও মেরাও অন্দোলন খান সাহেবের সামরিক শাসনের ভীত নাড়িয়ে দিয়েছে। তারপর আগরাতলা ঘৃতবন্ধন মালা শুরু হয়েছে। ছাত্রদের ক্রমাগত আন্দোলন চলছে। পূর্ব পঞ্চ পশ্চিম পারিষ্ঠানের সর্বত্র একটা থমথমে বিশ্বজ্ঞাল অবস্থা: 'প্রস্তা বাড়ের পূর্বে প্রকৃতি যেমন।'

এ খরনের একটি পরিষ্কারভাবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বেথক-সাহিত্যকর্তা যে ভূগুণ পালন করে আনছিলেন, সেটাকে কিছুতেই পৌরবজনক বলা যাবে না। আইন্যুব খান সাহেব সময়ে আমাদের অবস্থাকে গবেষক-সাহিত্যকরদের কিনে নেওয়ার জন্ম ‘পাকিস্তান রাইটস পিট’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের পূর্ববঙ্গীয় শাখার সদর সংস্থা ছিল তাদের। বাংলা ও জাতীয়ীয় সামাজিক সেক্টের কাছে যে গুরুত্বপূর্ণ আছে, উটাকে লেখক সংস্থের প্রতিষ্ঠা হিসাবে বাস্তবায় ফরা হত। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত নামবরা লেখক-সাহিত্যকর এই বেথক সংস্থের সদস্য ছিলেন। তাদের মধ্যে দলালিন ছিল, অনেক উপদল ছিল, কিন্তু কোটিরিহত প্রতিটি উপদলই নিজেদের কায়দা হাসিলের জন্ম তৎপর থাকত। দেশের বিরাজমান পরিষ্কারির প্রতি সংবেদনশীল হওয়ার পরিবর্তে তারা রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা আদায় করার ব্যাপারে অধিকতর আগ্রহী ছিলেন। সেজন্য আন্দোলনের প্রতিবেগের তৈরীতা যত বড়ছিল, লেখক সাহিত্যকরদের ভূমিকার প্রতি জনগণের স্থগাও ততটু হয়ে উঠেছিল।

সামাজিক শাসনের বিরুদ্ধে সর্বত্র ঘটিত চলছে। কিন্তু লেখকদের মধ্যে তারা কেবল প্রতিক্রিয়া নেই। এই লেখক-সাহিত্যকরদের অনেকেই ছিলেন আমাদের বয়োজোষ্ঠ এবং শ্রদ্ধেয়। তাদের বিজ্ঞয়তা দেখে আমরা নিজেরা পজিজত হতাম এবং মধ্যে মাঝে কিষ্ট হয়ে উঠতাম। পুর সন্তুল ১৯৭০ সালের নাভের সামনে শেষদিকে হবে, বদরকুলীন উমরকে প্রেসকুলের একটি সভায় মন্তব্য করতে শুনলাম, মহিলারাও দু-দুটি মিছিল করে যেলেছেন, আমাদের লেখক-সাহিত্যকরদের মধ্যে কেবল প্রতিক্রিয়া নেই। তিনি পুর কম্ব লেখক সংস্থের উদ্দেশ্যে নানা কর্তৃত করতেন। সেগুলো ছিল নিরেট সত্তা। যে সময়ের কথা বলছি, তখন রাইটস পিটের পূর্ববঙ্গীয় শাখার সভাপতি ছিলেন বৃগতি ড. এনামুল হক এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।

আমরা কিছু একটা করতে চাইছিলাম। আমরা ছাত্র মানুষ, সমাজে আমাদের অবস্থান কোথায়? তাছাড়া কর্তৃমান সময়ে তরঙ্গরা মেভাবে বয়োজোষ্ঠদের ভূমিকার প্রতি অবিশ্বাস পেষণ করে, আমাদের সময়ে পরিষ্কারি সে কমই ছিল না। সেই পরিবেশ পরিষ্কারিতে আমরা চাইছিলাম বড়দের পেছন দিক থেকে ঠেলে এমন একটা পরিবেশে ছুঁড়ে দিতে, যাতে করে আমাদের মত তরঙ্গ এবং পুর পরিষ্কার লেখকদের কাজ করার কিছু সুযোগ তৈরি করা যায়। আমাদের গোটা গঠিত একটা পরিবারের মত হয়ে গিয়েছিল। আমি, মানে আহমদ ছফা, হুমায়ুন করীর, ফরহাদ মজহাব, মুহম্মদ মুফল হুদা, বাফিক কায়সার, বাফিক নওশাদ, মাঝক চৌধুরী, শাহমুন খান, হেলাল হাফিজ, আবরার চৌধুরী প্রমুখ তরঙ্গ নিবিষ্ট এবং শুশ্রালভাবে কাজকর্ম চালিয়ে গাছিলাম। সত্ত্বকর অর্থে একে অন্যের সুখ-দুঃখের অংশভাগী হয়ে উঠেছিলাম। আমরা এমন কিছু কর্মকাণ্ড করতে চাইছিলাম যাতে বয়োজোষ্ঠ পিটী-সাহিত্যকরদের অবস্থানটিকে একটি প্রবল ধার্কা দিয়ে কায়েমি সুবিধাবাদ থেকে সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে একলঙ্ঘ করে তুলতে পারি।

লেখক সংস্থের একটি অফিস আছে, একটি টেলিফোন আছে। বুড়োদের সঙ্গে তাল রেখে এই অফিস এবং টেলিফোনটিকে ত্বরণত লেখক কর্মীদের সংযোগ করার কাজে ব্যবহার কিভাবে করা যায়, আমাদের মনে সেই চিন্তা জন্মায়। [তা বাস্তবায়নের] একটা সুযোগও পাওয়া পেল। পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর লেখক সংস্থাকে প্রেসখানা রোডে একটি পরিবারভুক্ত দোতলা বাড়ি নিয়েছিলেন। বর্তমান সেক্রেটারিয়েটের কোণার পুলিশ বাস্টিউট বিপরীতে ছোট যে গলিটা উভয়ের দিকে চুকে গেছে, তার মুখেই ছিল দোতলা বাল ইটের বাড়িটা। আগে কোন হিন্দু পরিবার থাকত। ওদের উড়িয়া মালি কিংবা দারোয়ান পরিবারটি তখনে বাড়ির কম্পাউন্ডে থাকত। যাহোক লেখক সংস্থের কর্মকর্ত্তবৃদ্ধি, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এবং প্রয়াত কবি হাসান হাফিজুর রহমানরা মিলে যখন বাড়ির দখল নিতে যান [তখন] এই গোকার চেয়ারম্যান ইয়াকুব আলী (যাকে পাকিস্তান আর্মি থুন করেছিল) সবাইকে ঝোর করে তাড়িয়ে দেন। তারা কিছুক্ষণ ফেস-ফোন তর্জন-গৰ্জন করলেন—পুলিশ ভাকবেন, মামলা করবেন ইত্যাদি। তারপর যে যাব বাড়ি চলে যাওয়ার জন্ম উত্তলা হয়ে উঠেছিল। সে সময় আমরা দল বেঁধে এসে ইয়াকুব আলীকে ঝোর করে তাড়িয়ে দিয়ে বাড়িটাতে ঢুকে পড়ি। সেই যে ঢুকলাম, পঁচিশ মাট্টের ত্রান্তে অন্তর্ভুক্ত পূর্ব পর্যন্ত আর কেউ বেরিয়ে যেতে বাধা করতে পারেনি।

আমরা তখন একটা হয়ে বড়দের ধার্কা দিয়ে একটা কর্মপদ্ধার দিকে নিয়ে আসছিলাম। তাকা বিশ্বিদ্যালয় এবং বাংলা একাডেমীর সম্মানিত সকল শিক্ষক-সাহিত্যক আমাদের কর্মপদ্ধতি নীচে অনুমোদন করলেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকাটি নিয়ে। সেখানে হাসান ভাই, শামসুর রাহমান সাহেব, ফজল শাহবুদ্দিন, আহমেদ হুমায়ুন, আহমেদ হাবীব এসকল ব্যক্তি চার্কারি করতেন। যেহেতু দৈনিক পাকিস্তান ছিল খেস ট্রাস্টের পত্রিকা এবং সরাসরি প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সমর্থক, সেজন্য এ পত্রিকার প্রতি আমাদের অনেকেরই একটা প্রচন্ন তৈরি ঘৃণা ছিল। তবে এ কথা সত্তা যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বেশ কয়েকজন মেধাবী লেখক-কবি দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন। তাঁরা এই পত্রিকাটি নানাভাবে আকর্ষণীয় করে তুলতে পেরেছিলেন এবং [এর] সাহিত্যের পাতাটি ছিল খুবই সমৃদ্ধ। সাহিত্যিক মুসিয়ানার করারে তরঙ্গদের উপর এই পত্রিকার লোকেরা একটা পুরস্তুপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন। আমাদের আন্দোলনটি যদি শক্তিশালী হয়, তাহলে তাদের সমাজিক নেতৃত্ব ধরে পড়বে। সে করানেই এই পত্রিকার কিছু লোক আমাদের কর্মসূচির বিবেচিতা করছিলেন। সত্ত্ব বলতে কি, আজকের দিনে আমাদের দেশের প্রবীণ ও প্রতিষ্ঠিত কবিদের যে দ্বিমুখী ভূমিকা সকলের চোখে পড়ে, দৈনিক পাকিস্তানের আমল থেকেই তার সূত্রপাত। আইয়ুব খান সেই যে তাদের সুযোগ নিতে শিখিয়ে দিয়েছিলেন, সেই সুবিধাবাদী মনোভাব অদ্যবার্ধ তাঁরা পরিহার করতে পারেন নি।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের কথা কিছু বলিনি। সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পার্কিস্টানের জাতীয় প্রদর্শনিদের দুটি বাদে সব কটি আসনে বিজয়ী হয়েছিল। দেশের ভিতর তুলকালাম কাও ঘটেছে। প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও মিছিল হচ্ছে, কোথাও না কোথাও গুর্ণি হচ্ছে, কেউ না কেউ মারা যাচ্ছে। যেহেতু একটি বিরাট ঘটনাপ্রবাহের মধ্য থেকে আমি একটা বিশেষ সামাজিক বর্সের কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দিচ্ছি, তাই অনেক কিছু আমার স্পর্শের বাইরে রাখতে বাধ্য হচ্ছি। এমনকি ১৯৬৯ সালে আসাদ হত্যার পর যে গণআন্দোলন কেটাল জোয়ারের মত জেগেছিল, সে বিষয়েও কিছু বলিনি। ১৯৭০ সালের সর্বনাশ ঘূর্ণিবাঢ় এবং জলপ্রাবন্নের কথা এড়িয়ে গেছি। '৭০ সালটি দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল।

১৯৭১ সালে আমরা ঠিক করলাম, এইবার লেখকদের সংগঠিত করা দরকার। মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে তাঁদের যুক্ত করার জন্য ক্রমাগত ছেট-বড় সভা করতে থাকলাম। আমাদের নিজেদের একমত হওয়া খুব সহজ ছিল না। আমাদের মধ্যে নানা মতের লোক ছিলেন। কেউ আওয়ামী লীগের, কেউ কমিউনিস্ট পার্টির, কেউ সিরাজ শিকদারভুক্ত। সকলেই নিজ নিজ রাজনৈতিক আদর্শের দিকে গোটা কর্মসূচি প্রবাহিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। যাহোক, আমরা শরীফ সাহেবের বাসা, লেখক সংঘের অফিস এবং কখনো কখনো বাংলা একাডেমীর ডি঱েন্টের কৰীর চৌধুরী সাহেবের খাসকামারায় বৈঠক করতে লাগলাম। বোরহানউদ্দিন খান জাহানীর সাহেবের ঐ সময় আমাদের অনেকটা অনুপ্রেরণার উৎস ছিলেন। আজকের দিনের মত দুর্বোধ্য, অস্ফুটহাস্য এবং রহস্য-পরিপূর্ণ তখনো তিনি হয়ে উঠেন নি।

ঠিক হল, জানুয়ারি মাসের দশ তারিখে শহীদ মিনারে একটি সভা হবে। সে সভায় সবাইকে ডাকা হবে এবং সর্বসম্মতিক্রমে একটি কর্মসূচি গৃহীত হবে। যেহেতু আমি স্মৃতি থেকে বলছি, তারিখটা ১০ জানুয়ারিই কিনা পুরোপুরি নিশ্চিত নই। শহীদ মিনারে বিকেল চারটায় সভা বসল। ড. শরীফ শপথনামা পাঠ করলেন। সব কিছু মনে নেই। স্মৃতি থেকে যতটুকু উদ্ধার করা যায় বলছি। এই সভায় শরীফ সাহেবের লিখিত শপথনামায় বলেছিলেন, যে সমস্ত লেখক অতীতে সামরিক শাসনের সঙ্গে সহায়তা করেছেন, তাঁরা সেজন্য লজিত এবং দুঃখিত। ভবিষ্যতে বাংলার জাতির স্বার্থের পরিপন্থী কোন কর্মকাণ্ডে তাঁরা লিঙ্গ হবেন না এবং জনগণের সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম থাকবেন। উপস্থিত লেখক-সাহিত্যিকদের সকলেই হাত তুলে এ শপথনামা অনুমোদন করলেন এবং কবুল করে নিলেন যে লেখক-সাহিত্যিকদের এক পাটাতনে সংগঠিত হওয়া প্রয়োজন। তারপর কথা উঠল, এই প্রতিষ্ঠানটির কী নাম হবে? নানাজন নাম নাম প্রস্তাব করলেন। শহীদ মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী উঠে দাঢ়িয়ে স্বত্বাবসূলভ স্লিপ

ভঙ্গিতে প্রস্তাব করলেন, এই প্রতিষ্ঠানটির নাম হবে লেখক সমিতি। আমি প্রতিবাদ করে বললাম, এই প্রতিষ্ঠানের নাম হবে লেখক সংগ্রাম শিবির। তখন কি জানতাম, শিবির নামটি জামায়াতে ইসলামী হাইজাক করে নেবে? বলার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে এক বাক্যে রাজি হয়ে গেলেন — যেন সকলে মনে মনে এ রকম একটি নামই চেয়েছিলেন। এ সকল সংবাদ তৎকালীন পত্রপ্রকাশ ফলাও করে প্রকাশ করা হয়েছিল।

একটা পরিতাপের কথা আমি বলব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন অধ্যাপক এই ঘটনাকে তাঁদের লেখা বইতে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। ড. রফিকুল ইসলাম তাঁর বইতে বলেছেন, জানুয়ারির সেই বিশেষ তারিখটিতে বুদ্ধিজীবীরা সবাই মিলে শহীদ মিনারে ড. শরীফের নেতৃত্বে শপথ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমার প্রিয় বন্ধু আবুল কাসেম ফজলুল হক তাঁর বইতে ঘটনাটিকে একইভাবে বিবৃত করেছেন। লেখক শিবির নামটি পর্যন্ত দুজনের কেউ উচ্চারণ করেন নি। উপস্থিত মুহূর্তে দুজনের বই দুটির নাম মনে আসছে না। পশ্চিত-সমাজের মধ্যে এই ধরনের অসামুত্তর নজির ভুরি ভুরি পাওয়া যাবে। সুতরাং এ নিয়ে কথা বলে লাভ নেই।

আরেকটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। এই লেখক সংগ্রাম শিবিরের সংবাদ কাগজে-পত্রে প্রকাশিত হলে জনবাব বদরুদ্দীন উমর এক মজার কাও করে বসলেন। তিনি দৈনিক পার্কিস্টান পত্রিকায় সাড়ে তিন কলাম দীর্ঘ একটি চিঠি লিখলেন। সকলের কাছে আবেদন জানালেন, কেউ যেন লেখক শিবিরের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখে। কেননা মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ এবং এ ধরনের আরো দু একজন লেখকের (যারা রবীন্দ্রনাথের বিবোধিতা করেছিলেন) নাম যুক্ত হওয়ায় তিনি ভয়ঙ্কর রকম ক্ষেপে গিয়েছিলেন। আমরা চিঠি পড়ে ক্ষুক এবং অবাক হলাম। এত কষ্ট করে প্রতিষ্ঠানটি দাঁড় করানো গেছে, উমর সাহেবের বাগড়া দিয়ে বসলেন। সেই সময় উমর সাহেবকে আমরা সর্বাধিক ভক্তি-শুদ্ধি করতাম। তিনি এমন একটা কাজ করে বসবেন তা ছিল আমাদের স্বপ্নেরও অভীত। আমরা তাঁর লেখা থেকে সংগ্রামের প্রেরণা এবং প্রতিবাদের ভাষ্য আয়ত করছিলাম। অথচ তিনি কিনা আমাদের অত কষ্টে জুলিয়ে তোলা আগুনে এক বালতি পানি ঢেলে দিলেন! আমি ভয়ঙ্কর রকম ক্ষিণ্ণ হয়ে উঠেছিলাম। সমকাল অফিসে গিয়ে উমর সাহেবের চোখে চোখে কিছু কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছিলাম। সে সময় তিনি তোয়াহা সাহেবের সঙ্গে গণশক্তি প্রকাশ করছিলেন।

অদৃষ্টের কী নির্মাণ পরিহাস, আজকের দিনে উমর সাহেবের লেখক শিবিরের নেতা। সেই লেখক শিবিরে লেখার কী কাজ হয় এবং বিপ্লবের কী অগ্রিষ্ঠাকা প্রস্তুত করা হয় আমি জানি না। লোকে এখন লেখক শিবির এবং বদরুদ্দীন উমরকে এক করে দেখে। উমর সাহেবের নিষ্ঠাবান, একঙ্গে এবং জেনি মানুষ। যাট পেরেবার পরও পনের বছরের তরুণের মত উদ্দীপনা প্রদর্শন করতে পারেন। লেখক শিবিরটা কজা করে লেখা এবং লেখকদের কী উপকারটা তিনি করেছেন? রাজনীতির কতটা লাভ করেছেন, সেটা রাজনীতি বিশ্বেকরা বলতে পারবেন। যখন বয়স কম ছিল, উমর সাহেবের এই ধরনের কর্মকাণ্ড দেখলে প্রচণ্ড রেগে যেতাম। এখন বয়স হয়েছে, মজা লাগে।

এখানে আমি একটা ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণের কথা বলব। কমিউনিস্টদের ব্যক্তিগত ত্যাগ-ত্রিতীয়া এত অধিক যে শুক্রা না করে পারা যায় না। কিন্তু তাঁর যে মিথ্যার চৰ্চা করেন, তার জন্য লজিজ এবং দুঃখিত হওয়ার প্রয়োজন তাঁর আদৌ অনুভব করেন না। খুব সম্ভবত সারা দুনিয়াতে আচরণে এবং প্রচারের মধ্যবর্তী যে ফারাক তার জন্মই কমিউনিজমের ভরাঢ়ুবি ঘটল। উমর সাহেবের অদ্যবাদি লেখক শিবির নামটি বাঁচিয়ে রেখেছেন। কিন্তু সেটা কোন ধরনের বাঁচিয়ে রাখা? প্রধানের ইশারাটুকু ঘষে থেতেলে দিয়ে মরা শরীরটা বাঁচিয়ে রাখা ছাড়া সেটা আর কী হতে পারে!

উমর সাহেবের প্রসঙ্গ ফ্লাস্ট দিয়ে আরেকটি বিষয় স্পর্শ করি। লেখকদের একটা মিছিল করার কথা উঠেছিল। আমরা বৈঠকে বসেছিলাম। শরীফ সাহেব তখন সাইক্লিং সি থেকে বিয়ালিশ নম্বর বাড়িতে চলে এসেছেন। তিনি এবং ড. মমতাজুর রহমান তরফদার মুখোয়াখি বাড়িতে থাকতেন। আমরা অনেক লোক। শরীফ সাহেবের ড্রাইভিংমে স্থান সঙ্কলান হচ্ছিল না। তাই কেউ কেউ তরফদার সাহেবের ড্রাইভিংম দখল করেছিলেন। সেটা একটা চমৎকার সময়। আমরা যার বাড়িতে ইচ্ছে বৈঠক করতাম। খাবার থাকলে থেয়ে নিতাম। টাকাটা-আধুলিটা চেয়ে নিতাম।

আমার তারিখটা মনে নেই। খুব সম্ভব উনিশ বা বিশ ফেব্রুয়ারি হবে। আমরা প্রত্বাব করলাম, মিছিল করব। শহীদ মিনার থেকে তোপখানা রোডে সবাই মিছিল নিয়ে যাব এবং লেখক সজ্জ অফিসে একটা সভা করব। সকলে রাজি হয়ে গেলেন। কিন্তু বাদ সাথেনে আমাদের ওস্তাদ ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। তিনি যুক্তি দিলেন আহমদ ছফা এবং চ্যাংড়া পোলাপানারা একটা হঠকারী কাজ করতে যাচ্ছে। সুতরাং যাঁদের দায়িত্বজ্ঞান এবং বুদ্ধি আছে, তাদের কিছুতেই এ কাজে অংশগ্রহণ করা উচিত নয়।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আমার শিক্ষকস্থনীয়। তাঁর কাছ থেকে আমি জীবনে অনেক কিছু শিখেছি। তাঁর কাছে আমার যে খণ্ড তার পরিমাণও অল্প নয়। তথাপি একটি কথা বলব। একই সঙ্গে এস্টাবলিশমেন্টের সর্বশ্রেষ্ঠ আসন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্রবী হওয়ার দুরস্ত আকাঙ্ক্ষা তাঁর মধ্যে অতি প্রবল। অদ্যবাদি এই দুই বৈশিষ্ট্যের দেশাচল পেন্ডুলামের মত তাঁকে চৰ্বলচিন্ত করে রেখেছে। চৌধুরী সাহেবের আপত্তি হেতুটা পরে তরফদার সাহেবের আমাকে জানিয়েছিলেন। ইসলামাবাদে নাকি একটা ভাষা সেমিনার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছিল ফেব্রুয়ারির একুশ কি বাইশ তারিখে। লেখক সংগের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে ড. চৌধুরীর তাতে যোগদান করার কথা ছিল। এখন কথা হল, আমরা যদি মিছিলটা নিয়ে যাই লেখক হিসাবে তাঁকে একটা কৈফিয়ত দিতে হয়। কৈফিয়তটি যদি কর্তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে প্রেনে চড়ে ইসলামাবাদে যাওয়াটা ভেস্তে যায়। আর প্রাকাশ্যে যদি বাধা দেন, তবে দেশের যা পরিস্থিতি, সমাজে তিনি মুখ দেখাতে পারেন না। আমি অনুভব করেছিলাম, তাঁর অবস্থাটা কলেপড়া ইন্দুরের মত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যাক, সেদিন আমরা মিছিল নিয়ে গিয়েছিলাম, এবং তোপখানা রোডে সভা করেছিলাম। এই সভায় ড. এনামুল হককে ধরে এনে অনেকটা জোর করে সভাপতির আসনে বসিয়েছিলাম।

আমাদের মিছিলের একটা কৌতুককর দিকের কথা উল্লেখ করি। আওয়ামী জীব সমর্থকরা যদি বলতেন 'জয় বাংলা', কমিউনিটিরা বলতেন 'জয় সর্বহারা'। পঞ্চা-মেঘনা-যমুনার সঙ্গে ভিয়েতনাম-কিউবার ঠোকারুকি লেগে যেত। শেখ মুজিবের সঙ্গে কমরেড মাওয়ের নাম উচ্চারিত হত। সে এক মজার ব্যাপার। ১৯৭১ সালে ফেব্রুয়ারির উনিশ কি বিশ তারিখে যে সভাটি হয়েছিল, তাতে আমরা একটি দুঃসাহসী কাজ করে বসেছিলাম। কবি অসীম সাহকে দিয়ে চন্দিদাসের সেই 'ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বঁধু এখানে থাক' কীর্তনটি গাইয়ে দিয়েছিলাম। অসীম কেন যে সুন্দর সুরেণা কঠিটির প্রতি সুবিচার করতে পারল না, সেটা বেদনার বিষয়। এখন কিছু মনে হবে না, কিন্তু তখনকার দিনে লেখক সংঘের সভায়, যেখানে ড. এনামুল হক সভাপতি সেই অনুষ্ঠানে, কীর্তন গাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। ত্রিশ বছরের প্রকৃতপক্ষে সাড়ে তেইশ বছর] পাকিস্তানি শাসনের পাতলভিয়ান রিফেলে মানুষের সৃতি-শ্রান্তি এতটা বিষয়ে দিয়েছিল যে একান্তর সালের ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে কীর্তন শুনবে এতটা সাহসী কান বেশি লোকের ছিল না।

৮

ফেব্রুয়ারি মাসের পর থেকে ঢাকা উত্তাল মিছিলের নগরীতে পরিষ্ঠত হয়। বাস্তাগুলো যেন নদী। মানুষ জলের ধারার মত ছুটে ছুটে আসছে, কঞ্চ গনগনে উভাপ, বুকে জুলা, হাতে লাঠি, মিছিলে মিছিলে নগরী সয়লাব। লক্ষ কঞ্চের সম্মিলিত ভূঢ়ৰণি আকাশের নীল খিলানে গিয়ে আঘাত করছে। বাচ্চা পর্যন্ত মায়ের পেটে কান পেতে এ অমোঘ বজ্রনিমাদের আক্রান্ত শুনছে। কবরের পূর্বপুরুষরা অতীতের মোহনিদা ভেদে যেন পাশ ফিরে জেগে উঠেছে। আমার জীবনে, আমাদের জীবনে, জেগে ওঠার, জাগিয়ে তোলার মাহেন্দ্রগু সে একবারই এসেছিল। বাঙালি জাতিকে যদি হাজার বছরের একটা প্রবীণ মহীরহ মনে করি, এই নিষ্পল নিষ্পত্তি মহীরহে একান্তর সালে হঠাত করে পত্রপত্র জন্ম নিয়েছিল। আকস্মিক আলো সমস্ত আকাশে ঝুঁটে উঠেছিল। যে দেখেনি একান্তর, তাকে কী করে বোঝাই একান্তর কী ছিল! কী করে একান্তর আমাদের চৰাচৰপুরী নিখিল জাগরণের অংশ করে নিয়েছিল!

আমাদের কথায় আসি। আমরা বাংলা একান্তের মাঠে টিএসসির পাশে এখানে সেখানে যত্ন সভা করেছিলাম। দেখতে দেখতে ৭ মার্চ চলে এল। এই দিনটির বর্ণনা অনেকেই করেছেন। আমি আমার অনুভূতির কথাটুকু বলব। জীবনে মাত্র দুবার আমার মনে শেখ মুজিবের রহমানের প্রতি মমতুরোধ জন্ম নিয়েছিল। একবার যখন তাঁকে আগারতলা মামলায় আটক করা হয়। সে সময় তাঁকে মনে হয়েছিল আমার আপন সন্তান। কলম টেনে নিয়ে একটা কবিতা পর্যন্ত লিখে ফেলেছিলাম।

তসবীমালার মতোন গোটা গোটা
মাগো তোমার চোখের জনের ফোটা
দরদরিয়ে শঙ্খ নদের বেগে
রেখায় রেখায় মেঘলা আনন ভাসায
সৌন্দরবনের বাধিনী মা
ভূমি কেন গর্জে ওঠো না?
মরার হাতে বিলিক লাগে
জোয়ার খেলে জনে
ঘনিয়ে আসে রাঙা নাটক
সময় ওঠে দুলে
রঙ রঙের বসনখানি মা জননী, কেন পরো না!

তারপর ৭ মার্চ শেখ মুজিবের ভাষণ শুনে কবিতার দুটি লাইন আমার জিতের আগা
থেকে পাকা তালের মত আচমকা বিস্ময়ে ঝোরে পড়েছিল:

চমকে ওঠা অদ্বিতীয়ের থমকে দাঁড়ায় রাত
আদ্বিকালের ইতিহাস বাড়ায় লোহার হাত।

একটা কথা বলি, শেখ সাহেব যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে জয় বাংলার সঙ্গে সঙ্গে
জয় পাকিস্তান শব্দটিও উচ্চারণ করেছিলেন। এখন এই ভাষণ নিয়ে নানা বিতর্ক-বিতঙ্গ
চলছে। আমি এত ছোট মানুষ! আমাকে সাক্ষ্য দিতে কেউ ডাকবে না। আমি যেমন
শুনেছি, তেমনি বললাম। হতে পারে, আমার শৃঙ্খল বিশ্রাম ঘটেছিল।

৬ মার্চ আমরা ঠিক করলাম রেসকোর্সে যে মিটিং হবে তাতে বিক্রি ও বিতরণের
জন্য একটা পত্রিকা বের করব। সকলে মিলে পত্রিকার নাম রাখলাম প্রতিরোধ। নিচে
থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে লিখে দিয়েছিলাম ‘স্বাধীন বাংলার প্রথম পত্রিকা’। ঐ ট্যাবলয়েড
সাইজের আট পৃষ্ঠার কাগজটিতে কবিতা লিখেছিল হুমায়ুন কবীর, মুহাম্মদ নূরলুল হুদা,
রফিক নওশাদ, রফিক কায়সার এবং ফরহাদ মজহার। খুব সম্ভবত আমি সম্পাদকীয়টা
লিখেছিলাম। এখন মনে পড়ছে না, হয়তো কিছু নাও লিখে থাকতে পারি। কারণ ছাপা
এবং কাগজের জোগাড়ের জন্য আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। ঢাকার ছোট বড়
অনেকগুলো প্রেসে আমরা গেলাম। কিন্তু কোন প্রেস বুকি নিয়ে কাগজটা ছাপতে রাজি
হল না। সকাল দশটার মধ্যে যদি বের করতে না পারি তাহলে মিটিংয়ে বিতরণ করার
সুযোগটা হারাব। আমাদের রফিক নওশাদের কোণাকাঞ্চি গলিধূঁজির ব্যাপারে বিশদ
জান ছিল। সে ঠাউরি বাজারের ক্যাপিটাল প্রেসে নিয়ে দ্বিতীয় মজুরি করুন করে নিয়ে
প্রতিরোধ কাগজটা ছাপায়। সেই প্রতিরোধ-এর বাস্তিল যখন নিয়ে আসা হল,
আমাদের আনন্দ দেখে কে! আমরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চুম্ব খেয়েছিলাম।
প্রতিরোধ-এর দাম ছিল চার আনা মাত্র। মানে এখনকার পেঁচিশ পয়সা। আমার স্পষ্ট
মনে আছে একটা কাগজ ড. আহমদ শরীফের হাতে দিলে তিনি পাঞ্জাবির পকেটে হাত
চুকিয়ে সব টাকা আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ওগে দেখেছিলাম আটানবই টাকা।

ড. খান সরওয়ার মোর্দেন একটা কপির দাম পেঁচিশ টাকা দিয়েছিলেন। আমি হির
করেছিলাম, এই কাগজ বেচা টাকাগুলো দিয়ে একটা তহবিল করব, তা দিয়ে যুক্ত
প্রস্তুতির সহায়তা করব।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম এই পত্রিকাটির সবগুলো কপি আমি একান্তর সানের
৩০ এপ্রিল তারিখে তোপখানা রোডের লেখক সংঘের অফিসে জুলিয়ে ফেলি। কেননা,
পাকিস্তান আর্মি এসে সে বাড়িতে হানা দেয়। আমি যে এ পর্যন্ত বেঁচে আছি, এটা
আমার কাছে সীমিত বিস্ময়। বর্ণনা সংক্ষেপ করে আনি।

আমি যখন একান্তর সাল নিয়ে একটি পূর্ণসংস্কৃত লিখব, সমস্ত ঘটনার সূত্রগুলোর
অনুসরণ করে সেই পরিস্থিতিটা সুন্দোলভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করব।

৭ মার্চের পর থেকে প্রতিটা দিন এক একটি বিশ্বের মত ফেটে পড়ছিল।
কোথাও না কোথাও হত্যা রক্তপাত হচ্ছিল। এরই মধ্যে হযরত মওলানা ভাসানী
রেসকোর্সে মিটিং করে পাকিস্তানকে ‘আস্মালামু আলাইকুম’ দিয়ে দিলেন।

আমরা আরো গভীর তাৎপর্যপূর্ণ কিছু একটা করার কথা চিন্তা করেছিলাম। যাতে
করে এই সংক্রান্তির সময় লেখক-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটা এক্য মোর্চা
গঠন করে তাঁদেরকে স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি কম্প্যুনেট হিসাবে দাঁড় করাতে
পারি। সেই লক্ষ্য মনে রেখে ২৩ মার্চ তারিখে আমরা একটা সেমিনারের আয়োজন
করি। ঐ সেমিনারের শিরোনাম ছিল ‘ভবিষ্যতের বাংলা’ এবং তা অনুষ্ঠিত হয়েছিল
বাংলা একাডেমী মিলনায়তনে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবে কিনা, বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে
তার স্পষ্ট স্থীকারোক্তি টেমে বের করার জন্য খুব ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা করে
সেমিনারটির আয়োজন করেছিলাম আমরা। সর্বজনমান্য ধর্মাবান ঐতিহাসিক ড. আবু
মহামেদ হবিবুল্লাহ ঐ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেছিলেন। ড. আহমদ শরীফ,
ড. মমতাজুর রহমান তরফাদার, সরদার ফজলুল করিম, ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী,
বৌরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, বশীর আল হেলাল সকলে লিখিত অথবা মৌখিক বক্তব্য
রেখেছিলেন। একেবারে আনকোরা তরঙ্গদের মধ্যে ফরহাদ মজহার, হুমায়ুন কবীর
এবং আমি লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেছিলাম।

বয়োজ্যেষ্ঠ সুধী ব্যক্তিরা অনেক ভাল জ্ঞানগর্ত কথা বলেছিলেন। কিন্তু
বাংলাদেশের সামনে আসন্ন যে একটি জনযুক্ত মাটে-ময়দানে প্রচণ্ড অসহিষ্ণুতায় পা
ঢুকছে, সে বিষয়টি তাঁদের আলোচনায় একেবারেই আসেনি। ইতোপৰ্বে ভোরের
কাগজ-এ লেখা ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর একটি প্রবন্ধের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ
করে আমি একটি লেখা লিখেছিলাম। তাতে এ প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছি। হুমায়ুন,
ফরহাদ এবং আমর প্রবন্ধের মূল সুর ছিল একই বক্তব্য। আমরা দিখা এবং জড়িমাহীন
কঠো ঘোষণা করেছিলাম, বাংলাদেশ একটি যুক্তের মুখোমুখি, বার্বদের স্তুপের উপর
দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের চিন্তাভাবনাকে সেভাবে ঝালিয়ে নিতে হবে। সেদিন বাংলা
একাডেমীতে তিলধারণের স্থান ছিল না। শ্রোতারা হাততালি দিয়ে আমাদের বক্তব্য
উষ্ণভাবে সমর্থন করেছিলেন। সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

২৩ মার্চ রাতে আমি তোপখনা রোডে লেখক সংঘের অফিসে ঘুমাতে যাই। সেদিন
রাতে একটা আশ্চর্য স্পুর দেখি। দেখলাম আমি আগরতলা চলে গেছি। সামনে একটা
কাঁটাতারের বেড়া। আমি গৌরাঙ্গ শীলের চায়ের দোকান খোজ করতে থাকলাম। শৌর্জ
পাওয়ার পর ঐ দোকানে সিকি পাউন্ডের একটা শুকনা পাউরটি দিয়ে নাস্তা করলাম।
গৌরাঙ্গ শীলের বাড়ি ছিল আমাদের গ্রামে। সে আগরতলা চলে গিয়েছিল। তারপর
স্পুরে দেখলাম রবীন্দ্রনাথকে। একটা তালগাছ-বেষ্টিত পুরুরের পাকা ঘাটলার উপর
একটি বেতের হেলানো চেয়ারে বসে আছেন। শান্তা ধৰণে ধূতি এবং আলখাত্তা
পরনে, গলায় সদ্যচিন্তা গাঁদাফুলের মালা। স্পুরের কথাটা এ কারণে বললাম, ১৫
এপ্রিল তারিখে আমি আগরতলা গিয়ে গৌরাঙ্গ শীলের দোকান খুঁজে নিয়েছিলাম এবং
সিকি পাউন্ড ওজনের শুকনো পাউরটি দিয়ে নাস্তা করেছিলাম। ক্রয়েড সাহেবে স্পুর
বিশ্বেন্দের নানা পদ্ধতি নির্দেশ করে গেছেন। আমার জীবনে এ রকম বহু স্পুর আছে
যার সঙ্গে ক্রয়েডের আকাঞ্চাপূরণের খিয়োরি কোনভাবে প্রয়োগ করা যায় না।^১
আসলে মানুষের জীবন বড় দুর্গম এবং রহস্যময়।

মাঝখানে ২৪ মার্চ হয়ে গেল। ২৫ মার্চের সকালবেলা থেকে দেখলাম মানুষ
এখানে ওখানে জটলা করছে। পানের দোকানের সামনে মানুষ জড় হয়ে রেডিও
ওলছে। ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে যুজিবের আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। এ বিষয়ে আমি কিছু
বলিনি। সে যাহোক, ২৫ মার্চ সকালবেলা দেখলাম মানুষের দ্রাগশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ
হয়ে এসেছে। অবচেতনে সকলে অনুভব করছিল ভয়ঙ্কর কিছু একটা দ্রুত পা ফেলে
এগিয়ে আসছে। আমরা জুলন্ত উর্কাপিঙ্গের মত এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করছি।
মাঝখানে হরতাল ছিল, গাড়িঘোড়া সব বক। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর সাহেবে
থাকতেন পল্লবীর বাড়িতে। তিনি তখন আমাদের এত ভালবাসতেন! আমরা কেমন
আছি সে স্বাদ নেবার জন্য একবার পল্লবী থেকে পায়ে ছেঁটে ছুটে এসেছিলেন। এটা
২৪ মার্চের ঘটনা নয়। তারও আগের। তবু এই বিষয়টি সবাইকে জানিয়ে রাখার মত
একটা বিষয় বলে আমি মনে করি।

২৫ মার্চ দুপুরবেলা থেকে সংবাদ রটে গেছে—যে কোন মুহূর্তে রাস্তায় আর্মি নেমে
আসতে পারে। বিকেল পাঁচটার সময় শুনলাম হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল এবং
ফার্মগেটে সাদা পোশাকে আর্মি কিংবা পুলিশ গুলি করে চারজন মানুষ খুন করেছে।
সক্ষম্য হতে না হতেই ঢাকা শহরে একটা গা ছমছম করা আতঙ্ক নেমে এল। যারা ঘরে
যাওয়ার চলে গেল। যারা রাস্তায় ছিল ব্যারিকেড করতে লেগে গেল।

আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। সন্ধ্যা আটটার দিকে হবে। কার্জন হলের
সামনে কিছু সোক একটা ব্যারিকেড তৈরি করেছিল। টেলাগড়ি, গৱর পাড়ি,

হাস-মুরগির খাঁচা, কবুতরের বাসা, ইট, ভাস্তা ট্রাকের লক্ষণ-বাক্স পার্টস কোথেকে
আসছিল কেউ বলতে পারে না। আলাদিনের দৈত্যবাহিনী কোন শৃঙ্খলোক থেকে এ
সকল বস্তু পুঁজি নিয়ে আসছিল, কেউ বলতে পারে না। ব্যারিকেড সামগ্ৰী আসছিল তো
আসছিলই। তারপরও তরঙ্গরা হাইকোর্টের গোড়ায় একটা তরঙ্গ লিফলিকে দীঘল
ইউক্যালিপটাসের গোড়ায় দমাদৰ কোপ বসাচ্ছিল। এই ঘূমন্ত গাছটির প্রতি আমার
খুব মায়া বসে গিয়েছিল। আমি যখন তরঙ্গদের গাছটা কাটিতে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা
করলাম, তারা একটা বিশ্বি গাল দিয়ে কুড়ালটা আমার গলায় বসাতে উদ্যত হল।
ডাগ্য ভাল, একটা দর্জির দোকানের কর্মচারী ওদের মধ্যে ছিল, তাকে আমি চিনতাম।
সে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। সেই ইউক্যালিপটস গাছটি এখনো আছে, সেই কুড়াল
কোপের আঘাত শরীরে অন্তর্লেখের মত এখনো ধৰে রেখেছে। এই পথ দিয়ে যাওয়ার
সময় দেখা হলে গাছটিকে নীৰবে আমি সালাম করি। বোৰা গাছ আমার কথা কি
বুঝতে পারে?

এই কার্জন হলের গোড়া থেকেই তোপখনা অন্ধি যেতে দেখলাম, তিনি তিনটি
ব্যারিকেড ছেটা পাহাড়ের বাচ্চার মত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সকলে কাজ করছে,
রাস্তার পিচি বাচ্চারা খবর নিয়ে আসছে—কোথায় ইট আছে, কাঠ আছে, ভাস্তা গাড়ি
আছে, আর মানুষ সেগুলো টেনে নিয়ে আসছে। আমি বসে থাকি কিভাবে? হাত
লাগিয়ে দিলাম।

হোটেলের ভাত খেয়ে সেখক সংঘের অফিসে যখন গেলাম আমার কেমন তরু
করতে লাগল। এক ধৰনের আশ্চর্য নীৰবতা চারদিক থেকে ঢাপ দিচ্ছিল।
বন্ধুবাক্সবরা কেউ নেই। আমি একেবারে এক। এই বাড়িতে যে উড়িয়া মাণি
পরিবারটি ছিল সকলে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। আমি টেলিফোনটা খুলে সাড়ে
নটার দিক এক আত্মীয়কে টেলিফোন করলাম। তিনি আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য
ছিলেন। ঘূম থেকে উঠে টেলিফোন ধৰে বিরক্ত কঠে বললেন, তোমার কী হয়েছে?
আমি বললাম, পাকিস্তান আর্মি যে মানুষ মেরেছে এই কথা জানেন কিনা? তিনি ধমক
দিয়ে বললেন, যাও যিয়া ঘূমাও গিয়ে, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তার নামটা
প্রকাশ করলাম না। কারণ ঘূকের সময় কলকাতায় যখন তাঁকে ঘটানাটি স্মরণ
করিয়ে দিলাম, তিনি বিলকুল অব্যীকার করে বললেন—আমি তাঁকে কখনো
টেলিফোন করিনি।

তখন রাত দশটারও বেশি হয়েছে। আমি পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর বোরহানউদ্দিন
খান জাহাঙ্গীর সাহেবের বাড়িতে টেলিফোন করছিলাম। তিনি তাঁর জার্নাল একাত্তর
বইতে আমার এই টেলিফোনিক আলোচনা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। আমি
ব্যারিকেডের খবর বলছিলাম, আমার ভয় লাগছে। বলছিলাম, আমি
শুন্যের উপর বুলে আছি। সেই নির্বাঙ্গক রঞ্জনীতে বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর
সাহেবেক কী গভীরভাবেই না ভালবেসেছিলাম। এখন দেখা হলে মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে
চলে যাই। জীবন এই রকমই।

রাত এগারটার পরে হবে, মাইকে খুব কঁপা কাঁপা একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম। কী বলছে, তার মর্মেঙ্গার করা সম্ভব হ্যানি। তারপর একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনলাম। বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণ। কামান গোলার্ঘত করছিল। ভোম ভোম আওয়াজ হচ্ছে। মেশিনগানের গুলি ছুটছে সৌ সৌঁ। ট্যাট্য করে ত্রি নট ত্রি রাইফেল ছুটছে। কামান রাইফেল মেশিনগানের গুলিতে একটা ভয়ঙ্কর অর্কেস্ট্রা যেন রচিত হচ্ছিল। ছাদের উপর দাঁড়িয়ে গুলির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ঝালসানো আগুন দেখতে পাচ্ছিলাম। ঘর্ষর ঘর্ষর আওয়াজে ট্যাংক এবং সোজেয়া গাড়ির বহর যখন তোপখানা রোড ধরে এগিয়ে আসছিল, দেখলাম আমাদের অতিযন্তে গড়া সাধের ব্যারিকেডটি ঝড়ের মুখে কুটোর মত উড়ে গেল।^১

সেদিন আকাশে চাঁদ ছিল। চাঁদের আলোতে দেখতে পাচ্ছিলাম ট্যাংকের উপর একটি চাকতির মত জিনিস ক্রমাগত শুরুহৈ। লম্বা লম্বা দুজন সৈন্য বাদামী ইউনিফর্ম পরে দাঁড়িয়ে আছে। চাঁদের আলোতে তাদের ভাবলেশহীন থমথমে মুখমণ্ডল আমি দেখেছি। ঘর্ষর শব্দ তুলে ট্যাংক চলছে—এই সংবাদ টেলিফোনে আমি বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরকে দিচ্ছিলাম। তারপর একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ শুনলাম। টেলিফোন বিকল হল।^২

চেতে ১৩৯৯ || মার্চ ১৯৯৩

বোধিনী

১. তুলনীয় শেকসপিয়র:

The time is out of joint, O cursed spite,
That ever I was born to set it right!

—Hamlet, 1:5 (Shakespeare 1980: 33, ll. 189-190) —সম্পাদক।

২. ১৯২০ সাল নাগাদ ফ্রয়েড নিজের পুরানা খিয়োরি সংশোধন করে নতুন প্রস্তাব মোতাবেন করেন। তার সংশোধন মোতাবেক আকাঞ্চন্দ্রপুরণই স্বপ্নের একমাত্র ব্যাখ্যা নয়। স্বপ্নের পেছনে আকাঞ্চন্দ্র বা অনাকাঞ্চন্দ্র অঙ্গীত আরেকে কারণ কাজ করে। এরই নাম বিখ্যাত অজ্ঞান বা আননকনশাস। ফ্রয়েড এই অজ্ঞানেরই অপর নাম রেখেছেন মৃত্যুজ্ঞান বা পরপারের ডাক। এই প্রস্তাব পাওয়া যায় আকাঞ্চন্দ্র প্রপারে নামক প্রবক্তে। (ফ্রয়েড ২০০০) ফ্রাসি-ফ্রয়েড নামে খ্যাত মনোবিদ্যেক মহাশ্রাঙ্গা জাক লাক্স বলেছেন মানুষের ভাষ্যব্যবহার ও মৃত্যুজ্ঞান একই কথার এপিঠ-ওপিঠ বৈ নয়। —সম্পাদক।
৩. ১৯৭১ সালে আমার এম.এ. শেখ পর্বের পরীক্ষা চলছিল। সারা বছর আমি কেন পড়াশোনা করতে পারিনি। পরীক্ষার আগের দিন ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে একটি বই ধার দিয়েছিলেন আমাকে। ফলে পরদিন পরীক্ষা দিতে যেতে পেরেছিলাম। এ সময় দয়াপরবশ হয়ে তিনি আমাকে ৪০ টাকা ধার দিয়েছিলেন। ওয়াহিদুল

ভাইয়ের কাছ থেকে আরো ৪০ টাকা ধার নিয়েছিলাম। বেরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর সাহেবও ৩৬ টাকা ধার দিয়েছিলেন। এসব খণ্ড মোধ করা আমার পক্ষে সম্ভব হ্যানি। কোনদিন সম্ভবও হবে না। বিনয়ন্ত্রিতে শুধু শ্বরণ করলাম।

দোহাই

১. John D. Wilson, ed., *The Works of Shakespeare: Hamlet* (Cambridge: Cambridge University Press, 1980).
২. Sigmund Freud, 'Beyond the Pleasure Principle', in *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud*, Vol. XVIII, John Strachey, trans. and ed. (London: Hogarth Press, 1955); also in *On Metapsychology: The Theory of Psychoanalysis*, Penguin Freud Library, vol. 11, Angela Richards, ed. (London: Penguin, 1991).

ছফাচন্দ্রিকা: বেহাত বিপুব ১৯৭১

সলিমুল্লাহ খান

'ভারত ঠিক একটি দেশ নয়, অনেক দেশের পাশাপাশি সমাহার।'

—আহমদ ছফা (১৯৭৭: ৩৬)

'ফুলপাতা যে রকম সূর্যের দিকে মুখ ফেরায়, সে রকম কোন অজানা সৌরাব্যধি
অতীতও ইতিহাসের আকাশে উদীয়মান সূর্যের দিকে মুখ ফেরাবে বলে লড়াই করে।'^১

—ভাল্টার বেনিয়ামিন (১৯৯২: ২৪৬)

কপালগুণে যেসব শ্রেণী লেখাপড়া শিখেছে তারা কিংকর্তব্যবিমৃত হয়, তাদের সঙ্গে
দেশের সাধারণ মানুষের কোন কাজের আত্মীয়তা থাকে না, জাতীয় মুক্তি সঞ্চারের
বাচি-কি-মরি-ফ্রে কে-বা-আর্থি-মেলে রে দশা কিংবা, বলা যাক, কাপুরুষতা ধরা
পড়ে। এরই ফল দাঢ়ায় নিয়মিত নির্মম ক্যাঘাত।'^২

—ফ্রানৎস ফার্নো (১৯৯০: ১১৯)

'সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে ধর্মের কোন যোগ নাই, আমার এই ধারণা স্পষ্ট হয়েছে ক্রমে
ক্রমে।'

—ডেভিড মেককাচন (১৯৯৫: ১০)

'... ধর্মনিরপেক্ষ মানে বাস্তু, অথনীতি ও সমাজ বিষয়ক অধিকার ও সুযোগ সুবিধার
প্রশ়ে ধর্মের মাপকাঠিতে কোন অবিচার না করার নিশ্চয়তা।'^৩

—নূরুল ইসলাম (২০০৩: ২৮১-৮২)

মহান লেখক আহমদ ছফা (জন্ম ১৯৪৩) এতেকাল করেছেন ২০০১ সালে। তিনি
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। যুক্তিশেষে দেশে যে দৈরাজ্য দেখা দেয়
তারও প্রত্যক্ষ দর্শক তিনি। অসাধারণ মনীষার অবিকারী আহমদ ছফা মৃত্যুক্ষেত্রে

ঐতিহাসিক তাৎপর্য ধরতে ব্যর্থ হন নাই। সেই জন্মই দেশের রাজনীতিতে
সাম্প্রদায়িকতার পুনরুত্থান তাঁকে ব্যথা দিয়েছিল। কিভাবে সম্ভব হল এ অসম্ভব?

এ প্রশ্নের উত্তর তিনি সন্ধান করেছিলেন ১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি। ৩০ বছর পর
আমরা দেখছি তার বিশ্বেষণ বহুলাখণ্টে সঠিক। বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার আসল
শক্তি জাতীয়তাবাদ নামক মতাদর্শ। এই জাতীয়তাবাদের ছায়াতলেই বিকশিত হয়েছে
সাম্প্রদায়িক ভেদবৃক্ষ ও হানাহানি। এই প্রস্তাব মহাআ আহমদ ছফার অন্যতম
অবিকার। আননিয়ো গ্রামসির ধূয়া ধরে এই প্রস্তাবের নাম আমরা রেখেছি 'প্যাসিভ
রেভল্যুশন' বা বেহাত বিপুব।

মহাআ আহমদ ছফার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ১৯৭৬ সালের মাঝামাঝি কিংবা
শেষের দিকে। তখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসে— যোতাবেক
১০৭ নম্বর ঘরে—বাস করতেন। আমার সঙ্গে দেখার সময় তিনি জার্মান মহাআ
ভোলফগাঙ গ্যোটের ফ্যাস্ট নামক কবিতার বই অনুবাদ করছেন। কিছুদিনের মধ্যে
তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা নামে এক নতুন কেতাব রচনায়ও হাত দেন।
উভয়েরই আশ গন্তব্য এককালের বিখ্যাত সাময়িক পাতা সমকাল। মহাআ সিকান্দার
আবু জাফরের এতেকালের কিছুদিন পর এই মাসিক বক হয়ে যায়। একসময় পত্রিকাটি
আবার নিয়মিত করার কোশেস শুরু করেন আরেক মহাআ, তাঁর নাম হাসান হাফিজুর
রহমান। আমাদের গুজব সেখান থেকেই শুরু করা ভাল।

খোদ লেখকের বয়ান দিয়েই শুরু করি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা নামক
কেতাব প্রসঙ্গে আহমদ ছফা বলেন:

বেশ কিছুদিন, প্রায় মাস সাতকে, আগে আমি বর্তমান রচনাটি লিখতে প্রবৃত্ত হই। আমি লিখে
যাচ্ছিলাম এবং মরহুম সিকান্দার আবু জাফর প্রতিষ্ঠিত মাসিক সমকাল-এর একটি সংখ্যায়
প্রকাশের জন্য কম্পোজ চলছিল। বর্তমান রচনার প্রায় দুই-ত্রিয়াশের কম্পোজ হয়েছিল,
বেঁধ করি এক ফর্মা ছাপাও হয়েছিল। কী করণে ঠিক বলতে পারব না, তারপর সমকাল
কর্তৃপক্ষ জানান যে লেখাটি তাঁরা বিশেষ কারণে পত্রস্থ করতে বাজি নন। (ছফা ১৯৭৭: ৩)

বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা শেষেমেয়ে ছাপা হয় দিগন্ত নামক এক অখ্যাত
এবং অন্তিমিলমে অকালমৃত অনিয়মিত সাময়িক পত্রিকার পাতায়। সম্পাদকের নাম
কলিমাদাদ খান। সমকাল কর্তৃপক্ষের 'বিশেষ কারণ' কী ছিল তা লেখাটির শেষ অধ্যায়
পঠলে স্পষ্ট হয়। আহমদ ছফা হয়তো তখন কথাটি বানান করে বলা ভদ্রজনেচিত
মনে করেন নাই। বর্তমান লেখায় আমরা কারণটি আবিক্ষারের চেষ্টা করব। আমরা যা
বলছি তা যেমন প্রথম কথা নয় তেমন শেষকথাও নয়। নতুন চিন্তানেতারা এসে
আমাদের সিদ্ধান্ত অসিদ্ধ প্রমাণ করলে বিস্মিত হব না। তবে আমার গান আমি গাইব।

তার আগে আমার এই ছফাচন্দ্রিকার আরো এক বিচ্ছেদ বাড়তে হয়।
বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা নামক বইটি—ভাগ্যের দোহাই—প্রকাশ পায়
১৯৭৭ সালের ১ মে তারিখে। অনেক দিন ছাপা না থাকায় সেই অখ্যাত দিগন্ত পাতার
মত এই অজ্ঞাত লেখাটিও প্রায় হারিয়েই যায়।

সৌভাগ্যের কথা অকলমৃত্যুর কিছুদিন আগে—বোধ করি ২০০১ সালের গোড়ার দিকে—আহমদ ছফা বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও বাঙালী জাতি নামে আর এক বালাম বই প্রকাশে সম্মত হন। (ছফা ২০০১) সেই বইয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা আবার ছাপা হয়। প্রথম প্রকাশের সময় আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধে একনে দশ অধ্যায় ছিল। অধ্যায়ের প্রারম্ভ অধ্যায় থাকে। দেখি প্রবন্ধের শেষ বা দশ নম্বর অধ্যায়টি সেখানে ছাপা হয় নাই। মাসিক সমকাল বিশেষ যে কারণে লেখাটি ছাপায় পিছপা হয়েছিল, ২৪ বছরের অন্তরে মহাআজি নিজেও কি সেই কারণের কাছেই মাথা এগিয়ে দিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর এ প্রবন্ধে সন্দান করার সময় নাই। লেখকের তিবোধামের পর বনেন্দি প্রকশ্বত্ববন ফরমাসে আমার শুক্রবৰ্ষ শিক্ষক মহাআজা মোরশেদ শফিউল হাসান আহমদ ছফার নির্বাচিত প্রবক্ত পুনরূৎপাদন করেছেন। (ছফা ২০০২) তিনি স্বীকার করেছেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা প্রবন্ধটি দুষ্প্রাপ্য। বোঝা যায় মূল বা প্রথম সংস্করণ দেখার ভাগ্য এই তাড়া খাওয়া সম্পদকের হয়নি। তিনি ধরে নিয়েছেন লেখাটির প্রথম প্রকাশ ১৯৭৮। এই গোস্তাকি মার্জনীয়। কিন্তু লেখক যে অংশটি বাদ দিয়েছেন সে অংশ সম্পর্কে কোন কৌতুহল দেখি তাঁরও হয় নাই। কর্ণজোড়ে স্বীকার করছি আমাদের হয়েছে। মরহুম আজিজুল হক সাহেবের সংগ্রহ করা বইপত্রের একটি অংশ তদীয় পত্তী বেগম হসমে আরা হক বাংলাদেশের এশিয়াটিক সমিতির গ্রন্থালয় দান করেছেন। সেখানে আহমদ ছফার বইটির এক কপিও আছে। সমিতির কর্জ স্বীকার করে আমরা বইটির নকল সংগ্রহ করেছি। আমাদের বিবেচনায় এ বইয়ের পুনর্মুদ্রণ আংশিক না করে আগাগোড়া করার পক্ষে কিছু অজুহাত আছে। একে একে ব্যান করার চেষ্টা করি।

১। ভারতের জাতিসম্ম্যাও বাংলাদেশ

১.১

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশশাসিত ভারত প্রতত্বের অন্তঃপাতী বাংলা প্রদেশের যে খঙ্গে পূর্ববাংলা প্রদেশ গঠিত হয় সেই খঙ্গ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ রাষ্ট্রক্ষেত্রে দেখা দেয়। কী ভাবে গড়ে উঠল এ রাষ্ট্র? এই প্রশ্নে আহমদ ছফার বিচার আর দশজনের বিচার মত নয়।

আহমদ ছফার মতে বাংলাদেশের রাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের জাতি—যাকে তিনি বাঙালি জাতি বলেন—ইতিহাসের অজ্ঞান উৎপাদন মাত্র, কোন সজ্ঞান পরিকল্পনার ফসল নয়। এই প্রস্তাবটির নাম আমরা দেব আহমদ ছফার এক নম্বর উপপাদ্য। ছফা লিখেছেন:

বাঙালি জনগণ যে আলাদা একটি জাতিসম্পত্তি—এখনকার তান-বাম কোথ রাজনৈতিক দলের মোধ্যাতেই তার সুস্পষ্ট স্বীকারোভিজ মেলে না। ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতেই বাঙালি জাতিসম্পত্তি নিজেকে উন্মোচিত করেছে। মনীষা ও প্রজ্ঞার বলে সচেতন বুদ্ধি খাটিয়ে ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টির নিরিখে এই জাতিসম্পত্তির অস্তিত্ব কেউ আবিষ্কার করেনি। না কোন দল, না কোন নেতা। বাংলাদেশ বর্তমানে যে কঠিন সকলে নিপত্তি, তাও মূলত জাতিসম্পত্তি চিনতে না পারারই সফল। (ছফা ১৯৭৭: ১৩-১৪)

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সঙ্গে পাকিস্তান রাষ্ট্রের তুলনা স্বভাববৃক্ষের অনুসরণ করবে এ গত্যে সন্দেহ নাই। আহমদ ছফা স্বীকার করেন, উভয় রাষ্ট্রের গড়নে মিল আছে কিন্তু চলনে কোন মিল তিনি দেখেন না। ছফার হিসাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রধান কারণ অথও ভারতের হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিযোগিতার হয়েজনেই মুসলমান জনগণের স্বত্ত্ব দেশ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার—ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও বলাবাহল্য আর্থিক—যুক্তি দানা বেঁধে উঠেছিল। মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দাবির পেছনে হিন্দুতানে মুসলমান আশৰাফ শ্রেণীর চিন্তিবিদ সৈয়দ আহমদ খান কিংবা সৈয়দ আমির আলীর মত মানুষের চিন্তাও খোরাক জুরিয়েছিল কিন্তু পূর্ব বাংলাদেশের পেছনে তেমন কোন দীর্ঘ ইতিহাস ছিল না। আহমদ ছফা বলেন, ‘কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাপারটি ঘটেছে একেবারে হঠাৎ’। (ছফা ১৯৭৭: ১৩)

আহমদ ছফার এক নম্বর উপপাদ্য মোতাবেক, বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নায়ক আওয়ামী লীগ নামক রাজনৈতিক দলটি নয়। এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নায়ক বাংলাদেশের জনগণ। আওয়ামী লীগ এই রাষ্ট্র গঠনের উপন্থত্বভোগী (বা বেনিফিসিয়ারি) মাত্র। ছফার জবাবে বলতে:

আওয়ামী লীগের পেছনে মধ্যবিত্ত শ্রেণী আদের শ্রেণিস্থারের তাঁগিদে দাঁড়িয়েছিল। তাঁরা মনে করেছিলেন, বাংলাদেশ যদি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে হয়দফা দাবি আদায় করতে সক্ষম হয় তাহলে তাঁরা বাসনা বাসিজা, কারবার তেজারতি, চাকরি বাকরিতে পর্যবেক্ষণ পাকিস্তানি মধ্যবিত্তের সমান সমান সুযোগ সুবিধা লাভ করবেন। তাঁছাড়া বৃক্ষজীবী শ্রেণীর একাংশ এবং জনগণ আওয়ামী লীগকে একেবারেই অকৃষ্ণ সমর্থন দান করেছিল। কারণ এছাড়া তাদের সামনে অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। (ছফা ১৯৭৭: ১৪)

আহমদ ছফা সত্য বলেছেন, আওয়ামী লীগ ছিল পূর্ববাংলার বিকশমান নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংগঠন। আর এই চারিত্বের সঙ্গে সুস্পষ্ট দলটির ‘মূল দাবি ছিল হয়দফা আন্দোলনের মধ্যে বাংলাদেশের স্বায়ত্ত্বাসন অর্জন করা’। অথচ এই হয়দফার মধ্যে স্বায়ত্ত্বাসনের বাইরে চলে যাওয়ার উপাদান—অত্ত জনগণের কল্পনায়—এসে হাজির হয়েছিল। অবিভক্ত ভারতে মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবি পূর্ব বাংলার মুসলমান জনগণের চোখে সন্দেশ ওরফে সব পেয়েছির দেশ বা ইয়োটেপিয়া। ছফার কথায় এই সন্দেহ ‘স্বপ্নের অঙ্গন মাখিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল’। তেমনি আওয়ামী লীগের হয়দফা দাবির প্রচারণ জনগণের চোখের সামনে আরেকটি ‘কল্পবৃণ্ণ’ বা ইয়োটেপিয়ার ভূমিকায় অভিনয় করে। কিন্তু—ছফা বলছেন—আওয়ামী লীগের

নেতৃত্ব কখনো স্পষ্টভাবে উপলক্ষি করতে পারেন নাই যে বাংলাদেশে স্বাধীন-সার্বভৌম একটি রাষ্ট্রসন্তান জন্ম হতে চলেছে এবং তারা সে সংগ্রামে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

আহমদ ছফার দেখাচ্ছেন বাংলায় জাতীয়তাবাদের উত্থানের চূড়ান্ত উত্তাল মুহূর্তেও শ্রেণীগত সংকীর্ণতা পরিহার করে বাঙালি জাতিসন্তান সঙ্গে আওয়ামী লীগ পুরাপুরি একাত্ম হতে পারে নাই। তবে ছফা কবুল করেন বাংলায় জাতীয়তাবাদের দ্রুত বিকাশের প্রধান কারণ ছাত্রসমাজের ১১ দফা আন্দোলন, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন এবং বৃদ্ধিজীবীদের আন্দোলন। ছফার কথায় এই তিনি গোষ্ঠীর আন্দোলনের ঘটকালির পথেই 'বাংলার জাতিসন্তা দ্রুত বিকশিত হয়ে উঠছিল'। এই বিকশমান জাতিসন্তান চাপে এবং জনমতের প্রবল প্রতাপে আওয়ামী লীগ তার 'স্বাভাবিক ভূমিকার চেয়ে একটু অধিক যেতে বাধ্য হয়েছিল'। পশ্চিম পাকিস্তানি মধ্যবিত্তের সঙ্গে তারা আপোস-মীমাংসায় পৌছতে পারে নাই।

আহমদ ছফার এক নম্বর উপপাদ্যের প্রধান অনুসিদ্ধান্ত ভারতের উপর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রায় পূর্ব নির্ভরশীলতা। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্ব সংগ্রামের একেবারে শেষ মুহূর্তেও 'শ্রেণীগত দোদুল্যমানতা' ত্যাগ করতে পারে নাই। তার অনিবার্য পরিণতি হয় পাকিস্তানি শাসকদের হাতে আত্মসমর্পণ, নয় ভারতের শাসকশ্রেণীর বুকে আশ্রয় গ্রহণ। জনগণের অবিবাম চাপের মুখে পাকিস্তানের কাছে আত্মসমর্পণ প্রায় অসম্ভব হওয়ার ফলে অন্য বিকল্প পরিণতিটিই ফল উৎপন্ন করেছে।

আহমদ ছফার যুক্তি এই রূপক:

আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসই করতে পারেন নি যে তাঁরা সত্ত্ব সত্ত্ব পাকিস্তানি ধর্মতাত্ত্বিক বাস্তুকাঠামো থেকে বাংলাদেশকে বের করে আনার জন্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে একটি সম্মুখ সমরে অবরুদ্ধ হতে যাচ্ছেন। তাঁদের দৃষ্টি যদি পূর্ব থেকে প্রচলিত তাহলে সে সমকে পূর্বপ্রস্তুতি ও তাঁরা গ্রহণ করতেন। বাঁশের লার্টি দিয়ে ঘরে ঘেনে দুর্ঘ তৈরির 'যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা' ঘোষণার বদলে অন্য কোন কার্যকর পদ্ধা অবলম্বন করতেন। (ছফা ১৯৭১: ১৬)

বলা বাতুলতা আওয়ামী লীগ তা করে নাই। এরই অন্যতম ফল বাংলাদেশের কোটিখালেক মানুষের ভারত চলে যাওয়া। এর ফলেই পরে 'বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে ভারত পুরোপুরি তার উপর নির্ভরশীল করে ফেলেছিল'। 'এতে কারো পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না, ঘটনার নিয়মে ঘটনাটি ঘটে গিয়েছে।' আহমদ ছফার ভাষায়, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পায়ে হেঁটে সীমান্ত পেরিয়ে আশ্রয় ভিস্ফো করতে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হল।' 'যুক্ত যুক্ত খেলা'র পরিণতি দাঁড়াল এই। কিন্তু শেষ নয়, এখানেই ঘটনার শুরু।

১.২

ভারত কেন বা কোন দুঃখে পায়ে হেঁটে সীমান্ত পাড়ি দেওয়া এই মুক্তিযুদ্ধের অভিভাবক হতে যাবে? ভারত তো একটা যুক্তি, একটা বুদ্ধি, নিদেন একটা স্বার্থবুদ্ধি থাকবে। আহমদ ছফার এক নম্বর উপপাদ্যের দুই নথর অনুসিদ্ধান্ত এখানেই টানা। এই অনুসিদ্ধান্ত অনুসারে ভারত যদি পাকিস্তান রাষ্ট্রটিকে কখনোই সম্প্রীতির চোখে দেখে নাই, যদিও পাকিস্তানকে দুর্বল করা ভারতের উদ্দেশ্য ছিল তথাপি বাংলাদেশে স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা আর যে করে করুক, ভারত করে নাই।

অনেকের বিচারে এই অনুসিদ্ধান্তও মূল উপপাদ্যের মত কঠকচ্ছিত ঠেকতে পারে। কিন্তু আহমদ ছফার যুক্তি দুর্বল নয়। তিনি লিখেছেন:

এতে কোন সন্দেহ নেই যে একটি সবল সংহত পাকিস্তানের বদলে একটি দুর্বল শুধু পাকিস্তান ভারতের জন্য অনেক বেশি কাঞ্চিত ছিল। আওয়ামী লীগের দেহত্বে বাংলাদেশ যদি ছয়দফা আদায় করতে পারে, তাহলে ভারতের সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়। কারণ কেন্দ্রীয় সম্বতি ব্যতিরেকে যদি পূর্ব পাকিস্তান পছন্দমত দেশের সঙ্গে বাণিজ্যাত্মক সম্পাদন করতে পারে, তাহলে ভারতের সমত উদ্দেশ্যই সাধিত হয়। (ছফা ১৯৭১: ৩৫)

ভারতের মনোভাব কখনো পাকিস্তানের অনুকূলে ছিল না। এ কথা সত্য। কিন্তু কথাটা আসলে কী? আসল কথা এটাই। ভারতের শাসকশ্রেণীর ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিপরীতে পাকিস্তানের জন্ম হয়। আহমদ ছফার এই বক্তব্য সর্ববাদীসম্বত নয়। বিশেষত ১৯৮৮ সালে মঙ্গলাচাৰ আবুল কালাম আজাদের 'ভারত স্বাধীন হল' বাইরের নির্ভুত সংক্রণ প্রকাশের পর পরিকার হয়েছে পাকিস্তান সৃষ্টির পেছনে কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জওয়াহৰলাল নেহেরুর পরোক্ষ সাহায্য কর ছিল না। এ আবিষ্কারের পরও আহমদ ছফার কথার এই মূল সত্য মিথ্যা হয় নাই।

জওয়াহৰলাল নেহেরু মনেপ্রাণে আসমুদ্রাইমাচল প্রসারিত বৃহত্তর ভারতের স্বপ্ন দেখতেন এবং এই স্বপ্নকে তিনি ভারতের শাসক নেতৃশৈলীর মনে ভাল করে চারিয়ে দিতে পেরেছিলেন। (ছফা ১৯৭১: ১৯)

নেহেরুর এই স্বপ্নই অনেকদিন ভারতের ইতিহাস বা ভারত-আবিকার আকারে উপস্থিত করা হয়েছে। নেহেরু ধরে নিয়েছিলেন সমাজের অশিক্ষা, অন্যাচার ও অনাধিদশার ফলে খণ্ডচেতনার জন্ম হয়। দেশ স্বাধীনতা লাভ করলে এক্যবন্ধ বৃহত্তর ভারতের সম্পূর্ণরূপ একদিন না একদিন বাস্তবায়িত হবেই। (নেহেরু ১৯৬১: ২৪-২৫, নেহেরু ১৯৪৮ এবং নেহেরু ১৯৫৬; দেখুন অস্টিন ২০০৪: ১৪৩-১৪৪) একই কথা সত্য মহাত্মা গান্ধি প্রসঙ্গেও। গান্ধিজি একদিকে বলতেন তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতকে মনে করেন স্বাধীন, স্বশাসিত ভারতবর্ষের কেন্দ্র। অর্থে তিনি পরিকার আবেদন করেন

ত্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবন্ধ মোচা গড়ার খাতিরে অঞ্চল ও অন্যান্য ছেটুশার্হের দাবি কিছুদিন ভুলে থাকা দরকার। (ব্রেটন ১৯৮৯, অস্টিন ২০০৮: ১৪৫) ভারতের রাজনীতিতে এই ফিরিতির নামই ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ আকারে পেশ করা হয়।

প্রদেশের স্বায়ত্ত্বাসন, প্রাদৰ্শিক ভাষার অধিকার, ব্রাহ্মণের নিমজ্ঞাতির অধিকার বা ধর্মভিত্তিক জাতিগোষ্ঠীর অধিকার—সবকিছুকে ভারতের পরিভাষায় বলা হয় সাংগ্রহায়িকতা। আর সাংগ্রহায়িকতার দাওয়াই ধর্মনিরপেক্ষতা, লক্ষ্য বৃহত্তর ভারত বা জাতীয় ঐক্য। শতিশালী কেন্দ্রের অভ্যন্তরে প্রদেশের সব অধিকার কেড়ে নেওয়ার দাবি ভারতীয় জনসংখ্য দলের ইশ্বরে তোকানো হয় সেই ১৯৫৭ সালেই। ১৯৬৪ সালে এই দল ভারতে প্রদেশ ভুলে দিয়ে কেন্দ্রশাসিত প্রশাসনিক জেলাব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি ভুলেছিল। এই এককেন্দ্রিক ভারতের গোড়ায় একমাত্র ঐক্যবিধানের ক্ষমতা হিন্দুর্ধম নামক একটি আদর্শের। (অস্টিন ২০০৮: ১০৫-১১১)

অর্থ ভারতের খণ্ডে স্বয়ং গান্ধীজি থেকে ভারতীয় জনসংখ্য পর্যন্ত উপায়ের ভেদ থাকতে পারে। তবে একই সঙ্গে উদ্দেশ্যের অভেদও দুর্নিরীক্ষ ছিল না। পাকিস্তানের সঙ্গে একাধিক সশস্ত্র সংঘাত হয়েছে, কিন্তু কোন যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সুবিধা আদায় করতে পেরেছে ভারত? যে যুদ্ধে যুদ্ধ সবচেয়ে কম সরাসরি সেই যুদ্ধে। আহমদ ছফা লিখেছেন ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে পশ্চিম রণাঙ্গনে হারাগতি যাই হোক, পূর্ব রণাঙ্গনে জয় ভারতের নিশ্চিত হয়েছিল। এ জয় জনমতের উপর জয়। ছফা লিখেছেন:

উনিশশ পর্যায়টি সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনী তাদের আক্রমণ মৃত্যু পশ্চিম রণাঙ্গনেই সীমিত রেখেছিল। আক্রমণকারী হিসেবে উপস্থিত হলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনেভাব বিগড়ে যাবে—এ আশঙ্কা করেই ভারতীয় সেনাবাহিনী বলতে গেলে একেবারে অরক্ষিত পূর্ব পাকিস্তানে ঝুলপথ, জলপথ কিংবা বিমানপথে কোন আক্রমণ করেনি। কোন রকমের সামরিক হামলা না করে পূর্ব পাকিস্তানের জনমতকে জয় করার ইচ্ছাই ছিল ভারত মূলে—এ কথা স্বয়ং ভারতীয় জেনারেল কাউন্স তাঁর আত্মকাথ্য শীকার করেছেন। (ছফা ১৯৭৭: ২২)

এ কথা আমাদেরও স্মীকার করতে হবে—পাকিস্তানের প্রধান শক্তি ভারত ছিল না, ছিল পাকিস্তান নিজেই। ভারত এ কথা জনত এবং ছিল পাকিস্তান নিজের কাটা খালে কখন নিজের সলিলসমাধি লাভ করবে তার অপেক্ষায়। সে অপেক্ষা বৃথা যায় নাই। ছয়দশা ১৯৬৬ সালের, আর ১৯৭১ সালের অপর নাম জয়বাংলা সে কথা ভারতের চেয়ে ভাল কে জানে? ‘পূর্বাঞ্চলের পর্যায়ত্বান্বিক শোষণের উপর পশ্চিমাঞ্চলের সমৃদ্ধি। পাকিস্তানের এই দুর্বল স্থানটিতে আঘাত করে অভ্যন্তরীণ প্রবল দ্বন্দ্বটি শাশ্বত করার কাজে ভারতীয় শাসকবর্গ সব সময় তৎপর ছিলেন’। (ছফা ১৯৭৭: ২২)

ভারতের জনগণের চোখে কি এই অন্যায়—কেন্দ্রের হাতে অধঃগলের শোষণ—অচেনা-অজানা-আনকোরা ঘটনা ছিল? ছিল না। কিন্তু জনগণের চোখে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম দেখা দিয়েছিল পাকিস্তানের ভাস্তু অথবা মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ প্রত্যাবিত রিজাতিতদের অসারতার প্রমাণ হিসাবে। ভারতের শাসকগৃহী বাংলাদেশের আড়ালে

নিজেদের রণনৈতিক স্বার্থ হাসিলের পথও খুলে নিয়েছিল। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম রিজাতিতদের স্বৰ্গ সংশোধন মাত্র ছিল না, ছিল যুগপৎ ভারতীয় অর্থ জাতিতদের অম সংশোধনও। কিন্তু সে কথা সেদিন ছায়াচাকা দুপুরে ঘূরিয়ে পড়েছিল।

ইতিহাসের গোপন কাজ আসলে হয় প্রকাশেই। অথচ কারো—প্রকাশ্য জগতের পুলিশ-দোরোগাসমাজের—চোখে পড়ে না। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে ১৯৭১ সালের দিকে প্রচণ্ড যুববিদ্রোহ চলছে। সভাপতি মাওয়ের অনুসরী যুববিদ্রোহ থেকে যুবসমাজের চোখ ফেরানোর উন্নত হাতিয়ারস্তরূপ বাংলাদেশের পদ্রাজক মুক্তিযুদ্ধ গিয়ে ভারতে হাজির। কিন্তু অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে নিজেদের জাতীয় মুক্তির অন্ত দৃষ্ট করে। আহমদ ছফার চোখ এড়ায় নাই এই দিকচিহ্ন:

পশ্চিম বাংলার জনগণের একটি অংশ সম্পর্ক ভিন্ন এক কারণে শেখ মুজিবুর রহমানের আন্দোলনের প্রতি অতিশয় সশ্রদ্ধ এবং আশাব্যঙ্গক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। তারা শেখ মুজিবের আন্দোলনের মধ্যে বাঙালির একটি জাতীয় বট্টি প্রতিষ্ঠার জুন্ত সম্ভাবনাকেই প্রতাঙ্ক করেছিলেন। (ছফা ১৯৭৭: ২৭)

জনমতের প্রবল চাপ উপেক্ষা করাও ভারতের শাসকগৃহীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় শাসকগৃহীর অভিভাবকভাব জনমতের চাপেও কিছু প্রভাবিত হয়েছে। আবার জনমতের উপর মায়ার অঙ্গন ও বুলিয়ে রেখেছে। দুটিই সত্য, একই ঘটনার এপিট-ওপিট।

১.৩

তারপরও—আহমদ ছফার অনুসিদ্ধান্ত—ভারত চায় নাই বাংলাদেশে স্থানীয় জাতীয় বট্টি প্রতিষ্ঠিত হোক। এ বকম কথা দাঁড়িয়ে বলতে মেরুদণ্ড লাগে। আহমদ ছফার সে দণ্ড পুরাদন্ত্র ছিল বৈ কি! ছফা লিখেছেন:

কিন্তু ভারত কখনো কামনা করতে পারেন তার এলাকার দফিগ-পৰ্বীঝলে ভারতীয়ক একটা জাতীয় বট্টি প্রতিষ্ঠিত হোক। বহুভাষী এবং বহুজাতিক ভারত রাষ্ট্রের একেবারে প্রাত্মসীমায় ভাষ্যভিত্তিক জাতীয় বট্টি ভারতের একেবারে পক্ষে যে মৃত্যুমান হুমকি তা ভারত সবকারের অবিদিত থাকার কথা নয়। পাকিস্তানের প্রতি যতই আক্রমণ থাকুক, ভারত-বাস্ত্রের অত্যন্তিত দুর্বলতার প্রতি তারা কম সজাগ ছিল, এ কথা মনে করলে ভুল করা হবে। যে কারণে পাকিস্তানের বট্টকাঠামো ভেদ করে পূর্বাঞ্চল বেরিয়ে আসার জন্য শরিয়া হয়ে উঠেছে, সেই সকল কারণ তো ভারত ইউনিয়নের শরীরেও সংগৃষ্ঠ রয়েছে। (ছফা ১৯৭৭: ৩৫-৩৬)

ভারতের জনগণের চোখে কি এই অন্যায়—স্বর্গে বাস করা একই কথা। ভারতে হিন্দি ভাষার আনন্দ আর সব ভাষার

জীবনকে আনন্দহীন করে ফেলেছে। ১৯৩৭ সালে মান্দাজে চক্রবর্তী
রাজাগোপালচৌধুরীর সময় বিদ্যালয়ে তিনি বছর ধরে হিন্দি পড়া ছাত্রছাত্রীদের অবশ্য
কর্তব্য নির্ণয় করা হয়েছিল। ১৯৬৫ সালে ভাষার কথায় দাঙ্গা বাধে সেখানে।

ভারতের ঐক্য—নেহরু বুদ্ধিমানের মতই আন্দাজ করেছিলেন—ভবিষ্যতের
গত্তে। পরিচ্ছন্ন অবোধের মত আহমদ ছফাও বলেন, ‘ভারত ঠিক একটি দেশ নয়,
অনেক দেশের পাশাপাশি সমাহার’। ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন যে শাসকশ্রেণীর
নেতৃত্বে, তারা হিন্দি ভাষাকে ঐক্যের নিশ্চান্ত ভেবেছিলেন। ১৯৫০ সালের পর থেকে
সেখানে প্রধানত দক্ষিণের কারণে ইংরেজিও সরকারি বা অফিসিয়াল ভাষা। সবাই
জানে হিন্দি ভারতের জাতীয় (বা ন্যাশনাল) ভাষা নয়—সরকারি (অফিসিয়াল) ভাষা
মাত্র। হিন্দিকে ভারতের ‘রাষ্ট্রভাষা’ দাবি করা হয়। রাষ্ট্র শব্দে হিন্দি ভাষায় ‘জাতি’
বোঝায়, যেমন ভারতে ‘জাতির পিতা’ কথার অর্থ রাষ্ট্রপিতা। বাংলাদেশে রাষ্ট্র মানে
জাতি ধরে নিয়ে বাংলাকে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বলা হয়েছে।

হিন্দির নেতৃত্ব ভারত মানবে কি মানবে না সে পথে নিঃসংশয় হওয়ার পথ কী?
নেহরু সে ঐক্যের পথ দেখেছিলেন ভারতীয় ধর্ম ব্রাহ্মণবাদের মধ্যে। বিশ্বজনীন ধর্ম
হওয়ার অপবাদে ভারতে উত্তৃত বৌদ্ধধর্ম দেখানে ঐক্যের বাণ্ডা বহনে অক্ষম সেখানে
ইসলাম ধর্মকে অবৈক্যের নিশ্চান্তবদার বলা অযুক্তিসম্মত নয়। কাশ্মীর ও জমুদেশে
ইসলাম যদি অবৈক্যের কঠো তো নাগাদেশে খ্রিস্টধর্মও ঠিক প্রেমের বাণী শোনায় না।
আহমদ ছফার দৃষ্টি এই অজ্ঞানের উপর পড়েছে:

একবার যদি ভারতের জাতি ও ভাষাসমূহ জেগে ওঠে এবং নিজেদের আধিক জীবনের
নিয়ন্ত্রণের জন্য আলাদা আলাদা জনগোষ্ঠীর মানুষকে সংস্কার করতে লেগে যায়, বর্তমান
ভারতের কৃতিম একই ভেঙে পড়ে এবং ভারতীয় ঐক্যের জোড়গুলো খুলে পড়তে আরম্ভ
করবে। ভারতের প্রান্তদেশে যদি কোন জাতীয় গঠন জন্মান্ত করে তাহলে শিগগির
কিংবা বিলম্বে ভারতের অন্যান্য শোষিত জাতিসমূহও এই একই পথ অবলম্বন করবে।
(ছফা ১৯৭৭: ৩৭)

বাংলাদেশে কোন সত্য জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি এ কারণেই ভারতের
শাসকশ্রেণীর স্বার্থানুকূল নয়। ইতিহাসের অজ্ঞান থেকে এই সাক্ষ হাজির করা সহজ।
আহমদ ছফা একবাক্যে নির্দেশ করেন ১৯৪৬-৪৭ সালের অখণ্ড বাংলার প্রস্তাৱ ব্যৰ্থ
হওয়ার পেছনে এক নবৰ কাৰণ বাংলাৰ বাইৱেৰ পুঁজিপতি সমাজের সমৰ্থনের অভাব।
বাংলাদেশে—ব্রিটিশ আমলেৰ বাংলা প্রদেশে—ধনতন্ত্ৰেৰ সম্যক বিকাশ না ঘটাও
বাংলায় যাকে বলে ‘দেশভাগ’ তাৰ বড় কাৰণ। আহমদ ছফার জাতিবিচার এ সত্যেৰ
মৰ্মত্বান্বেগে সক্ষম।

তাৰপৰও এ সত্যে সন্দেহ থাকা চলে না যে ভারত পাকিস্তানেৰ বিৱৰণকে যুদ্ধে
নেমেছে। এই যুদ্ধেৰ পৰ বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ভারতেৰ মধ্যস্থতায়
স্বদেশে ফিরে গেছে। যদুং না গিয়ে বাজনৈতিক চাপেৰ মাধ্যমে পাকিস্তানকে কাৰু
কৰাই ছিল ভারতীয় কৰ্তৃপক্ষেৰ এক নমৰ পৱিকল্পনা। পাকিস্তানেৰ সঙ্গে আপো-

আলোচনাৰ পথেই ভারত প্ৰথম প্ৰথম আগুয়ান হয়। কিন্তু শেষ পৰ্যন্ত একাধিক কাৰণে
যুদ্ধেৰ পথেই তাৰেৰ বেছে নিতে হয়। আহমদ ছফা সে গল্প সাতদফুয় আলোচনা
কৰেছেন। সাত নমৰ দক্ষায় তিনি উল্লেখ কৰেন, যুদ্ধেৰ বিস্তৃতি ঘটাব বা দীৰ্ঘস্থায়ী
হওয়াৰ সম্ভবনাই শেষ পৰ্যন্ত ভাৰতকে যুদ্ধে নামতে বাধ্য কৰে।

বাংলাদেশেৰ অভ্যন্তৰ থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীৰ অভ্যাচাৰে এবং স্বাধীনতাৰ প্ৰতি
দুর্দৰ্শনীয় স্পৃহায় ছেট ছেট প্ৰতিৰোধবাহিনীৰ জন্মান্ত কৰেছিল। তাৰা সংখ্যায় ছিলেন যথেষ্ট
ৱকমেৰ মুষ্টিয়ে, চৰিত্বে অনেক বেশি দৃঢ় ও প্ৰত্যয়সমূক এবং সমাজদৰ্শনেৰ দিক দিয়ে
অনেক বেশি প্ৰগ্ৰাম। তাৰা নানা হানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীৰ উপৰ
ছেটিখাট হামলা পৰিচালনা কৰেছিলেন। দখলদাৰ পাকিস্তানি সৈন্যেৰ বৰ্ণনাত্মীয় অভ্যাচাৰেৰ
মুখে তাঁদেৱ সংখ্যা দ্রুতহাৱে বৃক্ষিলাভ কৰাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা ছিল। তাৰা পাকিস্তানি
সেনাবাহিনীকে যেমন, তেমনি ভাৰতে প্ৰশংসনগুপ্ত মুক্তিযোৰ্ধনেৰ বিৱৰিতা কৰতেন।
অনেকগুলো স্থানে ভাৰতে প্ৰশংসনগুপ্ত মুক্তিযোৰ্ধনেৰ সঙ্গে তাৰেৰ স্বাসনি সংঘৰ্ষ হয়েছে।
যতই দিন অভিবহিত হচ্ছিল, ততই তাৰেৰ সংখ্যা বাঢ়িয়েল। এভাৱে যুদ্ধটি যদি গণ্ডুদেৱ
অকাৰে ভিয়েনামেৰ মত হড়িয়ে পড়ে, তাহলে ভাৰতেৰ সমূহ সৰ্বনাশ। জনগণেৰ অস্তৱ
থেকে আওয়ামী সীঁগৰে ভাৰতূৰ্তি একেবাৰে মুছে যাবে। এমনকি এক সময় তিনি তাৰেৰ
পিছনে মদদ নিয়ে দাঁড়াতে পাৰে। (ছফা ১৯৭৭: ৪১-৪২)

শেষ পৰ্যন্ত বাংলাদেশেৰ স্বাধীনতা অনিবার্য কৰে তুলল ভাৰত নয় পাকিস্তান।
কথাটি হৈয়ালিৰ মত। পাকিস্তান দাবি ছেড়ে দিয়েছিলেন মোহাম্মদ আলী জিনাহ।
তিনি মন্ত্ৰিপৰিষদ মিশনেৰ প্ৰস্তাৱ গিলেছিলেন। শুধু কংগ্ৰেস সভাপতি নেহৰু সেই
প্ৰস্তাৱ একত্ৰযোগ কৰেন বলেই জিনাহ সাবেৰ আবাৰ পাকিস্তান দাবিতে
প্ৰত্যক্ষ সংগ্ৰাম দিবস ঘোষণা কৰলেন। বাংলাদেশেৰ ঘটনাও একই বাবানেৰ। ভাৰত
চাইছে আলোচনায়-আপোসে শৰণার্থীদেৱ ফেৰতত পাঠাতে। আৱ পাকিস্তানি মোটা
সেনাপতি ও চিকন রাজনীতিবিদৰা ভাৰলেন ঘটনাৰ ভাৰসাম্য তাঁদেৱ দিকে। তাৰা
ভাৰলেন, ভাৰতকেই পাকিস্তানেৰ শৰ্ত মেনে নিতে হবে। ফলে ভাৰতেৰ পেছনে হটাৰ
আৱ জায়গা থাকল না। পাকিস্তানি উচ্চমহলেৰ ধাৰণা ‘যুদ্ধেৰ কথা বলাৰ মধ্যে যে
বিপদ আছে, সে বিষয়ে ভাৰত পুৱোপুৱি ওয়াকিবহাল ছিল।’ তাৰা ভাৰতেৰ ভাৰত
এক কোটি বাড়িত মানুষেৰ ভাৱ সব সময়েৰ জন্য বইতে রাজি হবে না। তাকে
পাকিস্তানেৰ শৰ্তে রাজি হয়ে একটা আপোস কৰতেই হবে। নতুবা একটি যুদ্ধ কৰতে
হবে। পাকিস্তান ভাৰল:

ভাৰত যদি যুদ্ধ ঘোষণা কৰেই বসে, পাকিস্তান মিত্ৰেৰ আহান কৰবে। ইয়তে পঘাটিৰ
মত সতেৱ-আঠাৰ দিন যুদ্ধ চলাবে। একটা সময় আসবে যখন বৃহৎ শক্তিৰ্গৰেৰ হতকেপে
যুদ্ধবিৱৰিতি চুক্তি কৰতে হবে। এ রকমও যদি ঘটে, পাকিস্তান দু ভাৱে লাভবান হবে— এক
কোটিৰ মত জনসংখ্যা ভাৰতে পাচাৰ কৰে দিতে পাৰবে এবং তা কৰে ভাৰতে একটি স্থায়ী
গোলমাল সৃষ্টিৰ বিবৃক্ষ বোপণ কৰে দেবে। অন্যদিকে এই অধ্যলকে একেবাৰে নিহিন্দু কৰে
ফেলতে পাৰবে। (ছফা ১৯৭৭: ৩৪-৩৫)

পাকিস্তানের সমস্যা সহজ। তারা ভাবছিল পূর্ব পাকিস্তানের শাসন-শৃঙ্খলা কোন রকমে কিছুদিন টিকিয়ে রাখতে পারলেই কেঁপ্তি করতে। একটা সময় আসবেই যখন ভারতকে পাকিস্তানের প্রস্তাবে রাজি হতে হবে। কিন্তু পাকিস্তান ভাবল এক খেদা করলেন আরেক। আহমদ ছফা দরবেশের কায়দায় বললেন, ‘পাকিস্তানি সেনাবাহিনী লজ্জাজনকভাবে পরাজিত হল।’ কারণ ইরান কিংবা তুর্কিদেশের কোন সিপাহসালার ইসলামের খাতিরেও পাকিস্তানের রণক্ষেত্রে শাহাদত বরণ করলেন না।

ভারত মহাসাগরের সগুম নৌবহরের টিকিটিও দেখা দিল না। কারাকোরাম সড়ক বেয়ে চিনের ড্রাগনের মত অপরাজেয় এবং দুর্বল চিন মিলিশিয়া দেখা দিল না। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী লজ্জাজনকভাবে পরাজিত হল। কার যুক্ত কে করে? মুসলমান কিংবা কমিউনিস্ট সকলকেই নিজের লঙ্ঘাই নিজেকে করতে হয়। (ছফা ১৯৭৭: ৮৮)

আহমদ ছফার এক নম্বর উপপাদ্য এখানেই শেষ। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলেন বাংলাদেশের জাতিগত আত্মপরিচয়ের সমস্যা মিটে গেছে।

রাশিয়া চায়নি, আমেরিকা চায়নি, ভারত চায়নি, চিন চায়নি, পাকিস্তান চায়নি বাংলাদেশে বাঙালিদের একটি জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক। তথাপি বাঙালি জনগণের দাবি অনুসারে এখানে একটি যুক্ত হয়েছে, হতে পারে সে যুক্তের ফলাফল অপরে আগ্রহাত্মক করেছে। (ছফা ১৯৭৭: ৮০)

আসলেই কি মিটে গেছে? যে জাতির যুক্তের ফলাফল, এমনকি কারণ পর্যন্ত, অপরে আত্মাত্মক করে সে জাতির জাতীয় সমস্যা মিটে যায় কিভাবে? মিটে যে যায় নাই তার প্রমাণ স্বয়ং আহমদ ছফার লেখার তিতরই। ছফা লিখেছেন: ‘বাংলাদেশে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই বাঙালি; হিন্দুত্ব, মুসলমানিত্ব এবং উপজাতিত্ব এখানে প্রধান নয়।’ (ছফা ১৯৭৭: ৮০) এখানেই প্রমাণ ‘বাঙালি’ বলতে আহমদ ছফা যে জাতির কথা বলছেন সে জাতির এখনো জন্মাই হয় নাই। বাস হওয়া দুরের কথা। সে জাতি এখনো ভবিষ্যতের গর্ভে। তবে অনুমান করতে দোষ নাই চোখের গড়নটা বাদ দিলে অনেকটা পণ্ডিত নেহরুর ভারতীয় বৃহত্তর জাতির মত দেখতে।

১.৮

আহমদ ছফার মতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ফলাফল দেশের জনগণ বা জাতি নয়, অপরে আত্মাত্মক করেছে। তার কারণ? বড় কারণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ গিয়ে পড়েছিল ভারতের হাতে। ছফার কথায় ‘ভারতের শাসকক্ষেত্রে যুক্ত’ পরিগত হয়েছিল। তার কারণ বাংলাদেশের শাসক মধ্যবিত্ত শ্রেণী শুরু থেকেই তার জাতিসন্তোষ চিনতে পারে নাই। এ প্রস্তাবকেই আমরা নাম দিয়েছি আহমদ ছফার এক নম্বর উপপাদ্য।

এখন আসা যাক দুই নম্বর উপপাদ্য। আহমদ ছফার প্রস্তাব অনুসারে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ফলাফল আত্মসাধ করেছে ভারত। তথাপি ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের দুই জীবিতাবস্থায় আছে। এখনো বাংলাদেশের শাসক মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই দুন্দের ‘দুদসন্তা’ চিনতে পারে নাই। তারা ভুল চিনেছে, ভুল চিন্তায় ভুল বে আছে। বাংলাদেশে একদল লোক ভারতের উপর নির্ভর করে ক্ষমতায় চড়তে চাইছে, আরেক দল ভারত-বিরোধিতা আড়ং করে ক্ষমতা হস্তগত করতে চাইছে। হিন্দিয়ার উচ্চচারণ করে ছফা বলেছেন: ‘দু রকমের মনোভাবই বাংলাদেশের জন্য সমূহ অমঙ্গল বয়ে আনবে’। (ছফা ১৯৭৭: ৭৭) এ কথা ১৯৭৭ সালের। ২০০৬ সালেও এর সার সত্য আছে।

আহমদ ছফার মতে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের মূল বিবাদ ধর্মে নয়, সম্প্রদায়েও নয়। কাজেই যারা ভারতীয়া আর হিন্দুত্বকে এক করে এক ধরনের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পুনঃগ্রহণের কারার চেষ্টা করছে তারা ভুল চিন্তাই করছে। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের মূল দুই ধর্মে নয়, সমাজব্যবস্থায়। বাংলাদেশের স্বাধীন অঙ্গত্ব বজায় রাখতে হলে এদেশে ব্যাপক সামাজিক বদ্বিদল প্রয়োজন। এই সমাজবদলের সংগ্রাম সফল করার অন্যতম পূর্বশর্ত ভারতের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কর্মান্বো। এ দেশে জনগণতাত্ত্বিক বাস্তু গড়ার কর্তব্যও আজ পর্যন্ত সম্পন্ন হয় নাই। আহমদ ছফা এ কথার প্রসঙ্গে ‘সমাজতাত্ত্বিক রাষ্ট্র’ লিখেছেন। সে কথা বাহ্য বা প্রকৃতি। এখানে বেগ বা ডাকটাই আমাদের ধার্য করতে হবে। আমার্কিন-ভারত বিরোধিতার মুখে বাংলায় জনগণের (ছফার শব্দে সমাজতাত্ত্বিক) বাস্তু গড়ার কোন উপায় কি তাহলে থাকছে না? আছে, সুতরাং আহমদ ছফার আশা:

... বাংলাদেশকে এমন একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার দিকে ধাবিত হতে হবে, যা অনিবার্যভাবেই ভারতীয় বহুৎ মনিক্ষেপীর শোষণ থেকে ভারতের শোষিত এবং নির্যাতিত জনগোষ্ঠীসমূহকে তাদের ভাষা, সংস্কৃত এবং আধিক দাবির প্রতি সজাগ করে ভুলবে। সংযোগে উদ্বৃক্ত করে ভারতের নির্যাতিত জাতিসম্মতসমূহের সামনে বাংলাদেশকেই সর্বপ্রথম প্রেরণার দৃষ্টান্ত সরবরাহ করতে হবে। এটা বাংলাদেশের নিয়ন্তি। (ছফা ১৯৭৭: ৭৯)

আমরা টের পাছিচ আহমদ ছফার দুই নম্বর উপপাদ্য তাৎপর্যে অনেক দূর যাবে। ভারতের শাসকক্ষেত্রের প্রতিনিধিরা এব অর্থ ঠিকই বুবাতে পেরেছেন। কিন্তু এখনো বাংলাদেশের পর-বৃক্ষিজীবী বা ট্রাইশনাল ইন্টেলেকচুয়াল রা এর অর্থ অনুধাবন করেছেন—এমন প্রমাণ বেশি পাই না। পরিষ্কার, দ্ব্যথাহীন অক্ষরে ছফা বলেছিলেন: ‘আঞ্চলিক র তৌয় কোন পথ নেই।’ তাঁর কথায়, ‘হ্যাতো বাংলাদেশকে শোষিত ভারতীয় জাতিসম্মতসমূহের শোষণের অবস্থান ঘটানোর একটা প্রক্রিয়া করতে হবে, নয়তো বাংলাদেশের স্বতন্ত্র অঙ্গত্ব চিন্তিয়ে রাখা একরকম অসম্ভব হয়ে দাঢ়াবে। এই দুরের একটিকে বেছে নিতে হবে।’ (ছফা ১৯৭৭: ৭৯)

আজ বলা যায় বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শাসকক্ষেপী ছিন্তায় পথে অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বতন্ত্র অঙ্গত্ব চিন্তিয়ে রাখা অসম্ভব করার পথে যত বিশ্বস্তভাবে পারা যায় ততটুকু অহসর হয়েছে। আহমদ ছফা স্পৃ দেখতেন সমগ্র ভারত-পাকিস্তান এবং দক্ষিণ-পূর্ব

এশিয়া জুড়ে নতুন এক সমাজ বিপ্লবের বাড় আসছে। বাংলাদেশ হবে সেই বাটিকার প্রাণকেন্দ্র। সেই বড় এখনো আসে নাই বাংলাদেশে। কিন্তু বাংলাদেশের খোদ অঙ্গিতৃই সে ঝড়ের কারণ হতে পারে। হয়তো সে কারণেই বাংলাদেশের জাতীয় স্বাধীনতাকে তার শ্রেষ্ঠ উপকর্তা ভারতের শাসকগোপী এখনো মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নাই।

১.৫

ভারত ইয়ুনিয়নের সাবেক বিদেশসচিব শ্রী জে.এন. দীক্ষিত (ইংরাজি উচ্চাবরণে 'ডিক্ষিট') ১৯৯৬ সালে 'দক্ষিণপাঞ্চায় করকে বছর: বিদেশসচিবের স্মৃতি' নামে এক বালাম বই প্রকাশ করেছিলেন। সে বইয়ে প্রতিবেশী ছোট ছেট দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বিষয়ে একটি বড় অধ্যায় আছে। এই বড় অধ্যায়ে তিনটি ছোট উপাধ্যায়। একটি মিয়ানমার, আর দ্বিতীয় মেপাল ও বাংলাদেশ বিষয়ে। মেভাবে লিখেছি সেই ক্রমে। বিদেশসেবায় নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তারা সবচেয়ে বেশি টোকস হন—আমাদের সংক্ষার এ রকমই। শ্রীদীক্ষিতকে আদেবেই দলভুক্ত ধরে নিতে অন্যায় নাই। তার বইয়ের বাংলাদেশ অধ্যায় আমাদের পড়তে হয়েছে। তিনি দাবি করেছেন তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সফর ভারতপক্ষে বিজিত ছিলেন এবং স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ পর্যন্ত এই দেশে কর্তৃব্যরতও ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের—বলা যাক নামকাওয়াতে—নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নামটি পর্যন্ত শুন্দি লিখতে পারেন নাই। বলাবাহুল্য জেনারেল জিয়াউর রহমান ও বেগম খালেদা জিয়া সবার নামই তিনি ভুল বানানে লিখেছেন। রহমানকে লিখেছেন রেহমান, খালেদাকে খালিদা ইত্যাদি। (দীক্ষিত ১৯৯৬: ১৫৪-১৫৬)

একমাত্র শেখ মনির নামটি তিনি সোজা লিখতে পেরেছেন। অবশ্য ফজলুল হক গুদ্ধ-অগুদ্ধ কোনটাই লিখতে পারেন নাই। চেষ্টা করলে দেখা যেত বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তার 'প্রগাঢ়' শৰ্কা কতখানি গাঢ়। তিনি ১৯৭৪ সালের প্রতিচারণ করাইলেন ১৯৯৬ সালে। শ্রীদীক্ষিত লিখেছেন ১৯৭৪ সালের শেষদিকে তিনি ওয়াশিংটনের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়ছেন। বিদ্যায়ের আগে একবেসা—তাঁর ভাষায়—তার সঙ্গে 'গ্রয়াত শেখ মুজিবুর রেহমানের ভাগো' শেখ মনির নামের জটিল তরঙ্গের আলাপ চলছিল। মনির পরিচয় দিয়ে তিনি লিখেছেন, মনি ছিলেন মুক্তিবাহিনীর একজন খাঁটি (এ টু স্লু মেদ্বার) বা অভিজাত সৈনিক এবং ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীবন্দনের এ স্তুৎ বিলিভার বা জোর সমর্থক। শ্রীদীক্ষিতের মতে মনি মনে করতেন মাত্রাতিক্রিক ইসলামি লেবান পরিধান না করে বাংলাদেশ যদি শুধু বহুমতি ও বহুপথিক সমাজগঠনে ব্রহ্মী হয় তবেই মাত্র দেশটা আধুনিক ও ধনী হতে পারবে।

বিদায়পর্বের আলাপালোচনার এক পর্যায়ে, শ্রীদীক্ষিত জানাচ্ছেন, তিনি বললেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা অনেকদিন মনে থাকবে। মনি বললেন কথাটা ঠিক নয়। বললেন মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি আপনার মনে থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু কালক্রমে সে কথা সকলেই ভুলে যাবে। হয়ে উঠবে নিছক ইতিহাস।' আরো বললেন:

দাদা (দীক্ষিত ইংরেজিতেও 'দাদা' কথাটি রেখেছেন), দশ বছর যেতে না যেতেই লোকের মনোভাব বদলে যাবে। মনের যে ভাবকে প্যারান্যা বা ভয়চারচর বলে ভাবতে আমরা সেই রকম ভয়ের ভয় পাওয়া অবস্থায় ফিরে যাব। আমরা ইসলামী লেবাসের আড়ালে আশ্রয় প্রাপ্ত করব। আপনি যদি দশ কি পনর বছর পর চাকায় আদেশই কোনদিন আসেন দেখবেন আমাদের বেশির ভাগের নিতান্ত চক্ষুলজ্জা (ইংরেজিতে 'চক্ষুলজ্জা' ওরকে চক্ষুলজ্জা লেখাৰ পৰ তত্ত্বা দেওয়া হয়েছে 'সাফিসিয়েন্ট শেম ইন দি আই') থাকবে না। আমরা বলব আপনারা আমাদের জন্য যা করেছেন তা সঙ্গেও আমরা আপনাদের মিতালি বজায় রাখতে তটসূ নই। কথাটা আমরা মুখের ওপরই বলে দেব কিন্তু। (দীক্ষিত ১৯৯৬: ১৫৪-১৫৫)

তারপর পদ্মায় অনেক জল ঢাকায় অনেক বজ্জ গড়িয়েছে। এখন মনি আর বেঁচে নাই। দীক্ষিতের কথার সত্যতা যাচাই করার উপায় নাই। ১৯৯১ সালে জে. এন. দীক্ষিত ভারতের বিদেশ মন্ত্রণালয়ে—দক্ষিণপাঞ্চায়—বড়কর্তার কর্মভাব গ্রহণ করেন। ততদিনে বাংলাদেশে জেনারেল এরশান্দের পর 'বেগম খালিদা জিয়া' ক্ষমতাসীমা। দীক্ষিত লিখেছেন: এতদিনে মনির কথা ফলেছে। শুন্দি ফলেনি, হুবু ফলেছে। দীক্ষিত লিখেছেন মনির দিব্যদৃষ্টি ছিল বলতেই হয়। নিহত হওয়ার দশ মাস অগে তিনি যা বলেছিলেন বাংলাদেশ অবশ্যে তাই হয়েছে।

১৯৭৫ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রশাসন হয় পুরাপুরি নয় আংশিক সামরিক প্রশাসন—এ কথা বলার পর দীক্ষিত বললেন এতে দেশবাসীর মনে নানা অভিযোগ দেখা দেয়। তার ফলেই সরকারের পরিবর্তন। কিন্তু—তিনি লক্ষ্য করলেন—একটা বিষয়ে কোন পরিবর্তনই হয় নাই। সে বিষয় ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক। বাংলাদেশ ভারতকে তলে সন্দেহ করে, বিশ্বাস করে না। শক্তভাব বিরাজমান। কথন থেকে এই অপরিবর্তিত মনোভাবের ঘুরু? দীক্ষিত ইঙ্গিতই মাত্র করেন নাই সরাসরি বললেনও এর কৃতাত্ত্ব 'শেখ মুজিবুর রেহমানের'। ১৯৭৪ সালের মার্বামারি শেখ মুজিব শিজেই বাংলাদেশের ইসলামি লেবাসধারন প্রক্রিয়া শুরু করেন।

দীক্ষিত মহাশয় একটা ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। অবশ্য 'সংক্ষেপে'। বাংলাদেশের এই সমাজ ও রাজনীতিগত মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে অনেক কারণে। এক নদৰে বাংলাদেশকে খাঁটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলাৰ মত কোন বিশ্বাসের জোর মুজিবের ছিলই না। ইংরেজিতে ব্যবহৃত কথাটা 'এ জেনুয়িনলি সেকুলার ডেমোক্রেসি'। দুই নদৰে তিনি ইচ্ছা করেই বাংলাদেশের রাজনীতি, সরকারি চাকারি এবং সামরিক বাহিনীতে বিপুলসংখ্যক পাকিস্তানি মনোভাবাপন্ন ও মুক্তিযুদ্ধবিবোধী লোকের প্রবেশাধিকার অবাধ করে দিয়েছেন। দীক্ষিতের মতে তিনি

এই সব লোকগুলো নিয়েছিলেন ইনস্বার্থে, নিজের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি নিরঙ্গণ করার তাগিদে। শেষ পর্যন্ত এ ফাঁদে তিনি পড়ে মরেছেন।

ভারতের সাবেক বিদেশসচিব তারপর বললেন ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। এতক্ষণে বাংলাদেশ ইসলামি প্রজাতন্ত্র হয়েছে। ইংরেজিতে লেখা—“উইথ দ্য প্যাসেজ অব টাইম বাংলাদেশ বিকেম এন ইসলামিক রিপাবলিক”। এ কথা বলার পরপরই তিনি লিখছেন: ‘এই পথে প্রথম পা ফেলেছিলেন মুজিব নিজেই। তিনি ১৯৭৪ সালে লাহোরে ইসলামি দেশসংস্থার শীর্ষ সম্মেলনে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন তিনি এ কথা ভুললে চলবে না’। (দীক্ষিত ১৯৯৬: ১৫৬)

শ্রীনীক্ষিত খেয়াল করেছেন, বাংলাদেশে যে দলই ক্ষমতায় আসুন না, তিক্তে হলে সেই দলকেই দুটি শৃঙ্খলা পূর্ণ করতে হয়। এক নথরে, দলটিকে প্রমাণ করতে হয় তারা কিছু পরিমাণে হলেও ভারতবিবোধী। দুই নথরে, তারা কিছু না কিছু হলেও ইসলামি চরিত্র বা পোশাক পরতে রাজি। সমস্যার মধ্যে ভূগোল আর সামরিক বিবেচনা। ভারতের সঙ্গে আবার সম্পর্কও রাখতে হবে। এরই ফল বাংলাদেশের বাজারীতিতে জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য ইসলামি রাজনৈতিক কঢ়ের জগৎ।

শ্রীনীক্ষিতের দৃষ্টিতে এর অন্যতম ফল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের যোগদান বিষয়ে ভুলবোৰাবুৰি। দীক্ষিত মনে করেন, ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল সেই সময়ে বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থ ও ভালবাসার সঙ্গে ভারতীয় জনগণের স্বার্থ ও ভালবাসার মিল দেখা দেওয়ার কারণে। স্বার্থ ও ভালবাসা—ইন্টারেসেট অ্যাক্স ইমোশনস—নিতান্তই মানবিক। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে ভারত কেন জড়িয়েছিল? এ প্রশ্নের উত্তরে আজ বলা হচ্ছে অন্য কথা। ভারত জড়িয়েছিল তার নিজস্ব স্বার্থকেন্দ্রিক রাজনৈতিক চাল হিসাবে। এখানে ইংরেজি শব্দে কুলায় না—ব্যবহৃত শব্দটি জার্মান, নাম রিয়ালপলিটিক। বাংলায় বলা যাক চাগক্যনীতি।

ভারতের নীতি চাগক্যনীতি নয়, গ্রীতি যদি ধরেও নেওয়া যায় তবুও প্রশ্ন থাকে বাংলাদেশের বাজারীতিতে ভারতীয়তির এত ব্যাপকতা কেন? শ্রীনীক্ষিত এর সন্দুর দেওয়ার চেষ্টা করেন নাই। শুধু দায়ি করেছেন ইসলামি মনোভাবকে। খানিক তাসত্ত্ব আছে এর মধ্যে। অবিচার তো আছেই। অবিমূক্ষুরাইতাও কম নাই।

১.৬

আহমদ ছফা তো বলেই ছিলেন, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের জনগণের মূল দুন্দু ধর্মে নয়। দুন্দু যদি কিছু থাকে তবে তা পশ্চিম বাংলার কবি শক্তিবাবুর শব্দে বলা যায়, আছে জিরাফে। কিন্তু ভারতীয় বৃন্দজীবীরা জিরাফের বড় গলা না দেখে ধর্মের কানকে দেখছেন?

স্মরণ করা প্রয়োজন ভারতে ইন্দির প্রাথম্য প্রতিষ্ঠার দাবি সচরাচর শক্ত কেন্দ্র আন্দোলন হিসাবে হজির আছে। শক্তিকেন্দ্র বা হিন্দুপুঁজি বিরোধিতার রূপও কমপক্ষে

চার প্রকার আছে। একটাকে বলে জাতপাত মতবাদ বা কস্টিজম, দ্বিতীয়টির নাম আঞ্চলিক ভাষাবাদ বা লিঙ্গুইজম, তৃতীয়টা ধর্মীয় সম্প্রদায়বাদ বা হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, চতুর্থটার নাম আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্বসম্বাদ। মজাৰ বিষয় সব বিরোধিতারই মুঙ্গপাত কৰা হয় এক গালিতে। এই গালিৰ নাম সাম্প্রদায়িকতা বা কমুনালিজম। (অস্টিন ২০০৪: ১৪৯) বাংলাদেশের ভারতভীতিকেও ভারত যে একজাতীয় সাম্প্রদায়িকতা বলে চালিয়ে দিতে চাইছে শ্রীনীক্ষিতেই তার প্রমাণ।

বাংলাদেশের জাতীয় বন্ট্রুপ্রতিষ্ঠার অর্থ দুটা হতে পারে। একটা সাম্প্রদায়িক—শুধু মুসলমান প্রধান দেশ বলেই বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে মিশে যায় নাই। অন্য অর্থ হতে পারে বাংলাদেশ আলাদা জাতিৰ বাসভূমি। তাই সে মুসলমান হিসাবে নয়, আলাদা অন্য নামেৰ জাতিৰিপে এখানে রাষ্ট্ৰ-সংধিনা কৰছে। এ জাতিৰ প্রধান সম্পদ আপাতত তাৰ ভাষা। এই নীতি যদি নীতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায় তবে বৰ্তমান ভারতেৰ জন্য তা নিত্য হুমকিৰ কাৰণ। ইসলাম জুজুমাত্র।

বাংলাদেশেৰ কোন কীৰ্তি নয়, খোদ অস্তিত্বই ভারতেৰ উত্তৰপথ শাসকশ্রেণীৰ জাতীয় অহক্কারে যা দিচ্ছে। আহমদ ছফার তাৎপৰ্য এখানেই। বাংলাদেশে জাতীয় রাষ্ট্ৰ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ভাৰতবৰ্ষেৰ অসমাগু জাতি সমস্যাৰ সামান্য তাত্ত্বিক সূত্ৰ—এ কথা সন্তুষ্ট তিনিই প্রথম এত স্পষ্টাকৰে বলেছেন। জার্মান দার্শনিক ভাল্টাৰ বেনিয়ামিনেৰ সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমৰাও আশা কৰতে পাৰি বৈ কি, ইতিহাসেৰ আকাশে উদীয়মান সূৰ্যেৰ দিকে মুখ ফেৰাবে বলে অতীতও লড়াই কৰে। ফুলপাতা যে রকম সূৰ্যেৰ দিকে মুখ ফেৰাব, অতীতও ফেৱায়—কিন্তু কোন আকৰ্ষণে? সে কাৰণ আমাদেৰ আজো আজানা।

বাংলাদেশে এখনো তেমন কোন জাতীয়শ্রেণীৰ চেহারা দেখা যাচ্ছে না যাবা এই সৌৱ আকৰ্ষণবন্দুৰ ভূমিকা পালন কৰতে পারে। ফ্রানৎস ফানোৰ কথিত ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীৰ মত বাংলাদেশেৰ বৰ্তমান শাসকশ্রেণীও এ বিষয়ে কিংকৰ্ত্বব্যাবিমূচ্ত। দেশেৰ সঙ্গে তাদেৰ আত্মায়তার বকল ক্ষীণ। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামেৰ কৰ্তব্য বিষয়ে তারা হয় অনবহিত, নয় জ্ঞানপাপী কাপুৰূপ।

দার্শনিক বিপ্লবী মহাত্মা ফ্রানৎস ফানোৰ লেখা আহমদ ছফা মনোযোগ দিয়ে পড়তেন। আমাকেও তিনি এই মহাপুরুষেৰ লেখা পড়িয়েছেন। ফানোৰ কথা যদি সত্য হয় তবে ভারতেৰ আপাতত ভয় পাওয়াৰ কাৰণ নাই।

২। ১ মুক্তিযুদ্ধ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী

২.১

ইংরেজি ফৱাসি আদি পশ্চিমা ভাষায় চিনেৰ মুক্তিযুদ্ধকে চিনা বিপ্লব বলা হয়ে থাকে। তবে খোদ চিন দেশে ১৯৪৯ সালেৰ বিপ্লবকে চিনেৰ মুক্তিযুদ্ধই বলা হয়। (হান সুয়িন

১৯৭৬: ১৭) বাংলাদেশের কোন কোন পণ্ডিত—যথা অধ্যাপক তালুকদার মনিরজ্জামান—১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের নাম বদলে 'বাংলাদেশের বিপ্লব' রাখতে চেয়েছিলেন। যতদূর জানি সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়ে নাই। বাংলাদেশের বিপ্লব এখনো সাধারণ ভাষায় মুক্তিযুদ্ধ নামেই জারি আছে। বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একাংশ মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে 'মুক্তিযুদ্ধ' শব্দটির বদলে 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' শব্দযোটক চালু করতে সফল হয়েছে। এ কথা অস্বীকার করার জো নাই। সংশোধিত সংবিধান তার সাক্ষী।

নাম বদলের ইতিহাস প্রকৃত প্রস্তাবে ইতিহাস বদলেরই অপর নাম মাত্র। পশ্চিম জাতির নেতারা সারা পৃথিবীকে সমবাতে চেয়েছিলেন চিনের বিপ্লব বিপ্লব মাত্র—অর্থাৎ চিনে কমিউনিস্ট দলের ক্ষমতা দখলের অধিক কিছু নয়। ওদিকে চিনের নেতারা বলতে চেয়েছিলেন এই বিপ্লব মুক্তিযুদ্ধ—অর্থাৎ পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকেও মুক্তি। তার চাইতেও ওজনে এক তোলাও কম নয়। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতি হিসাবে চিন লড়াই করেছে। সে লড়াইয়ের নেতা হতে পেরেছে বলেই কমিউনিস্ট পার্টি চিনের ক্ষমতা হাতে পেয়েছে। চিনের যুদ্ধ তাই মুক্তিযুদ্ধ। ১৮৩৯ সালের পয়লা আক্রিম যুদ্ধ থেকে এর সালগুমারি। ১৯৪৯ সালের মুক্তিতে এর সমান্তি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নামও জনগণের সহজ আশা ও বাসনার ভাবমূর্তি হিসাবেই জড়ে বসেছিল। অনেকেরই মনে থাকবে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে বাংলাদেশের প্রতিরোধ যোদ্ধাদের 'মুক্তিকৌজ' বলে পরিচিত করা হত। কিছু দিন মানে কয়েক মাস পর সে নাম দাঢ়িয়ে 'মুক্তিবাহিনী'। 'বাংলাদেশ' নামটিও কি গোড়ার দিকে 'বাংলা' 'দেশ' আকারে লেখা হত না? বাংলাদেশ যে এক শব্দ নয়, দুই শব্দের যোগফল, সেটা এখন বোরার উপায় নাই। প্রথম দিকের বইপত্রে তা-ই ছিল।^৪ একইভাবে এখন দেখা যায় সবুজ জিমিনের মাঝে লাল সূর্য বাংলাদেশের পতাকায় উদিত হয়েছে। তখন সূর্যের মাঝামে ছিল সে কালের পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্র।

এসব কথা এখন স্মরণ করার দরকার কী? এখন তো বাংলাদেশের সরকার বাঙালিদের হাতে। আরো খাস করে বললে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে। কেউ কি বলতে পারবেন এ কথা সত্য নয়?

মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিবাহিনী, বাংলাদেশ বা বাংলাদেশের পতাকা—সমস্ত তথ্য হাজির করলে একটা কথাই সিদ্ধ হয়। বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে স্বায়ত্ত্বাসনের সংগ্রাম করেছে বটে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। মহান লেখক আহমদ ছফা ১৯৭২ সাল থেকে ২০০১ সালের বিদায় পর্যন্ত সমস্ত দেখায় এই কথাটি ঘুরেফিরে হাজির করেছেন। বিশেষ ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত এক নাতিদীর্ঘ প্রবক্তে এই উপপাদ্যই তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। (ছফা ১৯৭৭)

তারপরও আহমদ ছফা একটি সত্য স্বীকার করেছেন যে ঘটনাধারার পরিণতিতে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিল তার নেতা মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দল আওয়ামী লীগ এবং সেই দলের তর্কাতীত নেতা শেখ মুজিব। দুঃখের বিষয়া, সেই নেতা, দল ও শ্রেণী মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তারই পরিণতি

একদিকে ভারতের শাসকশ্রেণীর উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা, অন্যদিকে পাকিস্তানের সঙ্গে, পাকিস্তানের প্রভু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আপোসের প্রবণতা। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গড়ন ও মনের বিচার ছাড়া তাই বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের বর্তমান পরিণতি বৈবাস সহজ হবে না। আহমদ ছফা এ কথা সতরের দশকের মোড়াতেই সুবাতে পেরেছিলেন।

তারপরও যে এখনো বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্রিক খাড়া আছে, মুক্তিযুদ্ধের নাম ধরে এখনো যে এই দু চার পাতার প্রবন্ধ, তারিখ কারণ আছে। বাংলাদেশের জনগণ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। তবে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব তাদের হাতে ওঠে নাই। ওদিকে তাদের বাদ দিয়েও মুক্তিযুদ্ধ চালানো সম্ভব হয় নাই। জনগণের মুক্তিযুদ্ধ আজো এই অর্থে জনগণেরই যুক্ত। বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের যুদ্ধ সম্পর্কে এ সত্যই এক নম্বর সত্য। এ যুদ্ধের দ্বিতীয় সত্য, শাসক মধ্যবিত্ত শ্রেণী এ যুদ্ধের ফলাফল আত্মান করেছে—জনগণের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে নাই। সে বিরহই শেমাবধি বিচ্ছেদে পরিণত হয়েছে।

এই বিচ্ছেদের পরিণতি—১৯৭২-১৯৭৫ পর্যন্ত সময়ের প্রায় দৈরাজ। ১৯৭৫ থেকে আজ পর্যন্ত যে পরিণতি তার জননীও সেই মুক্তিযুদ্ধকালীন বিচ্ছেদই—শাসক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে শাসিত জনগণের বিচ্ছেদ।

এ বিচ্ছেদেরই বড় প্রমাণ ১৯৭৫ সালের মাঝামাঝি শেখ মুজিবের পরিবারসহ নিহত হওয়ার ঘটনা। ওয়াকিবহাল মহল জানেল আহমদ ছফা শেখ মুজিব সরকারের সমর্থকও ছিলেন না। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হওয়ার দু বছর পর হওয়ার আগে তিনি যা লিখেছিলেন তা মুজিবের নামে সকল-সক্ষা জিন্দাবাদ দেওয়া বুদ্ধিজীবীরা তিবিশ বছর পরও লিখতে পারছেন না। ছফা লিখেছিলেন:

সত্যি আশ্চর্যের বিষয় দেশের ডান-বাম প্রবাণ-নবীন কোন নেতা, কোন লেখক, কোন শিল্পী প্রকাশে এগিয়ে একটি কথা উচ্চারণ করেন নি। শেখ মুজিবের জন্য নয়, এই জাতির জন্য। কারণ একটি ঐতিহাসিক পর্যায়ে ডান-বাম সমস্ত শক্তি যখন নানা ঘাত প্রতিঘাতে পর্যন্ত হয়ে পড়েছে, সেই সময় তিনি একটা নেতৃত্ব রচনা করেছিলেন। অন্য অনেকের কথা বাদ দিলেও অস্তু বৰ্যায়ন জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এই কাজটা করতে পারতেন। কারণ তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে নানা ব্যাপারে সহযোগিতা করতে কসুর করেন নি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ইতিহাস এ নিয়ে একদিন ধৃশ্য উত্থাপন করবে এবং পরবর্তী বৎসরের সকলকে সমানভাবে অপরাধী সাবাস্ত করবে। (ছফা ১৯৭৭: ৭৫)

শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডে বিপ্লব ঘটে নাই। যা ঘটেছে তার নাম এক ধরনের উপপ্লবের অধিক রাখা যায় না। মুজিবের মৃত্যুর পর দু-দুর্বার ক্ষমতার পরিবর্তন হয়। সর্বশেষ পরিবর্তনে যিনি ক্ষমতায় আসেন তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একাংশের আকাঞ্চন্দ্র মৃত্য হয়ে ওঠেন। তিনি নিজে মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু আমরা আগেই টুকে বেখেছি—'মুক্তিযুদ্ধ' নামটি তিনি পছন্দ করেন নাই। জিয়াউর রহমানের সামরিক সরকার সম্পর্কে আহমদ ছফা বলেছিলেন, সে সরকার সামাজিক দৈরাজ বেশ প্রশংসিত করতে

পেরেছিল। একইভাবে পেরেছিল আর্থিক জীবন অনেকদূর সুগঠিত করতেও। কিন্তু বাংলাদেশের জাতীয় আত্মপরিচয় কিংবা রাষ্ট্রীদর্শ সমস্যার কোন সমাধান বা সমাধানের স্বাক্ষর জিয়াউর রহমানের সরকার দিতে পারে নাই।

বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রথম সরকার জাতীয় আত্মপরিচয় প্রকট করতে একটি উপপন্থি বা থিয়োরির অশ্বয় নেয়। সেই থিয়োরির বোঁক ছিল বাঙালি বলতে এমন কোন পরিচয় দেওয়া যাব ভিত্তির এই বাংলাসুন্দ অধিন ভারতবর্ষের সাত-আটশ গড়ে ওঠা বছরে মুসলমান জাতিগোষ্ঠীর কোন সংক্ষাব থাকবে না। এই উপপন্থি নেহাত ছেলেমানুষি নয়, একটি মৌক্কিক অনুপপন্থি বা ফ্যালাসি বটে। এর প্রস্তাবক কালাবতগণ টের পান নাই, এই অনুপপন্থিরও ইতিহাস আছে। জেনারেল জিয়া এর পাট্টা আরেক অনুপপন্থি হাজির কৰার অভিলাষে পাকিস্তানি যুগে ফিরে গেলেন। ফলে প্রথম অনুপপন্থির সম্যক কোন সিদ্ধবাদের ঘাড়-সওয়ার দৈত্যের মত চেপে আছে। এক মিথ্যা দিয়ে আর মিথ্যার সমাধান হয় না—এ কথা এখনো মাথায ঢেকে নাই আমাদের।

২.২

মুক্তিযুদ্ধের অভিভূতা বাংলাদেশের সামনে দুইটি ঐতিহাসিক প্রশ্ন তুলে ধরেছিল। প্রথমটির নাম ছফা যাকে বলেন 'জাতিগত আত্মপরিচয়' সেই সমস্যা। আমরা বলতে পারি এই সমস্যার নাম জাতীয় মুক্তির প্রশ্ন। দ্বিতীয় সমস্যার নাম তিনি কোম্পল রউ কথা কও জাতীয় ভাষায় বাখেন 'রাষ্ট্রীদর্শের সমস্যা'। আহমদ ছফা যতটা না জ্ঞানী তার চেয়ে বেশি ছিলেন বিজ্ঞ মানুষ। তাই কঠিন কথা তিনি চীবরধারী মুনির মত সহজ কথায় প্রকাশ করতে পারতেন। তিনি বলেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের ফলে বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তির কাজটি হয়ে গেছে। তার আগন কথায়, 'প্রথমটির মীমাংসা হয়ে গেছে'। (ছফা ১৯৭৭: ৭৯) এটাকেই তিনি মুক্তিযুদ্ধের নগদ উপার্জন জ্ঞান করেছিলেন। তাই তার জৰানিতে পাই: 'বাংলাদেশে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলৈ বাঙালি; হিন্দুত্ব, মুসলমানিত্ব এবং উপজাতিত্ব এখানে প্রধান নয়'। (ছফা ১৯৭৭: ৮০)

এই জৰানির গোলটা কোথায়? শেখ মুজিবের কঠিন্তর এই বাকো কি শোনা যাচ্ছে না? প্রসিদ্ধ ইতিহাসকর আবদুল করিমও দেখলাম এই মতেরই পোমক। (আবদুল করিম ১৯৯০) কিন্তু ইতিহাস রাস্তকপুরুষ বলে যে খ্যাতি আছে, তার কী হবে? উপজাতি কী বস্তি? বাঙালিকে জাতি ধরেই মাত্র উপজাতি। উপজাতির সংজ্ঞাই কি এই নয় যে, তারা বাঙালি নয় বলেই উপজাতি বাঙালি ও অবাঙালি যিলে যদি একটা মহাজাতি হয় মন্দ নয়। কিন্তু তার আগে উপজাতিকে একই সঙ্গে উপজাতি ও বাঙালি দুই সন্দৰ্ভে দেওয়া কি ঠিক? পর্যবেক্ষণ চট্টগ্রামের তিনি জেলো ছাড়া অন্য জেলায়ও অবাঙালি জাতিগোষ্ঠী বাস করে। তাদের জোর কম হতে পারে কিন্তু তাদের হাজিরা বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীজাত জাতিত্বের অসারাতাই প্রকট করবে।

মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের সামনে আরো একটি প্রশ্ন তুলে ধরেছিল। সে প্রশ্নের নাম রাষ্ট্রীদর্শ। বাংলাদেশে বাঙালির বন্ত্রপ্রতিষ্ঠার ব্যবহারিক মুক্তির নাম গণতন্ত্র। সংখ্যাগুরু জনগণের সম্মতি অনুযায়ী প্রচলিত শাসনকে যদি গণতন্ত্র বলা যায় তবে বাংলাদেশের গণতন্ত্র মানে বাঙালির রাষ্ট্র। পাকিস্তানি যুগে আজকের বাংলাদেশখনের জনগণ সেই গণতন্ত্রের যুক্তিতেই মুক্তিযুদ্ধের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে আসে। কিন্তু প্রিসের গণতন্ত্রের সর্বপ্রধান কেলেক্ষনার কথা কে না জানে? যিক গণতন্ত্র মালিক শ্রেণীর উত্তাবন। তারা একই সঙ্গে জনসাধারণকে দাস অবস্থায় স্থায়ী করে নাই কি? বাংলাদেশে আগত পশ্চিমা গণতন্ত্রে তার ব্যক্তিক্রম কোথায়? সর্বজনের ভেটাধিকারে? কিন্তু এই ভেটাধিকারের সত্ত্বেও আধুনিক পৃথিবীতে এমন আর্থিক বিধি ও ব্যবস্থা কায়েম আছে যাতে কেবল মালিকশ্রেণীরই শাসন করার অধিকার নিরঙ্খন হয়। বাংলাদেশ তার ব্যক্তিক্রম হবে কেন? হতে পারত যদি মুক্তিযুদ্ধের যাচন্দার জনগণ তার মালিক-মোকারও হত।

আহমদ ছফা বলেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে সমাজতন্ত্র শব্দটি উৎক্ষেপ করে। কিন্তু সে শব্দ বা পদ পদার্থ হয় নাই। ছফার ভাষায থেকে গেছে 'অঙ্গীকার'। (ছফা ১৯৭৭: ৮০) হালফিল বাংলাদেশ সেই অঙ্গীকার থেকে শুধু দূরেই সরে যায় নাই, তার বিপরীতমুখ্যেও চলেছে। এই চলার গতিতে দেশের আর্থিক ব্যবস্থা শুধু সমাজতন্ত্রবিরোধী নয়, জাতীয় মুক্তির পথও কস্টিকিত করেছে সে। বাংলাদেশে এখনো মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্ষমতায় বহাল। এদের সমর্থনেই পশ্চিমা পুঁজির প্রবেশ এদেশে অবাধ হয়েছে। কিন্তু সে পুঁজি এদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করার জন্য যতটা মরিয়া, দেশের বিবিধ শিল্পকরখানা প্রতিষ্ঠার জন্য তার দু আনাও বিনিয়োগ করে নাই। দেশ পরাধীনতার নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। আহমদ ছফার তারিফ করতেই হবে—কেননা তিনি বলেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল সমাজতাত্ত্বিক রাষ্ট্রীদর্শের অঙ্গীকার। এই প্রশ্নাবে যদি বিন্দু পরিমাণ সারবস্তু থাকে তো বলতেই হবে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার থেকে সরে গেছে। প্রশ্ন উঠতে পারে—এ কী করে সম্ভব হল?

২.৩

বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তির প্রশ্ন মানে, অনেকেই মনে করতে পারেন, বুঝি পাকিস্তানি শাসন ও যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি দখল থেকে মুক্তির প্রশ্ন। আসলে প্রশ্নটি আরো আগের। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসানে পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের ভাগে পড়ে। ১৯৭১ সালের পূর্ব বাংলা বাংলাদেশ নামে স্বাধীনতা লাভ করে। মনে রাখা দরকার, পাকিস্তানের ভাগে যোগ দেওয়াও তখন স্বাধীনতা বা আজাদী নামে চালু হয়েছিল। ১৯৭১ কি আজাদীরই নতুন সংক্রান্ত, না নতুন জাতির মুক্তি? এই প্রশ্নে আহমদ ছফার মত আমরা আগে লেখা এক নিবন্ধে হাজির করেছি। (সলিময়াহ ২০০৬)

১৯৪৭ সালের পর পূর্ব বাংলায় 'জাতীয় মুক্তির আকাঞ্চক' প্রথমেই ভাষার প্রশ়ে দানা বাঁধে। সেই জন্যই ১৯৪৮-১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশে জাতীয় মুক্তির প্রথম পর্যায় বলে সকলেই স্বীকার করেন। প্রথম পর্যায়ে মানে আজ্ঞান পর্যায়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব বাংলার শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী কৃষক, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে একাজোট বা যুক্তিকৃত গড়ে জয়ী হয়। সেই সময়ের পর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রধান সংগঠন আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার স্বায়ত্ত্বাসনসহ অন্যান্য প্রশ্নে ভেঙ্গে যায়। আওয়ামী লীগ গড়েছিল মুসলিম লীগের একাংশ। তেমনি আওয়ামী লীগের একাংশ গড়ল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বা ন্যাপ। লীগ শব্দটাও তারা রচন করল। মুসলিম শব্দটা আওয়ামী শব্দের দোলতে আগেই বর্জিত হয়েছিল।

আহমদ ছফা অভিযোগ করেছেন পঞ্চাশের দশকে আওয়ামী মুসলিম লীগের দক্ষিণপশ্চাত্য টুকরা বা নতুন আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার স্বায়ত্ত্বাসনের বিরোধিতা করত আর ন্যাপ সে দাবি সমর্থন কিংবা উত্থাপন করত বলে নিন্দিত হত। কিন্তু ভাগোর পরিহাস ষাটের দশকে আওয়ামী লীগের নতুন নেতা শেখ মুজিব যখন পূর্ব বাংলার স্বায়ত্ত্বাসন কর্মসূচি হারণ করলেন তখন ন্যাপ তার বিরোধিতা করল। শেখ পর্যন্ত ভাঙ্গা ন্যাপই ও পশ্চাতের বিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির দুই অংশই স্বায়ত্ত্বাসন দাবিতে শেখ মুজিবের পেছেন জড় হয়। কিন্তু ততদিনে নেতৃত্ব তাদের হাতছাড়া। ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থকদের এদেশে তখন বামপন্থী বলার চল। এই বামপন্থীদের একাংশ মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করল — আরেকাংশ করল না।

মঙ্গলাচল আসানীর মত বামপন্থী নেতাও ভারতে অশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু অনেকে দেশের ভিতরে থেকে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েছেন। বামপন্থীদের এই বিভক্তি, বিভাগিত ও বিচ্ছেদের কারণ আহমদ ছফা খুঁজেছেন বামপন্থী রাজনীতির যাকে তিনি বলেন, 'অঞ্চল বিহুর্ভূত রাজনৈতিক আনুগত্য' সেই নীতির মধ্যে। 'রঞ্চপন্থী' ও 'চিনপন্থী' শব্দ দুটির মধ্যে এই নীতির সারাংশ।

বামপন্থীর এই প্রতিহাসিক বর্ধতার ফসল ঘরে তুলেছে ১৯৬৫ সাল-পরের আওয়ামী লীগ। কিন্তু আওয়ামী লীগও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দল। তাদেরও চিন্তার সীমা স্বার্থের সীমায় বদ্ধ। আহমদ ছফা লিখেছেন সে কথা:

বিকশমান বাঞ্চালি মধ্যবিত্তের সংগঠন আওয়ামী লীগের মূল দাবি ছিল ছয়দফা আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বায়ত্ত্বাসন অর্জন করা। নেতৃবৃন্দ একেবারে চূড়ান্ত মুহূর্তেও শ্রেণীগত দেনুল্যামানতা ত্যাগ করতে পারেন নি। নেতৃবৃন্দ কখনো স্পষ্টভাবে উপলক্ষ করতে পারেন নি যে বাংলাদেশে স্বাধীন স্বার্বভৌম একটি বাস্তিসন্তার জন্ম হতে চলেছে এবং তারা সে সংযোগে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বাঞ্চালি জাতীয়তাবাদের উত্থানের চূড়ান্ত উত্তর মুহূর্তেও শ্রেণীগত সঞ্চীর্ণতা পরিহার করে তারা বাঞ্চালি জাতিসন্তার সঙ্গে পুরোপুরি একাত্ম হতে পারেন নি। (ছফা ১৯৭৭: ১৫-১৬)

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে, আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব তাহলে ইয়াহিয়া কিংবা ভুট্টো সাহেবের সঙ্গে কোন রকম আপোস-নিষ্পত্তিতে যায় নাই কেন? একটা উত্তর:

যেতে পারে নাই ইয়াহিয়া বা ভুট্টোর অনমনীয়তার কারণে। বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপপন্থি লেখকরা পছন্দ করেন এই উত্তরটাই। আরেকটা উত্তর হতে পারে: অনমতের প্রবল চাপ শেখ মুজিবকে ইয়াহিয়ার সঙ্গে হাত মেলাতে বারণ করে। আহমদ ছফা এ কথা আমল করেছেন এভাবে:

অবশ্য এ কথাও দিখ্যা নয় যে ছাত্রদের এগার দফা আন্দোলন, প্রাথিকদের আন্দোলন এবং বৃক্ষজীবীদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলার জাতিসঙ্গ দ্রুত বিকশিত হয়ে উঠেছিল এবং সে বিকশিত জাতিসঙ্গের চাপে তাঁরা তাঁদের স্বাভাবিক ভূমিকার চাইতে একটু অধিক যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। (ছফা ১৯৭৭: ১৬)

এ কথা কি সত্য? এ প্রশ্নে অনমনীয় আহমদ ছফা। তিনি যুক্তি দেখান একতলা ভিতরে উপর যেমন তিনতলা বাঢ়ি করা যায় না তেমনি স্বায়ত্ত্বাসনের দাবিতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি ঘটিয়ে তাকে হঠাত স্বাধীনতার সংযোগে ঝুপান্তরিত করা চলে না। ছফা লিখেন:

আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ শেখ পর্যন্ত বিশ্বাসই করতে পারেন নি যে তাঁরা সত্ত্ব পাকিস্তানি ধর্মতাত্ত্বিক রাষ্ট্রকাঠামো থেকে বাংলাদেশকে বের করে আনার জন্য পাকিস্তানি সেবাবাহিনীর সঙ্গে একটি সম্মুখ সমরে অবরীণ হতে যাচ্ছেন। তাঁদের দৃষ্টি যদি পূর্ব থেকে স্বচ্ছ থাকত তাহলে সে সরকারে পূর্বগুরুত্বও তাঁরা এই করতেন। বাঁশের লাঠি দিয়ে ঘরে ঘরে দুর্ঘ তৈরির 'যুক্ত যুক্ত বেলা' ঘোষণার বদলে অন্য কোন কার্যকর পছন্দ অবলম্বন করতেন। (ছফা ১৯৭৭: ১৬)

বলাবাহলা, আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব তা করে নাই। ফলে বাংলাদেশের অগণিত লোক ভারতে অশ্রয় যাচ্ছে করতে চলে যায়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ থেকে সত্ত্ব সত্য কর্ত লোক ভারতে অশ্রয় নেয় তার কোন নির্ভরযোগ্য শুমার নাই। তবে নির্ভরযোগ্য লেখক মঙ্গলুল হাসানও দেখছি এই সংখ্যা এক কোটি বলে উল্লেখ করেছেন। (মঙ্গলুল হাসান ১৯৮৬: ২৪৫)

আহমদ ছফার অভিমান শুন্দি এই কারণেই যে ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে তার উপর নির্ভরশীল করে ফেলেছিল। আহমদ ছফা নিজেও এক কোটি শরণার্থী সমাজের অন্যতম সভ্য হয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সেই অভিজ্ঞতার অমর কাহিনী তিনি একাধিক লেখায় রূপান্তরিত করেছেন। এর মধ্যে আমার বিশ্বাস নিশ্চিত 'অলাভচক্র' নামে উপন্যাসটি এ বিষয়ে বাংলায় লেখা তাৎক্ষণ্য উপন্যাসের তালিকায় উপরের সারি দখল করবে। (সলিমুর্রাহ ২০০১; সলিমুর্রাহ ২০০৭) ছফার দৃঢ় তারপরও গেল না। তিনি লিখে ফেলেছেন এই যে এত খারাপ ভারত-বাংলাদেশের যুদ্ধটাকে দখল করে ফেলল: 'এই ভারতের সঙ্গেও যদি পূর্বাহো চুক্তি ইত্যাদি করে কিছু অন্তর্শস্ত্র এনে তাঁরা একটা শক্তিশালী প্রতিরোধ ব্যবস্থা রচনা করত, তাহলেও পরিস্থিতি ভিন্ন আকার ধারণ করত'। (ছফা ১৯৭৭: ১৬)

আওয়ামী লীগ তাহলে স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রতী হয় নাই, হয়েছে সেই সংগ্রামের ব্রাত্য মাত্র। ছয়দফা দাবি আওয়ামী লীগ উত্থাপন করেছে কিন্তু একদফা দাবি তুলেছে জনগণ। নেতৃত্ব অটুট রাখার স্বার্থে আওয়ামী লীগের সে দাবি মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য কোন পথি ছিল না। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী, আওয়ামী লীগের পেছনে জড় হয়েছিল দেশের জনগণ। এই দুই প্রকার যদি একসঙ্গে বিবেচনা করা যায়, তবে বোৱা যাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার আকারে 'সমাজতন্ত্র' আওয়াজ কেন হাজির হয়।

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের পক্ষে 'সমাজতন্ত্র' শব্দটি উচ্চারণ করা সহজ ছিল না। কিন্তু উচ্চারণ না করাও কঠিন ছিল। এর কারণ: জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঞ্চন্দ্র ও জাতীয় মুক্তির যুক্তি 'সমাজতন্ত্র' শব্দে দানাদার হয়ে উঠেছিল। আহমদ ছফা লক্ষ করেছেন, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পূর্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চলার সময়ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রকপটি কী হবে আওয়ামী লীগ সে ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নাই। (ছফা ১৯৭৭: ৪৭) তার কারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাধান্য। অর্থাৎ এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাধান্য সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ স্বাধীনতার দাবিকে উপেক্ষা করতে পারে নাই। তার কারণ শুধু সাধারণ সংস্কারে যাকে জনগণ বলে সে জনগণই নয়, খোদ আওয়ামী লীগের ভিতরও ছাত্র ও যুবাশ্রেণীর কিছু গোষ্ঠীর সক্রিয় চাপও। এরা সমাজতন্ত্রে ব্রতী হলেও আওয়ামী লীগের তফশীলে ব্রাত্যজনের অধিক ছিল না। ছফা সে কথা জানেন: আর আওয়ামী লীগের অন্তর্ভুক্ত যে যুবক এবং ছাত্র অংশটি সমজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সপক্ষে ছিল, দলীয় সিদ্ধান্ত প্রণয়নে তাদের হাত ছিল না। (ছফা ১৯৭৭: ৪৭)

কিন্তু আন্দোলনের বেগ যত তীব্র যত জদি হয়ে উঠেছিল এই অংশের শক্তি ও তত বেড়ে যাচ্ছিল। আওয়ামী লীগের পেছনে জনগণের একটি বড় অংশ জড় হয়েছে ততদিনে। আহমদ ছফা এই উপদলটির দিকে ভরসার চোখে তাকিয়েছিলেন:

আওয়ামী লীগের ছয়দফা আন্দোলনের প্রাণ-প্রদান এরাই যুগিয়েছিলেন। শুভরাঙ আওয়ামী লীগের মূল নেতৃত্বকে এদের উপরই ভরসা করতে হত। তাই এরা স্বাধীনতা এবং সমাজতন্ত্রের দাবি উত্থাপন করলেও সরাসরি বিরোধিতা করে এদের চিঠিয়ে দিতে সাহসী হতে পারেন। (ছফা ১৯৭৭: ৬০)

আহমদ ছফা মনে করেন, এই ছাত্র তরুণ দলটির চাপেও স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্র শব্দ দুটি 'সংগ্রামের ঠিক অগ্রভাগে' না হলেও এক পাশে স্থান করে নিতে' পেরেছিল। (ছফা ১৯৭৭: ৬০)

কিভাবে সন্তুষ্ট হল এই অসন্তুষ্ট? বাংলাদেশের মাটিতে অবস্থান করার সময় যে আওয়ামী লীগ সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রাদর্শ স্বীকার করে নাই ভাবতের মাটিতে গিয়ে তাকে সে রাষ্ট্রাদর্শই অঙ্গীকার করতে হল চাপে পড়ে। জনগণবিনা সূচার মেদিনী তাঁর পাবেন কোথায়?

প্রথমত আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব সম্পূর্ণ দেশের বাইরে ছিল। প্রকৃত প্রতাবে বাংলাদেশের যুক্তে তাদের ওধু মুখে কথা বলা ছাড়া পালনীয় কোন ভূমিকা বর্তমান রইল না। দেশের ব্যাপক জনগণের অংশহীন ছাড়া ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষেও যুক্ত জয়লাভ করা অত সহজসাধ্য হত না। তাই জনগণের অংশহীনের জন্য তাদেরকে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে সমাজতন্ত্রের কথাও বলতে হল। (ছফা ১৯৭৭: ৪৮)

একইভাবে এই যুক্তের সদর দপ্তর ভারতে হলেও সোভিয়েত রাশিয়ার প্রভাব ছাড়া ভারতের পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চিনের মৌখিচাপ সামলানো অসম্ভবই ছিল। সেটাও আরেক কারণ যার দোলতে আওয়ামী লীগ সরকার ঢাকা ফেরার আগেই সমাজতন্ত্র অঙ্গীকার করে এসেছিল। আওয়ামী লীগের মূল নেতৃত্বও এমন কোন এক স্ফুরে মাথা মুড়ানো ছিল না।

২.৪

১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বর বাংলাদেশের নির্বাচিত সরকার ঢাকায় ফিরে আসার পর আওয়ামী লীগের গৃহবিবাদ ঘাড়চাড়া দিয়ে ওঠে। ১৯৭৫ সালের হত্যাকাণ্ড ও সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা সে বিবাদেরই পরিবর্ধিত সংক্ষরণ বললে খুব অন্যায় বলা হয় না।

মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী মঈনুল হাসানের সাক্ষ্যও আহমদ ছফার বাকের সরান:

২২ ডিসেম্বর ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পর বিমান বন্দরে এবং ২৩ ডিসেম্বর ঢাকা সচিবালয়ের সমষ্ট অফিসার ও কর্মচারী সমাবেশে তিনি ঘোষণা করেন সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা—এই তিনি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে দেশকে গড়ে তোলা হবে। (হাসান ১৯৮৬: ২৫৩-৫৪; পাঠ দ্বিৰৎ সংশোধিত)

তবে আহমদ ছফার সঙ্গে একটা প্রশ্নে বেশ দ্বিমত করেছেন মঈনুল হাসান। মঈনুল হাসান দাবি করেন: 'তাজউদ্দীনের এই সকল ঘোষণা প্রায় সর্বাংশেই ছিল আওয়ামী লীগের দলীয় ঘোষণাপত্রের অধীন।' কিন্তু 'প্রায় সর্বাংশে' কথটির মতন আরো একটা বিশেষ তিনি এস্তেমাল করেছেন। স্বীকার করেছেন দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার মৌল ক্রপাত্তেরের জন্য ১৯৭০ সালের নির্বাচনী ঘোষণাপত্রে আওয়ামী লীগ যে সব লক্ষ্য অর্জনের প্রতিশ্রুতি দেয় সে সম্পর্কে দলীয় নেতৃত্বের একাংশের মনোভাব ছিল নেতৃত্বাচক। এসব নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির মধ্যে ছিল কলকারখানা জাতীয়করণ। এর মধ্যে ছাত্রগোষ্ঠীর এগার দফার চাপ ছিল। ১৯৭০ সালের আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের সম্মেলনে এসব দাবি-সম্বলিত ঘোষণাপত্র বিনা আলোচনায় পাশ হয়। কারণ রেহমান সোবহান ও মোজাফফর আহমদ মনে করেন—শেখ মুজিব এই ঘোষণাপত্র সমর্থন করেছিলেন। (সোবহান ও আহমদ ১৯৮০: ৮৭; দ্রষ্টব্য, মঈনুল হাসান ১৯৮৬: ২৫৪-৫৫)

আহমদ ছফা এই সত্য এ সকলের আগেই প্রকাশ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন: 'সাধীন মুক্তিযোদ্ধার বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ যে সকল দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়, তার মূল নিহিত ছিল বাজানৈতিক দল আওয়ামী লীগ সংগঠনটির অভ্যন্তরে'। (ছফা ১৯৭১: ৫৯) সাধীন দেশের অর্থনৈতিক কোন পথে চলবে তা নিয়ে আওয়ামী লীগে উভয় সঙ্কট দেখা দেয়।

যুক্ত চলাকালীন তাঁরা ধনতাত্ত্বিক এবং সমাজতাত্ত্বিক দুই ধরনের অর্থনৈতিক বিনির্মাণের প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। যদি তাঁরা বলেন যে বাংলাদেশে ধনতাত্ত্বিক অর্থনৈতিক প্রেরণা করবেন, তাহলে আওয়ামী লীগের যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সমাজতাত্ত্বিক সমাজ প্রতিষ্ঠাত্র মানসে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন। ... যদি তাঁরা বলেন, সমাজতাত্ত্বিক অর্থনৈতিক পদ্ধতি চালু করবেন, তাহলে তাদের নিজেদের পায়ের তলার মাটি সবে যায়। ধরতাই বুলি হিসেবে শৰ্পটি উচ্চারণ করতে বাধা হলেও মনেঝাণে তাঁরা সমাজতাত্ত্বের প্রতি নিরবেদিত ছিলেন না। (ছফা ১৯৭১: ৬১-৬২)

আহমদ ছফার এই বিচার মন্ডেল হাসানের দেখা থেকেও সমর্থন পাচ্ছে। তবে মন্ডেল হাসান মনে করেন বাংলাদেশ সাধীন রাষ্ট্রপে কার্যের হওয়ার মুহূর্তে আওয়ামী লীগের দক্ষিণপাহী বা পুঁজিতন্ত্রসমর্থক অংশ ক্ষীণবল হয়ে পড়ে। কিন্তু পরে মন্ডেল হাসানও প্রকারাত্মে কুল করেছেন, শেখ মুজিবের মাধ্যমে সে অংশ তাদের হতগোবর আওয়ামী লীগের ভিতর পুরোপুরি ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়। তা হলে ছফার কথা ঠিকই থাকছে। হাসান লিখেছেন:

এ কথা সত্য যে মুক্তি সংগ্রামের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার ফলে, বাংলাদেশ পাকিস্তানের একচেটীয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কজা থেকেই কেবল বেরিয়ে আসেনি; মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা পাকিস্তানি শাসনের সমর্থক বাজালি বিশ্বাসী ও সঙ্গল শ্রেণীকেও দুর্বল করে ফেলে। সাধীনতার অব্যবহিত পরেই কায়েমী স্বার্থের এই অনুপস্থিতি/দুর্বলতার প্রশংস্ত ছাড়াও এই শ্রেণীর সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার জন্য অত্যাবশ্যক হিসাবে বিবেচিত আমলাত্মের পুঁজিবাদ-তোষণকারী ও দুর্মুক্ত-পরায়ণ অংশের ক্ষমতা ও প্রভাব ছিল দুর্বল এবং সশ্রষ্ট বাহিনীর আয়তন ও ক্ষমতা ছিল সীমিত। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে উঠতি পুঁজিপতি ও বিভাকাঞ্জী মধ্যবিত্তদের প্রভাব প্রবল হলেও, দলের মধ্য ও নিম্নতরে, বিশেষত তরুণ অংশের মধ্যে, পুঁজিবাদী বিকাশের বিকল্পবাদী অংশ ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। (মন্ডেল হাসান ১৯৮৬: ২৫৩)

আহমদ ছফার মত মন্ডেল হাসানও স্বীকার করেছেন মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতির সাথে সাথে আওয়ামী লীগের দক্ষিণপাহী অংশের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের দুরাত্ম বৃক্ষি পায়। তা হলে আওয়ামী লীগের দক্ষিণপাহী অংশের বিরুদ্ধে লড়াই করার অসুবিধা বা প্রতিবন্ধকতা কোথায়?

হাসান এই প্রতিবন্ধকতার একটা হিসেব পেয়েছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যে। অন্যটি মুক্তিযোদ্ধা সংগঠনের ভিতরে। বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দক্ষিণপাহী অংশ

১৯৬৯ ও ১৯৭০ সালে মাথা ওঁজে আওয়ামী লীগের ভিতরে ঠাই করে নিয়েছিলেন ১৯৭২ সালে তারা ফিরে এলেন মার্কিন সাহায্যের দৌলতে।

মার্কিন সাহায্যের কাঁধে ভর করে কেউ যাতে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন করতে না পারে, তার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ১৯ ডিসেম্বর এক বেতার ভাষণেই প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন জানিয়ে দেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাধীনতাবিবোধী ভূমিকার জন্য বাংলাদেশ মার্কিন সাহায্য গ্রহণে আগ্রহী নয়। (হাসান ১৯৮৬: ২৫৩)

একই সঙ্গে অর্থনৈতিক পুনৰ্গঠনের জন্য তাজউদ্দীন মন্ত্রিসভা যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে—যেমন কেবল পাকিস্তানি মালিকানাধীন কলকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ—‘আওয়ামী লীগের উর্ধ্বতন নেতৃত্বের প্রত্বাবশালী—সন্তুবত বৃহত্তর—অংশই’ ছিলেন তার বিরামক। মন্ডেল হাসান লিখেছেন: ‘পত্রা ও লক্ষ্য উভয় সম্পর্কেই এদের আপত্তি ছিল সুগভীর’। (হাসান ১৯৮৬: ২৬৩)

১০ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখে মুজিব দেশে ফেরার পর অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। যেমন: দেশের অর্থনৈতিক পুনৰ্গঠনের জন্য সরাসরি মার্কিন সাহায্য গ্রহণের নীতি মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পূর্বীত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বদলীয় চরিত স্বীকার করে সব দলের সমর্থক মুক্তিযোদ্ধা সমবায়ে জাতীয় মিলিশিয়া গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিল তাজউদ্দীন মন্ত্রিসভা। সে প্রস্তাব বর্জন করে কেবল অনুগত মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে আওয়ামী লীগ দলীয় সৈনিক নিয়ে জাতীয় রক্ষিতাবাহিনী গঠিত হয় কিছুদিনের মধ্যেই। প্রবর্তিত হয় আওয়ামী লীগের দলীয় নিরস্কৃশ শাসন। জয়ী হয় সাহায্যের আবরণে দেশকে আশ্রিত পুঁজিবাদের দিকে নিয়ে যাবার আন্তর্জাতিক গ্রাস। তাজউদ্দীনের যুগে যা সম্ভাব্য ছিল, শেখ মুজিবের আমলে তা সম্ভব হয়।

এর তুলনায় ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালের সন্ধিয়া ঢাকার এক গণজমায়েতে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার হাতে বিদেশী সাংবাদিক ও টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে বিচারের আগেই অভিযুক্ত চারজন বন্দীহত্যা ভুঁচ ঘটনাই মনে হবে। ভুঁচ মনে হবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর (মন্ডেল হাসান কথিত) বিশেষ জাতিগোষ্ঠীভুক্ত কিছু ইউনিটের যশোর, ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও খুলনা লুটপাটকেও। কিন্তু পরের ইতিহাস ভুঁচকে উচ্চ করেছে। প্রমাণ করেছে ইতিহাস এমনকি আওয়ামী লীগকেও ক্ষমা করে না। না শেখ মুজিব না তাজউদ্দীন কেই ক্ষমা পান নাই।

কিন্তু ইতিহাসের রসিকতা অন্যরকম। বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী আজো ইতিহাসে ক্ষমার উপর আকারেই বিবাজমান। শুধু বিবাজমান নয়, বিকশমানও। রসিকতাটা এখনেই যে এ বিকাশ এখনো নিজের পায়ে ভর দিয়ে নয়, শুধু পরগাছা আকারে বুকে দাঁড়িয়ে। ফার্বো ১৯৬১ সালে প্রধানত আফ্রিকার অভিজ্ঞতা সম্বল করে লিখেছিলেন, জাতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঐতিহাসিক নিয়তি মধ্যবৃত্তোগীর স্থান দখল কর্য। (ফার্বো ২০০৫: ১০০) বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী সংগীরবে সে স্থানই দখল করেছে। এ বাবদ তাদের মূল্যও দিতে হয়েছে অনেক।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আগতত সফল হয় নাই। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মাধ্যমে এই সংগ্রাম স্বাধীনতার অকালবোধনে পরিগত হয়েছে। কিন্তু ইতিহাসে শেষ কথা বলে কিছু নাই। দার্শনিক হেগেলের নামে যারা অহেতুক অপবাদ দেয় তারা না পড়েছে হেগেল না লিখেছে ইতিহাস। নিজের দেশের প্রাচীন বট সাক্ষী রেখে আহমদ ছফা সন্তু দশকেই এমন কথা লিখেছিলেন একটি কবিতায়।

সোভিয়েতের আজৰ থবৰ
যাবুৰ ঘোড়ায় নবীন চীন
সাক্ষী তৃষ্ণি শুনছে তারা
ভাৰছে এলো নতুন দিন।

এমন কৱে, এমন কৱে
দিনেৰ পৱে দিন লিয়েছে
নতুন কথাৰ প্ৰেমে পড়ে
গাঁয়োৰ কিবাণ মাৰ খেয়েছে।

মনে আছে একাত্তুৱেৰ
বাংলাদেশে বজুৱোদন
নদীৰ মাজা কঁপিয়ে এলো
স্বাধীনতাৰ অকাল বোধন।

ভালে ভালে পাতায় পাতায়
মেই কি তোমাৰ পাগলা নাচন
এক পলকেই খন্দে শেলো
হাজাৰ সনেৰ জৱাৰ বাঁধন।

—ছফা। (২০০০: ৮৯-৯০)

‘মুক্তিযুদ্ধের শেষ হয় নাই। মুক্তিৰ শেষ নাই।’ মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের হাজাৰ বছৰের স্থুৱিতাৰ শেষ ঘোষণা কৱেছে মাত্ৰ।

৩ ॥ ধৰ্ম, জাতি ও বেহাত বিপ্লব

৩.১

১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বৰ ঢাকা ফেরার পৱে বিমানবন্দৰে এবং ২৩ ডিসেম্বৰ ঢাকা সচিবালয়ের সমস্ত অফিসাব ও কৰ্মচাৰী সমাবেশে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্ৰবাসী বাংলাদেশ সরকাৰেৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তাজউদ্দীন আহমদ ঘোষণা কৱেন, ‘সমাজতন্ত্ৰ,

গণতন্ত্ৰ ও ধৰ্মনিরপেক্ষতা—এই তিনি মূলনীতিৰ উপৰ ভিত্তি কৱে দেশকে গড়ে তোলা হবে।’ (হাসান ১৯৮৬: ২৫৩-৫৪) খেয়াল না কৱে উপায় নাই, ১৯৭২ সালেৰ নভেম্বৰৰ মাসে অনুমোদিত সংবিধানে রাষ্ট্ৰৰ চার মূলনীতিৰ এক নীতি তাজউদ্দীন আহমদেৰ ঘোষণায় পাওয়া যায় না। মঙ্গদুল হাসান উল্লেখ কৱেছেন, সচিবালয়েৰ সমাবেশে তাজউদ্দীন আহমদ বলেছিলেন মুক্তিযুদ্ধেৰ শহীদৰা সংগ্রাম কৱেছিলেন আইনেৰ শাসন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা প্ৰতিষ্ঠাৰ জন্য। পাশাপাশি তাৰা সংগ্রাম কৱেছিলেন সব ধৰনেৰ শোষণ ও বৈষম্য চিৰতৰে বক কৱাৰ জন্য। ‘সমাজতন্ত্ৰ’ বলতে তাজউদ্দীন আহমদ জাতীয় সংগ্রামেৰ এই দ্বিতীয় অঙ্গীকাৰকেই বুবিয়েছিলেন। তাৰ ঘোষণা অনুসাৰে একমাত্ৰ সমাজতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ মাধ্যমেই এদেশেৰ সকল মানুষেৰ জীৱিকা নিশ্চিত কৱা সন্তু।

অনেকেৰই কৌতুহল জাগৰে তাজউদ্দীন আহমদ আলাদা কৱে ‘জাতীয়তাৰাদ’ বলে একটা মূলনীতিৰ কথা বলেন নাই কেন? কাৰণ হতে পাৰে একাধিক। এক নথৰে, ‘জাতীয়তাৰাদ’ আৰ ‘জাতীয় চেতনা’ ঠিক এক জিনিস নয়। বাংলাদেশ যে প্ৰেৱণায় মুক্তিযুদ্ধ কৱেছে তা ‘জাতীয় চেতনাৰ’ ফল, এ সত্যে সন্দেহ নাই। ভিতৱ্বেৰ কথা ছিল ‘জাতি-ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে’ বাংলাদেশেৰ সকল মানুষ একই রাষ্ট্ৰীয় বা জাতীয় পৰিচয়ে চলবে। এই জাতীয় চেতনাৰই অপৰ নাম ‘ধৰ্মনিরপেক্ষতা’। তাই ‘ধৰ্মনিরপেক্ষতা’ নীতি যে দেশেৰ জাতীয় তিনি মূলনীতিৰ আসল, সেখানে ‘জাতীয়তাৰাদ’ নামে আলাদা সুন্দীৰ্তিৰ প্ৰয়োজন থাকে না। তাজউদ্দীন আহমদ খুব সন্তু এ ধাৰণা খেকেই মূলনীতিৰ সংখ্যা তিনে সীমিত কৱা সমীচীন বিবেচনা কৱেছিলেন।

বাংলাদেশে পৰাধীন ভাৱতবৰ্ধেৰ শেষ নিৰ্বাচন হয় ১৯৪৬ সালে। সে নিৰ্বাচনেৰ ভিত্তিতেই ১৯৪৭ সালেৰ বাংলা ভাগ। তথন ধৰ্মভিত্তিক সম্প্ৰদায়-চেতনাৰ মাপকাঠিতেই দেশেৰ সীমানা নিৰ্ধাৰণ হয়। ইতিহাসেৰ এই ভূমি বাদ দিয়ে ‘ধৰ্মনিরপেক্ষ’ নীতিৰ অৰ্থ কৱা সূচৃতাৰ সামিল। ১৯৪৭ সালেৰ ভাৱতবিভাগেৰ পৱ স্বাধীন ভাৱতও ধৰ্মনিরপেক্ষতাৰ নীতি গ্ৰহণ কৱে। কাজে না হোক, অন্তত কথায় গ্ৰহণ কৱে। ১৯৭১ সালেৰ লড়াইয়েৰ পৱ বাংলাদেশও তাই কৱে।

এ নীতিৰ গোড়াৰ কথা ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়েৰ বিৱৰকে কোন প্ৰকাৰ বৈষম্য রাষ্ট্ৰ যেন অনুমোদন না কৱে। রাষ্ট্ৰ যদি না কৱে, জাতিও কৱে না। কাৰণ গণতন্ত্ৰিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্ৰ জাতিৰ কথাৰ বাইৱে চলতে পাৰে না। বাংলায় আমৱা ‘ৱাষ্ট্ৰ’ কথটা ব্যবহাৰ কৱি সকীৰ্ণ অৰ্থে, কিন্তু ইন্দিতে এৰ অৰ্থ আৱো ব্যাপক। ইন্দিতে ‘ৱাষ্ট্ৰ’ মানে ‘জাতি’। ইন্দি প্ৰয়োগে ‘ৱাষ্ট্ৰভাৰ্যা’ মানে জাতীয় ভাৰ্যা। বাংলাৰ ‘জাতিৰ পিতা’ ইন্দিতে ‘ৱাষ্ট্ৰপিতা’। মহাজ্ঞা গান্ধীকে ইন্দি ভাৰ্যা ‘ৱাষ্ট্ৰপিতা’ বলা হয়।

১৯৭১ সাল পৰ্যন্ত বাংলাদেশে গণতন্ত্ৰিক সংগ্রামেৰ অভিজ্ঞতায় দেখা যায় জাতীয় চেতনাৰ প্ৰধান ভিত্তি ‘ধৰ্মনিরপেক্ষতা’ ও ‘গণতন্ত্ৰ’। ‘জাতীয় চেতনা’ ও ‘জাতীয়তাৰাদ’ যে আলাদা ধাৰণা মে কথা—নিজ অভিজ্ঞতা থেকেই জনি—অনেকেৰ কাছে পৰিকাৰ নয়। এই অপৰিচ্ছন্নতাৰ সুযোগ নিয়েই বাংলাদেশেৰ রাজনীতিতে সাম্প্ৰদায়িক জাতীয়তাৰাদেৰ প্ৰতিষ্ঠা। জাতীয়তাৰাদ মানে যদি কোন এক জাতীয় সম্প্ৰদায়েৰ

নিরসৃষ্ট প্রতিষ্ঠা বোবায়, তবে সে মতবাদ গণতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রাখা করারে কী করে? অথচ জাতীয় চেতনার উৎপত্তি হয় গণতান্ত্রিক আধিকারের সংজ্ঞা ব্যক্তি থেকে জাতি পর্যন্ত প্রসারিত করার পথে।

‘জাতীয় চেতনা’ মানে ‘জাতীয় গণতান্ত্রিক চেতনা’। তাই এ চেতনা শেষ বিচারে জাতিনিরপেক্ষতা বা সকল জাতির সমানাধিকার নীতির প্রতিষ্ঠা দাবি করে। অপর দিকে, জাতীয়তাবাদ মানে ‘জাতীয় একনায়কত্ব’। এ তো জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বেরই চেতনা। এই চেতনা ছেট ছেট জাতির উপর বড় জাতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। জাতীয়তাবাদের পালন মানে তাই গণতন্ত্রের দমন। এই ঘটনাই ঘটেছে বাংলাদেশে।

এদেশের বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা কেন ধর্মনিরপেক্ষ নয়? যারা নিত্য এই নালিশ করেন, তাদের বুকে হাত দিয়ে পোছ করা উচিত: এদেশ কি সত্য সত্য জাতিনিরপেক্ষ? এদেশ কি শ্রেণীনিরপেক্ষ? শেষ কথা: এদেশ কি আদৌ গণতান্ত্রিক? ‘গণতন্ত্র’ ও ‘জাতীয়তাবাদ’ ‘পদ’ দুটি বাংলাদেশের মূলদলিলে এখনো বহাল। তবে তাদের ‘পদার্থ’ এখন অন্য। একই কথা কিন্তু বলা চলছে না ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ বা ‘সমাজতন্ত্র’ সম্পর্কে। সে জায়গায় এখন অন্য পদার্থ মাত্র নয়, অন্য পদও এসেছে। কিন্তব্বে সন্তুষ্ট হল এই বিপ্লব? এই চোরা পরিবর্তনেরই অপর নাম ‘প্যাসিভ বেন্ডল্যুশন’, বেহাত বা হস্তান্তরিত বিপ্লব। (গ্রামসি ১৯৭৩) এই পাল্টা বিপ্লবের গোড়ার কথা অনেক দিগন্ত প্রশ্নস্ত অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে বিশদ করেছিলেন মহাত্মা আহমদ ছফন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সারা জাতি শরিক হয়েছিল। এর নামই ‘জাতীয় চেতনা’ বা ‘জাতীয় গণতন্ত্র’। আর মুক্তিযুদ্ধের সময় নেতৃত্ব দিয়েছিল জাতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী বা আরো বিশদ বিচারে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দল আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগের অভিভাবকত্ব অন্তত ১৯৭১ সালের পর গ্রাহণ করে ভারত সরকার। পেছনে সমর্থন দেয় সোভিয়েত রাশিয়া। সেই সুবাদে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টি আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই চেতনাকেই আলাদা করে ‘জাতীয়তাবাদ’ বলা হয়েছে। আমরা বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছি আহমদ ছফার মত চিত্তাবিদিত এ বিভাজন সব সময় সময়ে উঠে পাবেন নাই। তিনি ও প্রায় দেবি ‘জাতীয় গণতান্ত্রিক চেতনা’ অর্থে ‘জাতীয়তাবাদ’ এন্তেমাল করছেন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে তিনি ও দেখছি কখনো-সখনো শুন্দি ‘বাংলাজি জাতীয়তাবাদ’ আখ্যা দিয়ে ছেট করতে বাধ্য হয়েছেন। (ছফা ১৯৭৭: ৭১) তারপরও আমরা আহমদ ছফার ঝুঁক অকুণ্ঠিতে স্থীকার করতে বাধ্য। তাঁর বিচার বাংলায় অপূর্ব বস্তু। এই প্রবন্ধ তাঁরই কিংবিংশ নমুনা।

মুক্তিযুদ্ধের গতিবিধি আহমদ ছফার সমান শুরুধার অন্তর্দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেছেন এমন দুই নম্বর লেখকদ্বির অপেক্ষায় আমরা এখনো আছি। আহমদ ছফার ধ্যান অনুসারে মুক্তিসংগ্রামের ধারা কমপক্ষে দুটি: একটি জনগণের ধারা ও অন্যটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ধারা। জনগণের শরিকানা ছাড়া দেশটি কখনো স্বাধীন হত না। মধ্যবিত্ত শ্রেণী দেশের স্বাধীনতা চায় নাই, জনগণের চাপে নিছক স্বাধীনতার পথে যেতে বাধ্য হবেছে মাত্র। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংস্কুরদ্ধুষ্টার কারণেই এ স্বাধীনতা প্রাপ্তীনতার নামান্তর

অর্থাৎ বুটা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার ‘গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা’ পরাজিত হয়েছে।

আহমদ ছফার বিশ্লেষণ ভর করে আমরা দেখব বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি কিভাবে পরাজিত হল। ছফার ধ্যান অনুসারে এর প্রধান দায় জাতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দল আওয়ামী লীগের। আমরা এ বিশ্লেষণের সঙ্গে বেশিরভাগেই একমত। আমরা শুধু যোগ করব—ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতি তুলে দেওয়ার পথে ‘জাতীয়তাবাদ’ মূলনীতির ভূমিকাও ছেট নয়। ‘বাংলাজি জাতীয়তাবাদ’ নামক মতাদর্শ প্রথমে জাতিনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতি বর্জন করার চেষ্টা করে। সেই সদর রাস্তা ধরেই পরে ‘বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ’ মতাদর্শের আগমন। এ মতাদর্শই ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় নীতি অবসান করার সুযোগ পেয়েছে। এই—গুন্ড এই কারণেই—মতবাদ সাম্প্রদায়িক এবং বেহাত বিপ্লবের মূল কারক।

৩.২

আল্লাহ মানুষকে ভাষা দিয়েছেন মনের ভাব গোপন করার জন্য। আর মনের ভাব গোপন করা যায় দু ভাবে। প্রথমে একই অর্থে এককথার জায়গায় অন্যকথা বসিয়ে। যেমন শেখ মুজিবের নাম ‘বঙ্গবন্ধু’। মনের ভাব দ্বিতীয় হানেও গোপন করা যায়। একই কথার দুই অর্থ দিয়ে। যেমন ‘বঙ্গবন্ধু’ অর্থ ‘দেশবন্ধু’ ধরলে অর্থও অন্যরকম হয় আর বাংলাদেশের জাতীয় আন্দোলন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসেও যুক্ত হয়। ধর্মনিরপেক্ষতাও এমন একটি কথা। এর অর্থ নানাজনের কাছে নানা রকম। শেখ মুজিব এই শব্দের আক্ষরিক এক অর্থ করেছিলেন। সে অর্থ শিশু অর্থ। বাংলাদেশ-বৈরী সৌন্দি আরবের বাদশাহ করেছিলেন বৃত্ত অর্থটি। শেখ সাহেবও বাদশাহ নামদারকে ১৯৭৪ সালে সুযোগ পেয়ে দু কথা শুনিয়ে দেন। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপনারা যে মুসলমানের দেশটাকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র করে ফেললেন! অধ্যাপক নূরুল ইসলামের বয়ান অনুসারে: ‘ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কথাটার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বললেন’:

জনগণের প্রতিনিধিরাই এই সিদ্ধান্ত গ্রাহণ করেছেন। এর মানে রাষ্ট্রের ধর্মবিরোধিতা নয়। অন্তত অন্তরে বাংলাদেশের মুসলমানরা দার্শণ ধর্মগ্রাহ্য ও পরহেজগার। এই পটভূমিতে ধর্মনিরপেক্ষ মানে রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও সমাজ বিশ্বক আধিকার ও সুযোগ সুবিধার প্রদৰ্শ ধর্মের মাপকাঠিতে কোন অবিচার না করার নিশ্চয়তা। (ইসলাম ২০০৩: ২৮১-৮২)

আওয়ামী লীগ সরকারের অর্থনীতি-বিশারদ নূরুল ইসলাম স্মৃতিলেখায় আরো এক মজার অভিজ্ঞা লিপিবদ্ধ করেছেন। ১৯৭১ সালে কলকাতায় পৌছে এক বিখ্যাত মুসলমান আইনজীবীর আশ্রয়ে শীতল হন তিনি। সে আইনজীবীর জবানিতে তিনি জানতে পারেন কলকাতার মুসলমানরা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম সমর্থন করছেন না।

তাদের ধারণা পাকিস্তান তেজে গেলে তাদের ও নিরাপত্তার একটি খুঁটি নড়ে যাবে। পাকিস্তান রাষ্ট্রটি দুর্বল হয়ে গেলে ভারতও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক—এমনকি শক্রসুলভ—আচরণ করবে। ওদিকে কলকাতার হিন্দু সম্প্রদায় বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে ব্যাপক সমর্থন দেয়। ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতীয় আতীয়তাসূত্রে পশ্চিম বাংলায় এই সমর্থনের একটা ব্যাখ্যা হয়। নূরুল ইসলাম লিখেছেন:

অস্তত ১৯৭০ দশকের গোড়ার কথা বলতে ভারতীয় জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মনে করতেন বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য প্রমাণ করে যে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে তাদের নিজস্ব বিশ্বাসটাই যুক্তিযুক্ত। (ইসলাম ২০০৩: ১১৩)

একই কথার সমর্থন আহমদ ছফার লেখাতেও পাওয়া যায়। ভারতে অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন পাকিস্তান নামক কৃত্রিম রাষ্ট্রটি টিকবে না। এই নাটোক মানে তারা ধরে নিয়েছিলেন একদিন না একদিন বৃহস্পৃষ্ঠ ভারত বা অশঙ্ক ভারত কায়েম হবে। এদের কাছে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে বৃহস্পৃষ্ঠ ভারত। তাদের বিচারে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের মানে দাঁড়িয়েছিল বৃহস্পৃষ্ঠ ভারতবিরোধী দ্বিজাতিত্বের অমসংশোধন মাত্র। ছফা লিখেছেন:

কংগ্রেসের সুচতুর প্রচারণার দরজণ বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে ভারতীয় জনগণ এভাবে বুঝেছেন যে জিনাহর দ্বিজাতিত্ব স্থিত্য হতে যাচ্ছে, পাকিস্তানের ভাসন আসন হয়ে উঠেছে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশি জনগণ যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে তা মূলত কংগ্রেসের বিশিষ্টবিরোধী সংগ্রামেরই অসমাঞ্চ পর্যায়। (ছফা ১৯৭৭: ২৬)

ভারতীয় জনগণের এ জাতীয় চিন্তা সম্পূর্ণ অমূলক ছিল বলা ঠিক হবে না। একদিকে ভারতের অনেক রাজনৈতিক দল ভারতবিভাগকে মাতৃ-অসম্বৰচ্ছেদ ভাবতেন। এইসব দলকে এ যুগে আমরা সাম্প্রদায়িক দল জ্ঞান করি। ভুলতে নিবেদ এদেরই এক দলের হাতে মহাত্মা গান্ধির লাশ পড়ে। ওদিকে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির প্রধান জওয়াহরলাল নেহরুর স্পন্দন বড় আলাদা ছিল না। আহমদ ছফার জবানিতে পড়ি:

জওয়াহরলাল নেহরু মনেপ্রাণে আসমুন্দুইমাচল প্রসারিত বৃহস্পৃষ্ঠ ভারতের স্পন্দন দেখতেন এবং এই স্পন্দকে তিনি ভারতের শাসক নেতৃত্বালীর মনে ভাল করে চারিয়ে দিতে পেরেছিলেন। জর্মানদের ফাদারল্যান্ড এবং ইন্দোনেশীয় হোলিন্যান্ডের মত বৃহস্পৃষ্ঠ ভারতের স্পন্দন ভারতীয় নেতৃত্বালীর মধ্যে গভীরে গেঁথে গিয়েছিল। তারা মনে করতেন, বৃহস্পৃষ্ঠ ভারতের স্পন্দন স্থিত্য হওয়ার নয়, প্রশ্নাটা শুধু সময়ের। (ছফা ১৯৭৭: ১৯-২০)

এ গেল ভারতের দিক। বাংলাদেশের দিক থেকেও আন্দোলনের অনেক অতীক, ভাব ও ভাবমূর্তি ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। এ কারণেও বাংলাদেশের জাতীয় আন্দোলন ভারতীয় বিশ্বাসের পালে বাতাস দিয়েছে। শেখ মুজিবের আন্দোলন ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ঐতিহাসিক মূর্তি ও প্রতীক ব্যবহারে বড় বেশি ব্যর্থ হয় নাই। ছফার ব্যান অনুসারে শেখ মুজিবকে—

তার দলের পক্ষ থেকে তাকে ‘বঙ্গবন্ধু’ বেতাবে ভূষিত করা হয়েছিল। ‘বঙ্গবন্ধু’ শব্দের সঙ্গে ‘দেশবন্ধু’র একটা শব্দগত সামঞ্জস্য রয়েছে। ভারতীয় কংগ্রেসের ত্রিপুরাবিরোধী সংগ্রামের একটা পর্বে গুরুমুক্ত দেশবন্ধু আইনজীবী রাজনীতিবিদ চিত্তগ্রন্থন দাসকে ‘দেশবন্ধু’ বেতাবে প্রদান করেছিল। দলের পোশাক হিসেবে ‘শুজিবকেট’ নামে যে জ্যাকেটটি শেখ মুজিব চালু করেছিলেন, সেটা ছিল পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু উত্তীর্ণ জাহরকেট—এর বাংলাদেশি সংস্করণ। জওয়াহরলাল শৌর্যবান পাঠান উপজাতির গায়ের ফুত্যাকে পছন্দমত অদল বদল করে নিজের পোশাক হিসেবে এহেম করেছিলেন। দলীয় কর্মী এবং বেচানেবকদের জন্য যে ধরনের টুপি উন্নতবান করেছিলেন, তা ছিল আজাদ হিন্দু ফৌজের টুপির অনুকরণ মাত্র। (ছফা ১৯৭৭: ২৫-২৬)

তারপরও কথা থাকে। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশের জাতীয় আন্দোলন চারিত্বে মধ্যবিত্ত বৈষ্ণষ্টিক হৈষিষ্ঠানিক ধারণ করে। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ভাবমূর্তি অনুকরণ তারই একধরনের শুন্দ প্রকাশ। অথচ জনগণের জাতীয় আন্দোলনও এর পাশাপাশি বিকাশ লাভ করে। জনগণের নিজস্ব আন্দোলনের অভিভ্রতা থেকেও রসদ সঞ্চাহ করে বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম। প্রসঙ্গত বলা যায় রণজিৎ গুহ প্রমুখ নতুন ভারতীয় ইতিহাসকারের প্রস্তাবও এখানে আমরা ধোলাই করছি। সেই প্রস্তাব অনুসারে ‘ভাসাভিত্তিক জাতীয়তা’ ও ‘অস্তর্জাতিক সমাজতন্ত্র’ এই দুই বৈশিষ্ট্য জনগণের স্বতন্ত্র আন্দোলনেরই স্মারক। গুহ এর মধ্যে এলিটভাব দেখেন। কিন্তু সে দেখা সর্বাংশে সত্য নয়।

১৯৪৭ সালের দেশভাগ অনেকের চোখে নিছক সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের ফসল। সে আন্দোলন সাম্প্রদায়িক সন্দেহ নাই—তবে নিছক সাম্প্রদায়িক নয়। তারও ছুক ছিল। এ কথা আমরা শুন্দ যোগ করব। সুরঞ্জন দাসের খেই ধরে বলা যায়, জমিদার-মহাজন বিরোধী কৃষক আন্দোলন হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিরোধের প্রকাশ মাত্র নয়, উচ্চবর্ণের বিকল্পে নিম্নবর্ণের শ্রেণীসংগ্রামও বটে। ওদিকে হিন্দু উচ্চবর্ণের বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংঘাতও সাম্প্রদায়িক বিরোধ। এই দুই বিরোধে একজোট হল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে। মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষকশ্রেণীর সমর্থন লাভ করবে—এটাই স্বাভাবিক ধরে নেওয়া হয়। ১৯৪৭ সালের অভিভ্রতা তার প্রমাণ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি পূর্ব বাংলার কৃষকসমাজে ব্যাপক সমর্থন লাভ করেছিল—এ কথা অস্থীকার করা মৃত্যুর পরিচয় মাত্র। (দাস ১৯৯৩)

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে দেখা গেল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পেছনে কৃষকের সমর্থন ‘স্বাভাবিক’ নয়—ঐতিহাসিক মাত্র। একই ঘটনা বাংলাদেশের জাতীয় সংগ্রামেও ঘটেছে। জনগণের জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে আওয়ামী নীগ এসেছিল বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তে। সে মুহূর্ত কিছুতেই ‘স্বাভাবিক’ বা গ্যারান্টি দেওয়া জিনিস নয়। ১৯৭৫ সালের আগে—সত্য বলতে—১৯৭৩ আর ১৯৭৪ সাল নাগাদ আওয়ামী নীগ জনগণের সমর্থন থেকে বার আনা ব্যক্তিত।

জাতীয় মুক্তির আন্দোলনও এক ধরনের শ্রেণীসংগ্রামই। এ সংগ্রামে, বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে বলা যাক, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে 'স্বাভাবিক' ছিল না। মধ্যবিত্ত নেতৃত্বে জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম সফল হওয়াকে বর্তমান যুগে এক জাতীয় দুর্ঘটনা গণ্য করতে হবে। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম এখন যে পরিণতি লাভ করেছে—বেহাত বিপ্লব হয়েছে—তার পৃষ্ঠা এখনেই। মধ্যবিত্ত বেশিদিন না যেতেই জনগণ থেকে 'আলাদা' হয়ে যায় আর মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ শুরু করে। (ফানো ২০০৪: ২য় অধ্যায়)

১৯৭১ সালের যুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের ব্যাপক অংশ অন্ত হাতে নিয়েছিল। তাদের মধ্যে নতুন যুগের 'স্বাভাবিক' আশা জেগেছিল। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ জাতীয় পরিবর্তন না ঘটায় জনগনে প্রথমে হতাশা ও পরে নৈরাজ্য দেখা দেয়। এ ঘটনা অভিবিতপূর্ব ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের ফলাফল অপরে আত্মসাং করেছে এ কথা বেশিদিন না যেতেই জনগণের জানা হয়ে যায়। ১৯৬০ দশকের শুরুতে ফ্রান্সে ফানো লিখেছিলেন: 'কোন কোন উন্নতিযাত্মী দেশে জনগণ সঙ্গত করণেই দ্রুত টের পায়। স্বাধীনতা লাভের দুই-তিন বছরের মধ্যেই তারা বুঝতে পারে তাদের আশার গুড়ে বাসি পড়েছে।' মানুষ জিজাসা করে: 'কোন কিছুই যদি না বদলায় তাহলে লড়াই করলাম কেন?' ফানোর মতব্য প্রাসঙ্গিক:

১৯৮৯ সালে ফ্রান্সি বুর্জোয়া বিপ্লব সে দেশের নগণ্য কৃষকটিকেও আন্দোলনের ফল কিছু না কিছু নগদ নারায়ণ দান করেছিল। অগ্র উন্নতিযাত্মী দেশের শক্তকরা ১৫ ভাগ মানুষের জীবনে স্বাধীনতা লাভের পর দেখার মত কোন পরিবর্তনই যথে না—এ কথা সকলেরই জানা। মর্মমূল পর্যন্ত দেখার চোখ যাদের আছে তারা দেখতে পান তলে তলে অসম্ভোগ জীবন্ত। অনেকটা গনগনে কয়লার মত সেই অসম্ভোগ যে কোন সময় ফের আগুন ধরাতে পারে। (ফানো ২০০৪: ৩৪-৩৫)

বাংলাদেশের জাতীয় আন্দোলনের আশা হতাশা আদলও ফ্রান্সে ফানোর লেখার মতই। সুখ-শান্তির আশা শুরু নয় কিছু লাভের আশাও নিশ্চয়ই সাধারণের মরোজগতে পরিবর্তন এনেছিল। কিন্তু সকলেই স্থীকার করবেন দেশ স্বাধীন হওয়ার পর 'তারা বিপরীত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হল। সারা দেশের পরিস্থিতি সামগ্রিকভাবে পূর্বের তুলনায় অনেকগুণ খারাপ হয়ে গেল।' (ছফা ১৯৭৭: ৬৭) এই খারাপ হওয়াটা জনগণ হয়তো মেনেই নিত যদি তারা দেখত দেশের মেতারা জনগণের দুঃখকষ্টের ভাগ নিজেরাও নিচেন আর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রাপ্তিত করছেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, যেদা করেন অন্য:

সবচেয়ে সত্য কথা, তিন চার বছরের মধ্যে একেবারে সাধারণ অবস্থার মধ্য থেকে যে শাসক নেতৃশ্রেণীটি আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক দোলতে দুধের সরের মত ভেসে উঠেছিল, জনগণের দুঃখ এবং কঠিতোগের প্রতি তাদের কোন সহানুভূতি নেই। তারা বাংলাদেশের জনগণের সম্পদ ভারতে পাচার করে দিয়ে ভারতীয় পুঁজিপতিদের যোগসাজ্জে দেশের মানুষের দারিদ্র্য বাড়িয়ে তুলেছে—এ কথা সাধারণে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়ে পড়ল। জনগণ সন্দৰ্ভ কারণেই বিশ্বাস করে বসল যে ভারতই তাদের যাবতীয়

দুর্দশার মূল কৰণ। ভারতে জিনিসপত্র পাচার হয়ে যাচ্ছে, সে জন্য তাদের এই তোগাস্তি। (ছফা ১৯৭৭: ৬৭-৬৮)

যুদ্ধবিধ্বস্ত নতুন দেশের সমস্ত অভাব ও দুর্ভিক্ষের সঙ্গে যুক্ত হয় দুর্বলের উপর প্রবলের উৎপীড়ন। জনগণের বেশিরভাগই এর পেছনে ভারতের দায় দেখতে পেল। এটিকু যদি সত্য ও হয়ে থাকে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় এর জন্য দায়ী হবে কেন? ধর্মের ধৰাজাধীরী কয়েকটি রাজনৈতিক দল মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে পাকিস্তান বাহিনীর পক্ষে লড়াই করেছিল। আওয়ামী লীগ সে সব দল নিযিঙ্ক করে কোন অন্যায় করে নাই। সেসব গোপন দল প্রচারের সুযোগ হাতছাড়া করবে কেন? ভারত হিন্দুর দেশ। অতএব ভারতীয় শোষণ মানে হিন্দুর শোষণ। এই যুক্তির সম্বাবহার মনোবলহীন জনশক্তিপদবাচা কয়েকটি দলই শুল্ক করে নাই, কয়েকটি বামদলও করে।

ত্রিপুরা আমলে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার গণতান্ত্রিক চরিত্র একটা ছিল। ১৯০৬-০৭ সালীন বৃহত্তর ময়মনসিংহে কৃষক আন্দোলন সেই গণতান্ত্রিক চরিত্রের সাম্প্রদায়িক আন্দোলন বলেছেন—সুরজন দাস। সেই সাম্প্রদায়িক আন্দোলনই ১৯৪৬-৪৭ সাল নাগাদ এক ধরনের নতুন জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে ছাপিয়ে যায়। কিন্তু পাকিস্তান যুগের আর বাংলাদেশ আমলের সাম্প্রদায়িক আন্দোলন গণতন্ত্রবিরোধী শাসকশ্রেণীসৃষ্টি মিথ্যার আন্দোলন ছাড়া আর কিছু নয়। ভারতীয় পুঁজির অগ্রসী মনোভাব কথে দাঁড়ানোর স্পৃহায় জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু ভারতবিরোধিতার আড়ালে এদেশের সংখ্যালঘু ধর্ম সম্প্রদায়ের বিশেষ হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিষেদগার মধ্যশ্রেণীর খোলামেলা লোড-লালসারই ইতর সংক্রান্ত বৈ নয়!

লোড-লালসার কাবণে না হলেও নিছক রাজনৈতিক নীতিভূষ্টতার দোষে নিয়ন্ত্রণবিশ্রেণীর কিছু কিছু বামপন্থী দলও সাম্প্রদায়িকতায় জ্বালানি জোগান দেয়। বামপন্থী কয়েকটি দল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর—আহমদ ছফাৰ ভাষায়—'একটা কঠিন নৈতিক সহজে' পড়ে। ১৯৬০ দশকের গোড়ার দিকে চিন-রাশিয়া বিরোধের অচিলায় বামপন্থী দলগুলোর একাংশ পূর্ব বাংলার জাতীয় আন্দোলনের বিনিময়ে চিন সমর্পন করে। মেঠোভাষায় বলতে চিনের বন্দু আইয়ুব খানের পেছনে কাতার বাঁধে। ফলে বাংলাদেশের জাতীয় আন্দোলন থেকে তারা ছিটকে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধেও তাদের কোন 'ফলপ্রসূ' শরিকানা ছিল না।

এমতাবস্থায় জনগণকে নিয়ে আওয়ামী লীগের মুখোমুখ্য দাঁড়াবার নৈতিক সাহস তাদের হয় নাই। তাই খৰচ হয়ে যাওয়া সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে আঁতাত কৰাতে হয় তাদের। ভারত ও ভারতাস্ত্রাম আওয়ামী লীগ জোটকে জনগণের গৌত্মিবিপ্লিত কৰার আশায় সাম্প্রদায়িকতা উসকানো দাঁড়ায় তাদের শেষ উপায়। আহমদ ছফাৰ কঠু ভাষায়:

মঙ্গলনা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রকাশিত হক কথা এবং অনান্য পত্রপত্রিকা জনগণের ভারত-বিরোধিতা এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবেরই পরিপোষণ করেছে। (ছফা ১৯৭৭: ৬৯)

শুধু মওলানা নন, আওয়ামী লীগের ভিতরের যে অংশটি ছাত্র ও মুসলিমাজে জনপ্রিয় ছিল, যারা স্বাধীনতার সঙ্গে সমাজতন্ত্রের আওয়াজও তুলেছিলেন তারাও বাদ যায় নাই। নানা কারণে রাজনীতিতে তারা ব্যর্থ হয়েছেন। সেই নানা কারণের এক কারণ সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মধ্যেও। তাদের রাজনীতিরও পরম মূলধন দাঁড়ায় ভারতীয় সন্ত্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা। এই দলটি সাম্প্রদায়িক দলের সাথে কোন আত্মত করে নাই। তাতে কী হয়েছে? আহমদ ছফা মনে করেন:

... ভারতবিরোধী বজ্র্যা রাখার জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও এই দলটির আসম্প্রদায়িক বক্তব্যে প্রৱোপুরি বিশ্বাস করতে পারেন। কেননা ভারত-বিরোধিতা ও সাম্প্রদায়িকতা সেই সময় তাদের কাছে, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, প্রায় সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। (ছফা ১৯৭১: ৭৪)

৩.৩

এহ বাহ্য! মধ্যবিত্ত শ্রেণীর খোদ আওয়ামী লীগও এ বিষয়ে বিশেষ সফলতার পরিচয় দিতে পারে নাই। বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হওয়ার পর দেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির যে শ্রীবৃন্দি তার প্রধান দায় শেষ বিচারে আওয়ামী লীগকেই নিতে হয়েছে। এই দায়ের দুই দিক আছে।

প্রথমে নীতির দিক। আওয়ামী লীগ ও সহযোগী দুই বামদলের ঘোষিত নীতি আসম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ জাতি গতে তোলা। এই নীতির অশ্রয়দাতা ছে হিসারেই তারা বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রচার করে। এই আসম্প্রদায়িকতাও প্রকৃত প্রস্তাবে এক ধরনের পার্টী সাম্প্রদায়িকতার প্রতিষ্ঠা করেছে। ভারতবর্ষীয় মুসলমান সংস্কৃতির সমৃদ্ধ একটা ইতিহাস আছে। এই ইতিহাস মুছে দিয়ে যে বাঙালি সংস্কৃতির প্রচার আওয়ামী লীগের পৃষ্ঠপোষ্য বুদ্ধিজীবীরা করেছেন তা একান্তই অবিমৃষ্যকারী, শিশুসুলভ ও প্রতিক্রিয়াশীল। তার ফল যা হবার তাই হয়েছে। এসলাম ধর্মীয় রাজনীতি ও মুসলমানের সংস্কৃতি যে এক বস্তু নয় এ কথা সাম্প্রদায়িক দলগুলোর মত আওয়ামী লীগও মানে নাই। তাই স্বাধীনতাবিরোধী ধর্মীয় রাজনৈতিক দল নিয়ন্ত্র করার সাফল্যে অভিভূত আওয়ামী লীগের ধূরকরসমাজ আটেশ বছরের ইসলামি সংস্কৃতির চিহ্ন পর্যন্ত মুছে দিয়ে এক আশ্চর্য 'বাঙালি সংস্কৃতির' সংজ্ঞা তৈরি করার কৌশল ধরল। ফল যা হবার তাই হল। নিয়ন্ত্র ধর্মীয় দল বেশ কিছু পরিমাণে জনগণের চোখে বৈধতা ফিরে পেল।

আওয়ামী দায়ের দ্বিতীয় দিক ব্যবহারের দিক। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর আওয়ামী লীগ জাতীয় অর্থনীতির চলন ও গড়ন কোনটাই ছির করতে পারে নাই। যুদ্ধের পর পর যে কোন বিধ্বন্ত দেশে যা হয়, এদেশেও তার অন্যথা হয় নাই। প্রথমেই আসে লুটপাটের কথা। আহমদ ছফা এই লুটপাটকে নিছক 'আইনশৃঙ্খলার সমস্য' জ্ঞান

ফ্রাচন্দিকা

করতে নারাজ। জাতীয় অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদি বিকাশের প্রশ্নটি আওয়ামী লীগের অন্তরে অমীমাংসিত ছিল। স্বল্পমেয়াদের পুনর্গঠন সমস্যায়ও তাদের কিছু করার কার্যকর পছ্ন হাতে ছিল না। ১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচনে এমন বিপুল বিজয় সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের এই কিংকর্তব্যবিমুচ্চ অবস্থা! দেখলে মনে হয় এ ব্যাধি সংক্রামক হতে বাধ্য! অকারণ নয়, যুদ্ধের পর আওয়ামী লীগের একমাত্র মূলধন হয়ে দাঁড়ায় ভারতীয় সাহায্য এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী। আহমদ ছফার নাসিশ ফেলনা নয়:

এই সময় তাদের লোড লালসার থ্রুণ্টি গুটিবসস্টের জীবাণুর মত ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেতে আবশ্য করে। অবাঙালিদের ঘরবাড়ি দখল, দোকান-ব্যবসা আত্মসাং এবং যে সকল লোক মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন দখলদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করেছে তাদের ধন সম্পদ লুঠতরাজ করাই আওয়ামী লীগের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের পেশা হয়ে দাঁড়াল। (ছফা ১৯৭৭: ৬২-৬৩)

এই লুঠতরাজের পরিমাণ কত তার কোন সত্তা পরিসংখ্যান কারো জানা নাই। ছফার প্রায় ১০ বছর পর মন্দদুল হাসান লুঠতরাজ সমস্যাকে নিছক আইনশৃঙ্খলার সমস্যাৰূপ ব্যাখ্যা করেন। হাসানের মতে এই লুটপাটকারী আওয়ামী লীগের লোক ছিলেন না। হাসান লিখেছেন:

জানা যায়, এতদিন যেসব তরক মুক্তিযুক্ত যোগদান না করে — এবং কেন কেন সেতে সচল বা প্রতিবাশী অভিভাবকদের নিরাপদ আশ্রয়ে — বসবাস করছিল তারাও পাকিস্তানের পরাজয়ের পর বিজয় উল্লাসে বিজয়ী পক্ষে যোগ দেয়। মুখ্যত এদের হাতেই ছিল পাকিস্তান সেনা এবং সমর্থকদের ফেলে দেওয়া অস্ত অথবা অরক্ষিত পাকিস্তানি অঙ্গাগৰ থেকে লুঠ করা অস্ত্রশস্তি এবং অচেল গোলাগুলি। ১৬ ডিসেম্বর নিয়াজির আজ্জাসমর্পণের পর এই বাহিনীর উৎপত্তি ঘটে বলে অভিযোগ কাছে আসে। 'Sixteenth Division' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। কালকেপগ না করে এদেরই একটি অংশ অন্যের গাড়ি, বাড়ি, দোকানপাটি, হাবর ও অস্থাবৰ বিষয়সম্পত্তি বিনামূল্যে বা নামামুল্যে মুল্য দখল করার কাজে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। এদের পিছনে তাদের সোভাগ্যাবেষী অভিভাবকদের বা পৃষ্ঠপোষকদের সমর্থন কর্তৃপক্ষ ছিল বলা শক্ত, তবে ১৯৪৭-১৯৪৮ সালে ভারতবিভাগ ও দাম্পত্র পর এই প্রক্রিয়াতেই অনেক বিষয়-সম্পত্তির হাতবদল ঘটেছিল। (হাসান ১৯৮৫: ২৪২; দ্বিতীয় সম্পাদিত)

তবে মন্দদুল হাসান স্বীকার না করে পারেন নাই আওয়ামী লীগও এ যজ্ঞে শরিক হয়েছিল। তিনি অবশ্য আওয়ামী লীগের নাম নষ্ট করেন নাই, 'মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশ' বলে দায়মুক্ত হয়েছেন। তিনি লিখেছেন:

সুযোগসকানী 'সিক্সটিনথ ডিভিশন' সৃষ্টি এই ব্যাপি অভিযোগে সংক্রমিত হয় মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশের মধ্যে। তারপর কে বা 'সিক্সইটনথ ডিভিশনের' লোক, কে বা মুক্তিযোদ্ধা আর কে বা দল পরিবর্তনকারী দাঙাকার — সব একাংকার হয়ে এমন এক লুঠপাটের রাজত্ব শুরু করে যে ঢাকা শহরে নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার সর্বাধিক জরুরি দায়িত্ব পালন হাঁড়াও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে পুলিশ দ্বারা প্রহণে বাত হয়ে পড়তে হয়। (হাসান ১৯৮৬: ২৪২-৪৩)

চাকার এই দৃশ্যকে বলা যায় লুটপাট নাটকের প্রথম অঙ্ক। এ নাটকে ভারতীয় সেনাবাহিনীও কম অংশ নেয় নাই। ছফা উল্লেখ করেছেন আওয়ামী লীগের লোকজন লুটপাট আর আদি ব্যক্তিগত সঞ্চয়ে তন্ময় ও নিবিষ্ট ছিলেন। তাঁরা খেয়ালই করেন নাই যে ‘এরই মধ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পরিত্যক্ত অস্ত্রপাতি, কলকারখানার নানা যত্নাংশ, মিলের মজুত সামগ্রী ভারতে পাচার ঝরে দিতে সহজ হয়েছে’। (ছফা ১৯৭১: ৬৩) এ নিয়ে দেশের কোন কোন অঞ্চলে দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ভারতীয় বাহিনীর সংঘর্ষ বাঁধে। বলবাহ্য আওয়ামী লীগ সরকার মুক্তিযোদ্ধাদেরই নিরস্ত্র করে। ভারতীয় বাহিনীর লুটপাটে অংশ নেওয়ার সত্যতা মঙ্গলুল হাসানের বইতেও (যদিও পরোক্ষ বা কূটনৈতিক ভাষায়) স্থীকার করা হয়েছে। হাসানের প্রাঞ্জল ভাষায়:

ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যেও শুরুতর শৃঙ্খলাভাসের সূত্রপাত হয় যখন দৃশ্যত এক বিশেষ সম্প্রদায়ভূক্ত কিছু অফিসার এবং তাদের অধীনস্ত সেনা যশোর, ঢাকা, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের মূলত ব্যাটেনমেন্ট এলাকায় এবং খুলনার ক্যান্টনমেন্ট ও শিল্প এলাকায় লুটপাট শুরু করে; কিন্তু তা ব্যাপক আকারে ধারণ করার আগেই তাদের উৎসর্বন কর্তৃপক্ষের দৃঢ় হস্তক্ষেপে বন্ধ হয়ে যায়। (হাসান ১৯৮৬: ২৪৪)

আওয়ামী লীগ দলের ব্যবহারিক দায় সবচেয়ে প্রকট হয় কলকারখানা প্রশাসনে। পাকিস্তানি শিল্প মালিকদের ফেলে যাওয়া কলকারখানা জাতীয়করণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় শেখ মুজিবের পাকিস্তান থেকে ফিরে আসার আগেভাগেই। কিন্তু তাঁর আসা না আসায় অবস্থার ইতরবিশেষ হয় নাই। মঙ্গলুল হাসান বলতে চেয়েছেন লুটপাটের ঘটনাটি ছিল ব্যতিক্রম। আহমদ ছফা মনে করেন ওটাই নিয়ম ছিল। ছফা এর দায় থেকে শেখ মুজিবকেও রেহাই দেন নাই। ‘তাঁর বড় বড় ছফ্ফার দেওয়া ছাড়া করারও কিছু ছিল না’—এ কথা স্থীকার করেও ছফা লিখেছেন লুটপাট কর্মটি প্রকাশ্যে শুন্দ গোপন থাকে:

এই কর্মের সঙ্গে কর্মী এবং মেতা এত অধিক হারে ঝড়িত ছিল যে দলীয় কোন শৃঙ্খলা প্রয়োগ করে তাঁর পক্ষে রাশ টেনে ধরা অসম্ভব ছিল। বরং ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক এই পক্ষিল আবর্তে নিপত্তি হয়ে তিনি নিজেও খেই হারিয়ে এই কর্মকাণ্ডের অংশীদার হয়ে উঠেছিলেন। (ছফা ১৯৭১: ৬৩)

৩.৪

কলকারখানা জাতীয়করণের সিদ্ধান্তকেই অনেকে সমাজতন্ত্রের পথে প্রথম পা টাঙ্গানো মনে করেছিলেন। কিন্তু এ সকল প্রতিষ্ঠানে প্রশাসক নিয়োগে দলীয় নীতি গ্রহণ করায় উৎপাদন করা পথের চেয়ে যত্নাংশ ও মজুত উপরণই বরং বেশি বিক্রয় হয়ে যায়।

একই পদ্ধতিতে পুনর্গঠন কাজের নিয়মে আসা বিদেশি সহায়তা বাঁটোয়ার ক্ষেত্রেও চরম অনিয়ম দেখা দেয়। সে সময় দুর্নীতির প্রসার এমনই ব্যাপক আকার ধারণ করে যে ১৯৭৩ সালের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা দলিলেও বিষয়টি নিয়ে দেখা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের সে সময়কার দুই নথর ব্যাপ্তি নৃবল ইসলাম বলেছেন, কোন উন্নতিশীল দেশের পরিকল্পনা দলিলে দুর্নীতি বিরাজমান এ কথা মেনে নেয়া আর খোলাখুল আলোচনার মাধ্যমে দুর্নীতি সম্পূর্ণ দূর করা না যাক, অন্তত মাত্রা কমানো দরকার এমন কথা জাহির করা ১৯৭০ দশকের সাথে খুবই ব্যতিক্রমিত্ব ব্যাপার। (ইসলাম ২০০৩: ১৯৩-১৯৪)

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই ঐতিহাসিক দুর্নীতিপরায়ণতাই বাংলাদেশের বর্তমান দুর্দশার আসল কারণ। আহমদ ছফা লিখেছেন:

অন্যান্য দেশে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় ধনিক শ্রেণী গড়ে উঠেছে, কিন্তু তারা সমাজকেও কলকারখানা, শিল্প বাণিজ্যে নানা দিক দিয়ে ধরী হিসেবে গড়ে তুলেছে। রাষ্ট্র এবং সমাজকে একেবারে দরিদ্র-দিগ্বিষণ রেখে এক একটি শ্রেণী অনুর্বিত অর্থে ধরী হতে চেষ্টা করলে সমাজ জীবনে যে বিয়ক্তিমূল হয়, বাংলাদেশ তা প্রতোক্ষ করেছে। (ছফা ১৯৭১: ৬৪-৬৫)

ছফা আরো উল্লেখ করেন, এই প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র কোন রকম প্রতিবন্ধকতা তো করেই নাই বরং নিজেই অগ্রণী হয়ে সে সুযোগ করে দিয়েছে।

এ প্রশ্নে নৃবল ইসলামের সাম্প্রত্য প্রমাণ করে আহমদ ছফার বক্তব্য সঠিক। নৃবল ইসলাম বলেন, পরিকল্পনার সামাজিক ও অর্থনৈতিক মকসুদ কী কী আর কোন কোন নীতি অনুসারে সে মকসুদে পৌছা যাব তা নিয়ে সরকারের বক্তৃতা-বিশৃঙ্গি জনমনে সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি করে। দিন আর মাস যতই যায় জনগণ বুবাতে পারে এইসব বিবৃতি নিষ্কর লোকদেখানো প্রচারণা, আস্তরিক তাগিদের প্রকাশ নয়। সমাজতন্ত্র বলতে একেকজনের ধারণা একেক রকম। নৃবল ইসলাম লিখেছেন:

শেখ মুজিব আর তাঁর ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহকর্মীদের সমাজতন্ত্র খুব সম্ভব বড়লোকি (ফেব্রিয়া) সমাজতন্ত্রের বিশেষ বা লোকদেখানো সংস্করণের অধিক নয়—এ কথা দিলের পর দিন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। এই ধারণা অনুসারে অর্থনীতির উরুবুর্পুর কিছু খাত সরকারের হাতে থাকবে। (ইসলাম ২০০৩: ১৯৫)

নৃবল ইসলাম স্থীকার করেন সমাজতন্ত্রিক অর্থনীতি বলতে কী বোঝায় সে ধারণা মধ্যবিত্তশ্রেণীর দলটির ছিল না। শুধু তাই নয়, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কোন দায়িত্বও দলটি খোলামনে দ্বিধাহীনচিত্তে গ্রহণ করে নাই। ১৯৭২ সালে কলকারখানা পরিচালনার অভিজ্ঞতা থেকেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরিকল্পনা কমিশনের কয়েকটি প্রস্তাব সরকার দ্বিধাহীনচিত্তে, আধাৰিকচড়াভাবে গ্রহণ করে। তাৰপৰও পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যরা পদত্যাগ করেন নাই। ত্রিশ বছর পর লেখা শুভিকথায় নৃবল ইসলাম কিছু পরিমাণে হলেও আপনার পাপ স্থীকার করেছেন। (ইসলাম ২০০৩: ১৯৭)

মধ্যবিভক্ষণীর দ্বিতীয় মধ্য দিয়েই জনগণের 'মুক্তিযুদ্ধের' পরাজয় ও বুর্জোয়াশ্রেণীর 'স্বাধীনতা সংগ্রামের' বিজয় সূচিত হচ্ছিল। প্রকৃত কোন পরিবর্তন সাধন না করেও জনগণের মধ্যে পরিবর্তনের আপাতস্বাদ এনে দেওয়ার নামই ইতালীয় দার্শনিক আন্তর্নিয়োগ্যামিসির দৃষ্টিতে বেহাত বিপ্লব। এই বিপ্লবের নাম ইতালি ভাষায় 'ইল ফার্মিসমো' বা লাঠিতত্ত্ব। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধও এ বাবদ বেহাত বিপ্লবেই হস্তান্তরিত হল।

আওয়ামী লীগ চাইছিল প্রকৃত অস্তাবে জাতীয়করণ নীতি বাতিল করতে। কিন্তু সাহসে কুলায় নাই। অনেক দিন কিছু না করে তারা অনিশ্চয়তা আর দোনুল্যমানতা মধ্যেই কাটিয়ে দেয়। আহমদ ছফার ১৯৭৭ সালের মস্তব্যাই নূরুল ইসলাম হৃবহু লিখে দিয়েছেন ২০০৩ সালে।

শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক নেতারা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন না। নির্দিষ্ট কোন ভবিষ্যৎদৃষ্টি ছাড়াই তারা ঘূরপাক খেলেন। একবার ওদিকে গেলেন আবার এদিকে এলেন। অনেকদিন ধরে তারা জাতীয়করণের কথা বলে আসছিলেন। তাই স্বাধীনতা লাভের এত অঙ্গকালের ভিতরই সেই নীতি বিবর্জন দিয়ে উচ্চে পথে চলতে তাদের বাধা ছিল, রাজনৈতিক পরিবেশ তেমন উচ্চান্তিতে অনুকূল ছিল না। এর মধ্যে গৃহীত ব্যবহৃতি বাতিল করে বিপরীত দিকে যেতে হলে অর্থনীতির ভবিষ্যৎ সংযুক্ত যে ব্রহ্মজ্ঞান থাকা দরকার সে জ্ঞানও তাদের ছিল না। অথচ যোলকলায় পূর্ণ হয় এমন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করতে হলে যে প্রয়াস গ্রহণ করা দরকার সে প্রয়াস গ্রহণের ক্ষেত্রে তাড়াও তাদের ছিল না। পরিকল্পনা দলিলটির বাস্তবকরণ দিতে হলে সমাজ ও অর্থনীতির যে সব মূল পরিবর্তন দরকার বলে পরিকল্পনা কর্মশন যে প্রস্তাব দিলেন সে প্রস্তাব বাতাসে ঝুলতে থাকল। তারা সে প্রস্তাব না করলেন গ্রহণ, না দিলেন ফেলে। (ইসলাম ২০০৩: ১৯৬)

ফল যা হবার তাই হয়েছে। কানের সঙ্গে মাথাও গিয়েছে। 'সমাজতন্ত্র' নীতির যা হয়েছে 'গণতন্ত্র' নীতিরও তার অধিক হয় নাই। অধিক হয় নাই জাতি-ধর্ম নির্বিশেষ বা ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতিনিরপেক্ষতা নীতিরও। জাতীয়তাবাদ মানে যে জাতিবিশেষের প্রতি পক্ষপাত সে কথা আহমদ ছফার মত মনীয়ীও আমল করার সময় পান নাই। বাংলাদেশের জাতীয় সীমানার ভিত্তির অনেকে জাতি সংখ্যায় লম্ফ। বাংলাদেশ রাষ্ট্র সকল নাগরিককে 'বাঙালি' পরিচয় দান করে সংখ্যালঘু জাতির মুখে লয়সংখ্যা করে দিয়েছে। পরিতাপের কথা, মহাত্মা আহমদ ছফার চোখেও সে সংখ্যা ধরা পড়ে নাই। নাকে তার আগ পৌছে নাই। ধর্মীয় সংখ্যালঘুর প্রশংস্তি ইতিহাসের উৎক্ষেপ— এখনো, ২০০৬ সালেও সরাসরি বর্তমান সে প্রশংস্তি। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত জাতীয় সংগ্রামের কেন্দ্রে ছিল এই প্রশংস্তি। সুতরাং স্বাধীন নতুন রাষ্ট্রে ধর্মনিরপেক্ষতাই শ্রেষ্ঠ জাতীয় নীতি হবে এ সত্ত্বে সন্দেহ থাকারও কথা ছিল না। আহমদ ছফাও লিখেছেন:

যুক্তের পর নামা সম্প্রদায় বিলোভিতে এখানে একটি ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তার গে সুই বিকাশকেত্র রচিত হওয়ার কথা ছিল, তার সঠিক সূচনাটি ও হতে পারেন। (ছফ ১৯৭৭: ৭০)

৩.৫

কেন পারে নাই? আহমদ ছফা দু প্রস্তু কারণ নির্দেশ করেন এব। এক নম্বের স্বাধীনতা আন্দোলনের উড়ো বৈ নেতা জাতীয় মধ্যশ্রেণী ও ভারতশাসক উচ্চশ্রেণীর নীতি। দুই নম্বের বাংলাদেশের নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বামপন্থী রাজনৈতিক দল ও চিনা শাসকশ্রেণীর নীতি। এই দুই সুযোগে—দুই ব্যর্থতার সুযোগে বলাই বেহতর—শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হবার আগে থেকেই দেশের মুসলমানি সম্পন্ন হয়। সাম্প্রদায়িক শক্তি স্বরূপে নতুনভাবে জেগে ওঠে।

শেখ সাহেবের পতনের পর তাদের উত্থান হয়। মুক্তিযুদ্ধের বেহাত হয়। সেই যুক্তের অঙ্গীকার জাতি, ধর্ম ও শ্রেণীবিনিপক্ষে রাষ্ট্র কায়েম হয় নাই বলেই শক্তিপক্ষ ফামতায় ফিরে এসেছে। এই বেহাত বিপ্লবের প্রথম বলি অবশ্যই খোদ মুক্তিযুদ্ধ। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক শক্তির বেশিরভাগই বাংলাদেশ রাষ্ট্র চায় নাই। জনুলগঞ্জে বাংলাদেশের অঙ্গীকার ছিল ধর্মনিরপেক্ষ জাতি এবং জাতীয় শোষণমুক্ত গণতন্ত্র। এই শক্তিরা এসব আদর্শকে ঘৃণা এবং অঙ্গীকার করেন। ছফার মস্তব্য:

তাদের মনের মধ্যে পাকিস্তান রাষ্ট্রটির অস্তিত্ব এমনভাবে পোথে আছে যে সে পাকিস্তানটি ভেঙে পিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তর ঘটলেও অবচেতনেও তাদের শীকার করতে বাধে। তাই নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের রাষ্ট্রকর্পের প্রসঙ্গে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পাকিস্তানটিকেই তারা জীবিত করতে চায়। তাই পাকিস্তান রাষ্ট্রের অতি পরিচিত জিকিরগুলোও তাদের মুখে নতুন করে প্রাণ পেয়ে ওঠে। (ছফ ১৯৭৭: ৭৬-৭৭)

১৯৭১ সালে যে সকল শরণার্থী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল— তাদের মধ্যে যারা সপরিবারে—আহমদ ছফা অনুমান করেন 'তাদের শতকরা আশিভাগই ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক।' তাদের অধিকাংশই মনে করতেন যেহেতু ১৯৪৭ সালে মহাত্মা গান্ধি এবং জওয়াহরলাল নেহেরু প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দ্বিজাতিতন্ত্র অনুসারে ভারতবিভাগ মেনে নিয়েছিলেন তাই তারা সেই ভারতবিভাগেরই বলি। (ছফ ১৯৭৭: ৮১)

এই মনে করাটা অমূলক ছিল না। সংখ্যালঘু হয়েও তাদের বেহাই কোথায়? পূর্ব বাংলার সমস্ত জাতীয় আন্দোলনকে হিন্দুদের নেপথ্য কারসাজি আর বাংলার সকল সাংস্কৃতিক প্রকাশকে হিন্দুয়ানি কাজকারবার বলাটা পাকিস্তানি শাসকশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণের পর্যায়ে উন্নীত হয়। আহমদ ছফার ভাষ্য:

অতীতের বাংলা ভাষা আন্দোলন, হরফ বর্জন, রবীন্দ্রসাহিত্য, পঠন-পাঠন ইত্যাদি প্রশংসনের প্রত্যেকটিতে পতিমা শাসকগোষ্ঠী যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, তাতে একটি বিষয়ই সম্যক প্রমাণিত হয়েছে যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এবং জনগণের ভাষা ও সংস্কৃতিকে হিন্দুয়ানি

প্রভাবমুক্ত করে একটি খাটি পাকিস্তানি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি নির্মাণ করার জন্যই এই সব বিবিন্নধের আরোপ করা হয়েছে। (ছফা ১৯৭৭: ২৯-৩০)

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে পাকিস্তান বাহিনী যে আঘাত হানে তা নতুন গুণে নয়, শুধু মাত্রায়। এই চূড়ান্ত আঘাত হানা ছিল ১৯৫০ ও ১৯৬০ দশকে আরোপিত সাংস্কৃতিক বিবিন্নধেরেই যৌক্তিক, পরিবর্ধিত ও সামরিক সংক্রম। পাকিস্তান বাহিনীর হামলা বিশুজ্জল ছিল—এ কথা তার পরম শক্রাও বলবে না। আক্রমণের লক্ষ্যস্থূল বিবেচনা করলেই সে সত্য পরিকার হয়। তারা আঘাত হানে প্রথমে জাতীয় আন্দোলনের কেন্দ্র বলে বিবেচিত যোকামে যোকামে, সেনানিবাস ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। তারপর হিন্দুসাধারণ ও জাতীয় আন্দোলনরত আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির উপর। উদ্দেশ্য হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন ঘরনূয়ার জয়িজিয়ারত ফেলে সীমান্তের প্রাণের টলে যাক, নয় দেশে থেকে চিতার স্থান এহণ করুক।

আহমদ ছফার ধারণা, ইয়াহিয়া খান সরকারের পোড়ামাটি নীতির লক্ষ্য ছিল একাধিক। তারা আশা করেছিল এক কোটির কাছাকাছি হিন্দু জনসংখ্যা ভারতে চলে গেলে তাদের ধনসম্পদ, ঘরবাড়ি, বাবসা-বাণিজ্য অন্যদের হাতে পড়বে। নতুন মালিকদের মধ্যে নতুন সমর্থক তৈরির সম্ভাবনা পাকিস্তান সরকার দেখতে পায়। দুই নথরে ধরে নেয় এর ফলে বাঙালি সংস্কৃতির উপর হিন্দুয়ানির অভিবটাও করে যাবে। তিনি নথরে বাড়িত জনসংখ্যার বোমা ভারতে একটি স্থায়ী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার বীজ রোপণ করবে। শেষ কথা পাকিস্তানি শাস্তিপ্রতিষ্ঠার একমাত্র এবং প্রধান বাধা হিন্দু সম্প্রদায়—এই বিশ্বাস থেকে তারা বাংলাদেশকে নিহিন্দু করার মহাপ্রকল্প এহণ করে। (ছফা ১৯৭৭: ৩১-৩৫)

পাকিস্তানের সব উদ্দেশ্য পূরণ হয় নাই—এ কথা বলা নিশ্চয়যোগ্য। তবে তাদের সব উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে সে কথাও বলা যাবে না। যুদ্ধের পর দেখা গেল হিন্দু-মুসলমান বিদ্যে ও বিভেদেরখি করে নাই। বরং আরো স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়েছে। এ কী করে সন্তুষ? ছফার ভাষ্য:

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি সর্বস্বত্ত্ব। তারা আশা করেছিল যে স্বাধীনতার পর তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের হাতে নিগৃহীত হবে না। সব ব্যাপারে সমান সমান স্বয়েগ সুবিধা লাভ করবে। কিন্তু স্বাধীনতার পর দেখা গেল, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনোভাব অনেক বেশি বিভিন্ন গোচে। তারা তাদের দিকে অধিকতর সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাতে আরম্ভ করেছে। যুদ্ধের সময় তারা ভারতে চলে গিয়েছিল, তাদের ঘরবাড়ি সরাকুচ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সোকদের হাতে পড়েছে। সেগুলো দাবি করাতে অধিকতর তিক্ততার সৃষ্টি হল। (ছফা ১৯৭৭: ৭০)

পাকিস্তানি শাসকদের উদ্দেশ্য, যা বলছিলাম কিছু অংশে সফল হল। পাকিস্তান হিন্দু সম্প্রদায়ের স্থাবর বিষয়সম্পদ বাঙালি মুসলমান হাতে তুলে দিয়ে দুই পাখি এক টিলে মারার যে চেষ্টা করেছিল তার ফল ফলল। ফিরে এসে হিন্দুরা ভিন্ন এক

পরিস্থিতির মুখোমুখি হল। তারা দিতীয় শ্রেণীর নাগরিকই রয়ে গেল। পাকিস্তান নাই, কিন্তু পাকিস্তানি ব্যবহার থেকে গেল। আহমদ ছফা বলেন:

তাদের সম্প্রদায় হিসেবে চলে যেতে হয়েছিল এবং সম্প্রদায় হিসেবেই ফিরে আসতে হল। তাদের পুনর্বাসনের কেন পথ রাইল না। সরকার কিংবা অন্য কেউ তাদের সাহায্য সহায়তা দেয়ার জন্য বিশেষ এগিয়ে এল না। (ছফা ১৯৭৭: ৬৬)

এই অবস্থায় আপনি হলে কী করতেন? বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ও তাই করেছে। তারা ভারতমুখী হয়ে পড়ল। আগে খানিক ছিল। এখন আরো হল। আহমদ ছফা বলেন ঘটনা খুবই স্বাভাবিক:

ভারত ছিল। তারা প্রাণ বাচাতে পেরেছে, ভারত সরকার নয় মাস তাদের থাইয়ে পড়িয়ে রেখেছিল, ভারতীয় সেনাবাহিনীর সরাসরি হত্তকেপে তারা দেশে ফিরে আসতে পেরেছে এবং এত কষ্ট ভোগ করেও তাদের দশা পূর্বের চাইতে ভাল নয়, বরং অনেক গুণে খারাপ। এই অবস্থায় তাদের একটি মুখ্য অংশের ভারতমুখী হয়ে পড়া খুবই স্বাভাবিক। (ছফা ১৯৭৭: ৭০-৭১)

বাংলাদেশের বাঁয়ীয় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার সর্বোত্তম গ্যারান্টি ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় গণতন্ত্র। সে তো দীর্ঘমেয়াদের কথা। আর কে না জানে দীর্ঘমেয়াদে আমরা সকলেই পরলোকগমন করি! তাই যে সমস্ত রাজনৈতিক দল ভারতকে সমর্থন করত তাদের ‘অঙ্গ সমর্থন দিয়ে চিকিরে রাখাই’ তারা মনে করল নিরাপত্তার সর্বোত্তম গ্যারান্টি।

৩.৬

এখন স্বাভাবিক প্রশ্ন—এ আবর্তনের শেষ কোথায়? আওয়ামী লীগ ও সহযোগী রাজনৈতিক শক্তি রাষ্ট্রনীতি ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষা করতে পারে নাই। ভবিষ্যতে যে পারে তার সম্ভাবনা কতখালি? ধর্মনিরপেক্ষতার দায় আর গণতন্ত্রের দায় এক কথা। মনে রাখতে হবে আওয়ামী লীগ ধর্মবিষ্ণু শ্রেণীর দল। ভুললে চলবে কেন একদা এই দলের নাম ছিল আওয়ামী ‘মুসলিম লীগ’?

সত্যের খাতিরে, কারো মুখ রক্ষা না করে, করুন করা দরকার: বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার ইতিহাস স্বাধীন ইতিহাস নয়, ভারতেতিহাসের অংশ মাত্র। ভারতে যা ঘটে, বাংলাদেশে তার চেতু এসে লাগে—আজ পর্যন্ত ইতিহাসের সাক্ষ্য এই। বাংলাদেশে যা ঘটে তা কেন ভারতেও ঘটের না? ইতিহাসের স্পর্ধা এটা—বড়জোর এইটুকু বলা যায়। বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার তাঃপর্য এতিহাসিক। এর মধ্যে সারা ভারতবর্ষের অসমান্ত জাতীয় সমস্যা সমাধানের সূত্র। বাংলাদেশের পথ ভারতবর্ষের সকল নির্যাতিত জাতির রাষ্ট্রাধিকার প্রতিষ্ঠার পথ। এই কারণে ভারতের

শাসকশ্রেণী বাংলাদেশের জন্মলগ্নে যতখানি উদ্ঘাস বোধ করেছিল, এখন ততটা করাগে না। আমরা দেখেছি সে দেশের এককালীন পরবর্ত্তী সচিব জে.এন. দীক্ষিতের একাধিক লেখায় এই ইঙ্গিত স্পষ্ট। (দীক্ষিত ১৯৯৬, দীক্ষিত ১৯৯৯)

বাংলাদেশের অস্তিত্ব ভারতের জাতিনীতির পথের কঁটা, মুখের নিত্য হয়কি। কারণ সে যথা, সে উদ্বাহণ। শুন্দি একটি শত্রুই ভারত বাংলাদেশ মেনে নিতে পারে, যদি সে ছিতৌয় পাকিস্তান থাকতে রাজি হয়। সে সাম্প্রদায়িক যুক্তিতে—অর্থাৎ মুসলমান আলাদা জাতি, এই যুক্তিতে টিকতে চাইলে ভারতের জাতিসমস্যায় তাঁর কোন প্রভাবই থাকে না। ভারতীয় শাসকশ্রেণীর এই সূক্ষ্ম অন্তিক্রিতা নিয়ন্ত্রণ দ্বারা দ্ব্রৈর মত বাংলাদেশে প্রতিদিন আমদানি করার লোকের অভাব নাই। রপ্তানিকারকানা ভারতে প্রবল। (দীক্ষিত ১৯৯৬: ১৫৪-১৫৫)

এদেশে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার। যে জাতীয় আন্দোলন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কারণ, ধর্মনিরপেক্ষতা তারই গোড়ার অঙ্গীকার। এখন সাময়িকভাবে বাংলাদেশে জাতীয় সংগ্রাম পর্যাপ্ত। তাঁর এক কারণ বাংলাদেশে আর এক কারণ ভারতে। এই কথাটি বিশেষ আমল করা দরকার।

১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর বিদেশি এক তরুণ অধ্যাপক বাংলাদেশে এসেছিলেন। বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে ঘুরে ঘুরে তিনি প্রায় পাঁচ হাজার পুরোনো মন্দিরের ছবি তোলেন। একইভাবে অনেক মসজিদের ছবিও তিনি তোলেন। ভদ্রলোকের নাম—ডেভিড মেককাচন—দেখে মনে হয় তিনি জাতে কৃত। দুর্ভাগ্যবশত মাত্র ৪২ বছর বয়সে—মোতাবেক ১৯৭২ সালে পোলিও রোগে মারা যান এই ভদ্রলোক। তখন তিনি যাদেবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাঁর স্মৃতিসংস্মরণের সভাপতি মনোনীত হন তাঁরীয় বন্ধু চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়।

১৯৬৪ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে সেকালের পূর্ব পাকিস্তান সফর করে কলকাতার একটি ইংরেজি প্রতিকার্য ডেভিড মেককাচন যে লেখা প্রকাশ করেন, আমি তাঁর বাংলা অনুবাদ পড়ার সুযোগ পেয়েছি। লেখাটির নাম ‘ইমেগেশনস অব ইন্ডি পাকিস্তান’ অনুবাদে দাঁড়িয়েছে ‘পূর্ব পাকিস্তানের অন্তরে’। লেখায় মেককাচন বলেন পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়েছে একদিকে পাকিস্তান সরকার, অন্যদিকে ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকারী। পূর্ব পাকিস্তানের বাণিজ্য মুসলমানরা দাঙ্গা করে নাই বরং তাঁরা করেছে প্রতিরোধ। অথচ প্রদিকে কলকাতার পত্রপত্রিকায় এ বিষয়ে মিথ্যা প্রচার হয়েছে এতার। মেককাচনের সমবাদার পশ্চিম বাংলার এক সম্পাদক জানিয়েছেন, এই লেখা প্রকাশের পর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেউ কেউ তাঁর চাকরি খাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিল। মেককাচনের লেখা থেকে অংশবিশেষ উজ্জ্বল করাই:

পাকিস্তানে হিন্দুরা কোন উৎসব অনুষ্ঠান করতে পারে না এই ধরনের সংবাদ কলকাতা। ছড়িয়েছিল বলে আমি যাঁর অভিধি তিনি খুব অসম্ভোগ প্রকাশ করবেন। সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে ধর্মের কোন যোগ নাই, আমার এই ধরণে স্পষ্ট হয়েছে ক্রমে ক্রমে। সমস্ত সাধারণ সংকর, যা জনপ্রিয়, সব একত্র হয়ে গিয়েছে। আমি যেখানেই জিজ্ঞাসা করেছি সেখানেই শুনেছি, পূজা ইত্যাদি প্রতিবন্ধকারীনভাবে সর্বত্র অনুষ্ঠিত হয় এবং মুসলমানরাও আনন্দে

সঙ্গে সমস্ত তামাশায় যোগ দেয়। কতক কতক আম পুরোপুরি হিন্দুবসতিপূর্ণ। কেউই চিরাচরিত প্রথাসংক্রান্তের অনুসরণে বাধা দেয় না। ভারতের মত এখানেও তাঁরা নিয়মিত ধূতি পরে কালীবাড়ি যায়। (মেককাচন ১৯৯৫: ১০)

ডেভিড মেককাচন অনেক হিন্দুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাঁরা নিরাপত্তা সহকে নিঃসন্দেহ কিনা। তাঁরা বলেছিলেন, না। কারণ কি? মেককাচন বলেন, ‘তাঁর কারণ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যেমন শুনেছি, মুসলমান মাঝেই দুর্ধর্ষ প্রকৃতির তা নয়।’ ১৯৬৪ সালের দাঙ্গা যে বহিরাগত শ্রমিকদের মাধ্যমে পাকিস্তান সরকার বাঁধিয়েছিল তা তিনিও উল্লেখ করেছেন।

খুলনা-যশোরের মাঝামাঝি অভয়নগরে একটা পুরোপুরি হিন্দুগ্রাম পড়ে। (কী সুন্দর পরিচ্ছন্ন আম, যার উচু উচু গাছ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে) খুলনাম চারপাশের মুসলমান-গ্রামগঞ্জের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক মধ্যের। তাঁদের দ্বারা আক্রান্ত হবে এ বকম কোন ত্যাই নাই। কলকাতার হাঙ্গামা বরং তাঁদের প্রাণে বেশি ভীতির সংক্ষরণ করে। দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাইরের থেকে ছুটে আসার ভয় বেশি। কারখানার শ্রমিকরা—বিশেষ বিহারি মুসলমানরা যাদের এখানে কোন শেকড়-বাকড়ই নাই—এবারকার খুলনার দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্য পূর্ণমাত্রায় দায়ী। (মেককাচন ১৯৯৫: ১১)

মেককাচন এক জায়গায় সাহস করে বলেছেন: পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের জীবন ও সুখস্থানের নির্ভর করছে বিশেষত দৃটি অবস্থার উপর। প্রথম অবস্থার নাম পাকিস্তান সরকার, দ্বিতীয়ের নাম ভারতের সাম্প্রদায়িকতা। তিনি ভেবেছেন: ‘গুরু তাই নয়, এ দুই অবস্থাকে পরম্পরারের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা যায় না, করলে বরং জিনিসটা আরো বাড়ে।’ (মেককাচন ১৯৯৫: ১১) এই প্রয়োজনীয় সাবধানবাণীর পর তিনি বলতে পিছপা হন নাই, ‘দাঙ্গা-হাঙ্গামা দিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বক করা যায় না।’ ১৯৬৪ সালের পূর্ব বাংলার হিন্দুদের কথা মনে রেখে মেককাচন লিখেছেন:

ঠিক এই যুহুর্তে কারা তাঁদের সবচেয়ে বড় শক্তি? নিশ্চয়ই পাকিস্তান সরকার নয়, বিশেষ করে যে সরকার নির্বাচন আর পূর্ববঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সামলাতে ব্যস্ত। আমি জোর করে বলতে পারি, ভারতে মুসলমান-বিরোধী প্রচারাই এ পরিবেশের সবচেয়ে বড় শক্তি। (মেককাচন ১৯৯৫: ১১-১২)

মেককাচনের লেখা আরো উন্নার করা সম্ভব। কিন্তু আমাকে এ লেখা শেষ করতে হবে। ১৯৬৪ সালের হাঙ্গামা বিষয়ে মেককাচন যা লক্ষ্য করেছেন তা স্মরণ না করলেই নয়। তাঁর মতে সেবারের হাঙ্গামাটা জটিল হয়ে পড়েছিল বাণিলি ও অবাণিলি, সরকার ও বিরোধী দল দুই সম্প্রদায়ের কারণে। তা ছাড়াও:

এ হাঙ্গামার কারণ সম্ভক্ষে আরো দৃটি বিপরীত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেল। যখন আমি একজন সরকার পক্ষের লোককে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম, সে বলল—খুলনার দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটিয়েছে আসাম থেকে আগত উদ্বাস্তু মুসলমানরা। কিন্তু আবার যখন একজন সরকারের বিপক্ষের লোককে জিজ্ঞাসা করি, সে বলল, পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী একটি ধর্মঘটের

আয়োজন চলছিল। তার থেকে জনসাধারণের দৃষ্টিকে সরিয়ে নেবার জন্য এই রকম শয়তানি কাজ সরকারই ঘটিয়েছে। (মেককাচন ১৯৯৫: ১২)

বাংলাদেশের শিক্ষিত লোকেরা মেককাচনকে বিশ্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কলকাতার দাঙা-হাঙামায় ছাত্রার অংশগ্রহণ করল কেন? সেখানে কি শিক্ষিত লোক ছিল না বাধা দেবার মত?' অর্থাৎ ততদিনে বাংলাদেশের শিক্ষিত লোকেরা ধোরেই নিয়েছিলেন, দাঙা-হাঙামা ইত্যাদি গুণ ও ধর্মান্ধ লোকদেরই কাজ। হিন্দুদের বশাব জন্য ঢাকাসহ বাংলাদেশে অনেক মুসলমান প্রাণ দিয়েছিল, সে কথাও মেককাচনকে বলা হয়। ঢাকার সমস্ত প্রতিপক্ষিকা যেখানে দাঙার বিরুদ্ধে, সেখানে কলকাতার প্রাইভেট প্রতিকাণ্ডো কেন হাঙামাটা বেড়ে যেতে সাহায্য করল? এর প্রকৃত সন্দৰ্ভ দিতে পারেন নাই ডেভিড মেককাচন। তবে সততার সঙ্গে লিখেছেন:

এর উত্তরে আমি শুধু এই কথা বলতে পেরেছিলাম, সমস্ত শিক্ষিত মানুষ বা সমস্ত প্রাইভেট প্রতিকা যে সাম্প্রদায়িক হাঙামার পক্ষে ছিল তা নয়। আমি কলকাতার সাম্প্রদায়িক শাস্তিরক্ষার প্রেছান্দেরকদের কথা বলেছিলাম। হাঙামা বক্রের পক্ষে হাতেরের সাহায্য এবং বিপদ্ধস্ত লোকদের জন্য শিবির তৈরির কথা বললাম। জেপি নারায়ণ বা অনন্দাশক্তর রায় প্রযুক্ত মানুষের কথা বললাম। আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করি সেখনকার এক সহকর্মীও একটি কথার ব্যাখ্যা কিন্তু করতে পারিনি। তার ছিল এরকম কথা: হাঙামাটা মুসলমানদের শিক্ষা দেবার জন্য। হিন্দু যে নিরীর্থ নয়, এতেই প্রমাণ হল। (মেককাচন ১৯৯৫: ১৩)

মেককাচন সঙ্গে যোগ করেছেন, 'এ যে শুধু একজনের কথা এমন সন্দেহ করার উপযুক্ত কারণ নাই।' এখন সেই ১৯৬৪ সাল নাই, মেককাচনও নাই। এ কথা সত্য। কিন্তু অযোধ্যা আছে। আর উপযুক্ত কারণও এখন কোথাও নাই।

শুন্দ থশু আছে। এ প্রশ্নের সন্দৰ্ভের উপরই নির্ভর করছে বাংলাদেশে (এবং ভারতবর্ষেও) জাতিগড়ার লড়াই। লড়াই ছাড়া শাস্তি নাই।

শ্রাবণ-কার্তিক ১৪১৩ ॥ জুলাই-অক্টোবর ২০০৬

বোধিনী

১. 'As flowers turn toward the sun, by dint of a secret heliotropism the past strives to turn toward that sun which is rising in the sky of history'
২. 'It so happens that the unpreparedness of the educated classes, the lack of practical links between them and the mass of the people, their laziness, and, let it be said, their cowardice at the decisive moment of the struggle will give rise to tragic mishaps!'
৩. 'On the question of a secular state, Sheikh Mujib explained that it was a decision by the peoples' representatives and did not at all imply that the

state was antireligion. In fact, the Muslims of Bangladesh were deeply religious and devout. Secularism in this context was meant to ensure that there was no discrimination on the basis of religion in respect of political, economic, and social rights and opportunities.'

৪. বাংলা দেশ বলতে সে কালে ভৌগোলিক বাংলা বৈশ্বাত। প্রামাণের প্রমাণবরূপ দেখুন কপিল ভট্টাচার্য, বাংলা দেশের নদ-নদী ও পরিকল্পনা।

দোহাই

৫. আবদুল করিম, 'বাঙালা ও বাঙালী', সফর আলী আকবর সম্পাদিত, বাঙালির আত্মপরিচয় (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯১)।
৬. আহমদ ছফা, বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা, ১ম সংস্করণ (চাকা: দিগন্ত প্রকাশনী, ১৯৭৭)।
৭. আহমদ ছফা, নির্বাচিত প্রবক্ত, মোরশেদ শফিউল হাসান সম্পাদিত (চাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০২)।
৮. আহমদ ছফা, বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও বাঙালী জাতি (চাকা: শ্রী প্রকাশ, ২০০১)।
৯. আহমদ ছফা, আহমদ ছফার কবিতা (চাকা: শ্রী প্রকাশ, ২০০০)।
১০. কপিল ভট্টাচার্য, বাংলা দেশের নদ-নদী ও পরিকল্পনা, ২য় সংস্করণ (কলকাতা: বিদ্যোদয়, ১৯৫৯)।
১১. ডেভিড মেককাচন, 'পূর্ব পাকিস্তানের অন্তরে', দৃষ্টান্ত, এম বাহাউদ্দিন (সম্পা.), প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা (নিউ ইয়র্ক ১৯৯৫); অনুবাদ, বক্তব্য (কলকাতা, ১৯৬৫); বিতীয় প্রকাশ: সুহুদ কুমার ভৌমিক (সম্পা.), যাদুঘর, ২য় খণ্ড, (মেছোদা, মেদিনীপুর: মারপংকুর প্রেস, ১৯৮৭)। অনুবাদ সামান্য পরিমাণিত। প্রথম প্রকাশ: David MacCutchion, 'Impressions of East Pakistan', *Radical Humanist*, 20 December (Calcutta, 1964).
১২. মঈনুল হাসান, মূলধারাঃ '৭১ (চাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৬)।
১৩. সলিমুজ্বাহ খান, 'বাংলাদেশে জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্তর্জাতিক তাত্পর্য', সমকাল, কালের খেয়া, ২৮ জুলাই ২০০৬, ঢাকা।
১৪. সলিমুজ্বাহ খান, 'রাষ্ট্র ও বাসনা', মুগান্ত, ২৭ জুলাই ২০০১, ঢাকা।
১৫. Granville Austin, *Working a Democratic Constitution: A History of the Indian Experience*, 2nd imp. (New Delhi: Oxford University Press, 2004).
১৬. Walter Benjamin, *Illuminations*, Hannah Arendt, ed. and Harry Zohn, trans. (London: HarperCollins, 1992).
১৭. Judith M. Brown, *Gandhi: Prisoner of Hope* (Oxford: Oxford University Press, 1989); as referred in Austin (2004), p. 145.
১৮. Suranjan Das, *Communal Riots in Bengal: 1905-1947* (New Delhi: Oxford University Press, 1993).
১৯. J.N. Dixit, *Liberation and Beyond: Indo-Bangladesh Relations* (Dhaka: University Press, 1999).
২০. J.N. Dixit, *My South Block Years: Memoirs of a Foreign Secretary* (New Delhi: UBS Publishers, 1996).

১৭. Franz Fanon, *The Wretched of the Earth*, Jean-Paul Sartre, pref. and Constance Farrington, trans. (London: Penguin, 1990).
১৮. Frantz Fanon, *The Wretched of the Earth*, Richard Philcox, trans. (New York: Grove Press, 2004).
১৯. Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*, Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith, eds. and trans., 2nd Printing (New York: International Publishers, 1973).
২০. Nurul Islam, *Making of a Nation: Bangladeshi-An Economist's Tale* (Dhaka: The University Press Limited, 2003).
২১. Jawaharlal Nehru, 'Nehru to the AICC meeting at Madurai', October 1961, *Report of the General Secretaries, Januray 1961–December 1961*, (New Delhi: Indian National Congress [INC], 1961), pp. 24-25, as referred in Austin (2004), p.144.
২২. Jawaharlal Nehru, *The Discovery of India*, 4th ed. (London: Meridian, 1956); as referred in Austin (2004), p. 144.
২৩. Jawaharlal Nehru, *The Unity of India*, 3rd imp. (London: Lindsay Diamond, 1948); as referred in Austin (2004), p. 144.
২৪. Rehman Sobhan and Muzaffar Ahmed, *Public Enterprise in an Intermediate Regime* (Dhaka: BIDS, 1980).
২৫. Han Suyin, *The Cuippled Tree*, reprint (St. Albans, Herts (UK): Panther, 1976).



বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা

আহমদ ছফা

লেখক ভাষ্য

উৎসর্গ

ফরহাদ মজহার
হারিনুর রশীদ
বন্ধুবয়

বেশ কিছুদিন, প্রায় মাস সাতকে, আগে আমি বর্তমান রচনাটি লিখতে প্রবৃত্ত হই। আমি লিখে যাচ্ছিলাম এবং মরহম সিকান্দার আবু জাফর প্রতিষ্ঠিত মাসিক সমকাল-এর একটি সংখ্যায় প্রকাশের জন্য কম্পোজ চলছিল। বর্তমান রচনার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের কম্পোজ হয়েছিল, বোধ করি এক কর্ম ছাপাও হয়েছিল। কী কারণে ঠিক বলতে পারব না, তারপর সমকাল কর্তৃপক্ষ জানান যে লেখাটি তাঁরা বিশেষ কারণে পত্রিষ্ঠ করতে রাজি নন। সে যা হোক, অনেকদিন পড়েই ছিল। এই সময়ের মধ্যে আমাকে অন্যান্য কাজে এত বেশি ব্যস্ত থাকতে হয় যে লেখাটি নিয়ে কোন চিন্তাই করতে পারিনি।

বন্ধুবান্ধব যারা লেখাটি গোড়ার দিকে পড়েছিলেন, তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য তাগাদা দিতে থাকলেও ব্যস্ততার কারণে আমি ঘনোনিশে করতে পারিনি। আমার বন্ধু ফরহাদ মজহার বিদেশ থেকে এসে বারবার বোঝাতে থাকেন যে এই সময় এই ধরনের কিছু লেখা প্রকাশিত হওয়া উচিত। প্রধানত তাঁরই আগ্রহে লেখাটি শেষ করব, এ রকম একটা মানসিক প্রস্তুতি এহেণ করি।

ফরহাদ মজহার একা নন, আমার বন্ধু অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক, অধুনালুণ্ঠ দৈনিক গণকপ্ত পত্রিকার প্রাঞ্চিন সম্পাদক জনাব আকতাব উদ্দিন, জনাব রায়হান ফেরদাউস এবং জনাব মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ প্রমুখ সুস্থদ অবিলম্বে লেখাটি ছেপে বের করার জন্য অনবরত চাপ দিতে থাকেন। এই সময় জনাব কলিমদাদ খান আমার কাছে তাঁর দিগন্ত পত্রিকার জন্য একটা লেখা ঢাইতে আসেন।

অপ্রসঙ্গিক হলেও এখানে জানালো উচিত মনে করছি যে উনিশশ চুয়ান্তর সালের মার্চামারি সময় এই কলিমদাদ খান সাহেবই আমাকে দিয়ে কবিতা লিখিয়েছিলেন। সেই থেকে আমার কবিতা লেখা শুরু। তার আগে কবিতা দু একটা কালেভন্টে লিখেছি কিন্তু কবিতার বই বের করব এমন চিন্তা কোন দিন মনে স্থান লাভ করেনি। সুতরাং খান সাহেবের প্রতি আমার কিছুটা দুর্বলতা, কিছুটা বিরক্তি দুই ছিল। তাঁকে অসমাপ্ত লেখাটা দেখিয়ে তাঁর কাগজে ছাপাতে পারবেন কিনা জানতে ঢাইলে তিনি সাহাহে রাজি হন। তিনি কম্পোজ করতে থাকেন, আমি লিখতে থাকি।

অংশ অংশ করে প্রথম কপিটি লিখেই আমাকে ছাপাখানায় পাঠাতে হয়েছে। তাই বাকের বাঁধুনি কোথাও কোথাও শুরু থেকে গিয়েছে। দু একটি স্থানে বাংলা ভাষার অপব্যবহার করে ফেলেছি। যেমন লিখেছি, ‘ধনু থেকে সবচেয়ে অব্যর্থ তৃণটি চুরি করে নিয়েছিলেন।’ আসলে হওয়া উচিত ছিল, ‘তৃণ থেকে সবচেয়ে অব্যর্থ তীরটি চুরি করে নিয়েছিলেন।’ [বর্তমান সংস্করণে এই ভুল শোধরানো হয়েছে। —সম্পাদক] এ রকম আরো দু চার জায়গায় ঘটেছে। অনেকগুলো বানান ভুল থেকে গেল। একই কম্পোজ করা ম্যাটার থেকে একই সঙ্গে পত্রিকা এবং বই ছাপতে হয়েছে। আমাদের হাতে সময় ছিল না বলেই এসব ঘটতে পেরেছে।

এই সকল মারাত্মক ক্ষতি-বিচ্ছিন্নির জন্য সকলের কাছে করজোড়ে ক্ষমা প্রার্গনা করছি।

১ মে ১৯৭১

আহমদ ছফা
১০৭ আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা

১

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বলে কথিত সারা পাকিস্তান প্রসারিত বামপন্থী রাজনৈতিক দলটি তখনে দ্বিষ্ঠিত হয়েনি। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত্বাসনের দাবির প্রতি এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটিই ছিল সর্বাধিক দরাজকর্ত এবং সোচার। পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের নামকরণ 'পূর্ব বাংলা'র স্থলে সরকারিভাবে 'পূর্ব পাকিস্তান' ঘোষণা করা হলেও এই দলের অনুসারী তরুণ ছাত্র এবং বৃক্ষজীবীবৃন্দ আলাপ আলোচনা, সভা সমিতি এমনকি কাগজে পত্রে সরকারি আইন ফাঁকি দিয়ে 'পূর্ব বাংলা' নামটিই ব্যবহার করত। পাকিস্তান সরকারের হোমরাচোমরা মন্ত্রী থেকে শুরু করে সরকারি আমলা এবং দক্ষিণপন্থী সমন্বয় রাজনৈতিক দল এই সংগঠনটিকে 'ভারতবর্ষের চর', 'নেহেরু অ্যাডেড পার্টি' এবং 'ইসলাম ও পাকিস্তানের শক্তি' হিসেবে চিহ্নিত করে প্রকাশ্যে ধিক্কার করাতে কুষ্ঠিত হতেন না।

এই দলটির ঘোষিত লক্ষ্যের মধ্যে স্বাধীন জেটিনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি, সমাজতত্ত্ব অভিযুক্তি অর্থনীতি এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত্বাসন—এই তিনটিই ছিল প্রধান দাবি। অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত্বাসনের দাবি তাঁদের পক্ষে স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারণ করার ক্ষমতা ছিল না। তাই তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশসমূহেরও স্বায়ত্ত্বাসন দাবি করতেন। তাঁরা যুক্তি প্রদর্শন করতেন—পাকিস্তানের প্রতিটি প্রদেশের আলাদা আর্থিক জীবন, ভাষা এবং সংস্কৃতির বাধাহীন বিকাশের মধ্যেই গোটা পাকিস্তানি জনগণের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। বেলুচিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কতিপয় নেতা এবং প্রাথমিক রাজনৈতিক দর্দনের অনুরাগী কতিপয় কর্মী তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের ক্রম-প্রসরণান্তর্ভুক্ত এবং রাজনৈতিক প্রভাব ঠেকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই তাঁরা পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের কতিপয় নেতার সঙ্গে যিলেমিশে একটি রাজনৈতিক সংগঠন খাড়া করেন।

ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ এবং পাকিস্তানের মধ্যবিত্তের উত্থানপর্বে জেটিনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি এবং সমাজতত্ত্বের অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার কথা জনগণের কানে অনেকটা হেঁয়ালির মত শোনাত। ধর্মহীন কমিউনিস্ট দেশগুলোতে যারা বাস করেন, তারাও যে হাত পা চোখ কানবিশিষ্ট মানুষ, তাঁদের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য, কাজ

কারবার, লেনদেন, এমনকি রাজনৈতিক গাঁটছড়া পর্যন্ত রচনা করা যায়, তা ছিল গোটা পাকিস্তানের সংখ্যাধিক জনগণের কাছে স্থলেরও অগোচর। সুতরাং জেটনিরপেশ স্বাধীন পরবাস্তুনীতি এবং সমাজতন্ত্রবেষ্যা অর্থনৈতিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার কথা যাবা বলতেন, তাঁদেরকে ইসলাম এবং পাকিস্তানের দুশ্মন, জাতীয় সংহতির মারাত্মক শক্তি ইত্যাকার নানা অভিধায় চিহ্নিত করা হত। সরকারি প্রচারযন্ত্র এবং নানা দলীয় পত্রপত্রিকা এই জাতীয় শক্তিদের প্রতি অতিশয় ক্ষমাহীন এবং সদা সর্তক ভূমিকা পালন করত। জনসাধারণের যে মুষ্টিমেয় অংশ জেটনিরপেশ পরবাস্তুনীতি এবং সমাজতন্ত্রবেষ্যা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠার সপক্ষে ছিল, সময় জনগণের তুলনায় তাঁদের সংখ্যা ছিল সাগরে গোম্পদের মত। মুষ্টিমেয় দিয়ে কোন রাজনৈতিক দলের চলে না। সব সময় সর্বসাধারণের মন কাড়ার দিকেই সকল রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য। সেই কারণে [তাঁরা] পূর্ব পাকিস্তান জনগণের অধিকাংশের সমর্থন আদায় করার মানসে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত্বাসনের প্রশ়িটি উর্ধ্বে তুলে ধরতেন। অবশ্য একই সঙ্গে অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানি প্রদেশের নামও যোগ করে দিয়ে তাঁরা 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' অপবাদটা ঠেকাতে চেষ্টা করতেন।

আসলেও পশ্চিম পাকিস্তানি প্রদেশগুলো ছিল সামন্তশাসন-লাঞ্ছিত এবং রাজনৈতিক চিন্তা চেতনার দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া। উপজাতীয় এবং প্রায়-উপজাতীয় সমাজের জনগণের মধ্যে তাঁদের আন্দোলন অধিক প্রসারিত হতে পারেনি। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা ও ধ্যান ধারণায় পশ্চিম পাকিস্তানি প্রদেশগুলোর তুলনায় ছিল অনেক অগ্রসর এবং নিজেদের প্রাদেশিক দাবি-দাওয়ার প্রতিও বেশ সজাগ। বাস্তবেও এই অঞ্চলে শুরু থেকেই স্বায়ত্ত্বাসনের বেশ কিছু সমর্থক ছিলেন এবং তাঁদের সংখ্যা দিনে বৃদ্ধি লাভ করছিল।

সেই সময় গোটা পাকিস্তানে যে সমস্ত রাজনৈতিক দলের মোটামুটি সংগঠন ছিল এবং পিছনে জনসমর্থন ছিল সেগুলোর নেতৃত্বান্তরের প্রায় সকলেই ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কৃৎসা-কীর্তন করতেন। 'ভারতের চৰ', 'নাতিক্যবাদের প্রবন্ধ' এবং 'পাকিস্তানের সংহতির শক্তি' ইত্যাদি অপরিশেখে চিহ্নিত করতেন। অন্য অনেকের কথা বাদ দিলেও বাঙালি জনগণের কাছে অধিকরণ সুপরিচিত এবং বাঙালি জনগণের অত্যন্ত প্রিয় নেতৃত্ব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কথা উল্লেখ করার মত। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি যখন স্বায়ত্ত্বাসন প্রশ়িটির উপর অত্যধিক শুরুত্ব আরোপ করছিল, সেই সময় তিনি একাধিকবার বলতে কৃষ্ণিত হলন— পূর্ব পাকিস্তানকে শতকরা আটানঞ্চই ভাগ স্বায়ত্ত্বাসন প্রদান করা হয়ে গেছে। আওয়ামী লীগ নামে যে রাজনৈতিক সংগঠনটি উনিশশ পৌঁছাতি সালের পর থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের ছয়দফা আন্দোলনকে ভিত্তি করে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত্বাসন দাবির আন্দোলন জোরদার করেছে এবং যার ফলস্বরূপ বাংলাদেশের জন্ম, গোড়ার দিকে সেই একই আওয়ামী লীগ দলগতভাবে পাকিস্তানের মসনদে আসীন থাকার সময় কার্যত পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত্বাসন দাবির বিরোধিতাই করেছিল।

২

উনিশশ আটান্ন সাল থেকে শুরু করে পঁয়ষষ্ঠি সাল পর্যন্ত সময় পাকিস্তানের ইতিহাসে যেমন, তেমনি পৃথিবীর ইতিহাসেও কতিপয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে গিয়েছে। অধান সেনাপতি আইয়ুব খান ক্ষমতায় চড়ে বসলেন। ভারত-চিন এবং পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ লাগল। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন দ্বিধাবিভক্ত হল। জাতীয়-আন্তর্জাতিক এই সমস্ত ঘটনার প্রত্যক্ষ পরোক্ষ প্রভাব অনিবার্যভাবে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির উপর পড়েছে। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের দ্বিধাবিভক্তির কারণে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট আন্দোলনও দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

সেই সময় কমিউনিস্ট পার্টি পাকিস্তানে নিষিদ্ধ ছিল। তাই পার্টির কর্মী এবং নেতৃত্বান্ত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মধ্যে থেকেই কাজ করতেন। কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হয়ে ঘাওয়ার কারণে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মধ্যেও অনতিবিলম্বে এই ভাস্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং অতিরেক পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি মক্ষে-সমর্থক এবং পিকিং-সমর্থক দুটি উপদল হিসেবে আপনাপন অস্তিত্ব ঘোষণা করে। মক্ষে-পিকিংয়ের অনুগত দুটি অংশই সংশ্লিষ্ট দু দেশের রাজনৈতিক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে পার্টিগত রংবন্মতি নির্ধারণ করল এবং আলাদা আলাদাভাবে সারা পাকিস্তানে সমাজতন্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার দাবি তুলতে থাকল। পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলার স্বায়ত্ত্বাসনের দাবি, অতীতে যা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির শক্তিবৃদ্ধির অন্যতম উৎসস্ত ছিল, তার থেকে সরে গিয়ে দুই উপদলের নেতৃত্বান্তের সমস্যা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়লেন।

পৃথিবীর বাস্তব রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে আইয়ুব খান গণচিনের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। আসলেও ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর পাকিস্তানে চিনের সপক্ষে একটা অনুকূল জন্মত গড়ে উঠেছিল। যেহেতু আইয়ুব খান চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের রাজনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মত অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়ে তুলছেন, তাই ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পিকিং-সমর্থক অংশ একমাত্র আইয়ুব খানকেই সমাজতন্ত্রের বদু বলে ভাবতে আরম্ভ করে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দাবিতে ভারতকে ঠেকানো এবং আমেরিকা-রাশিয়া এই দুই দিককার মিলিত চাপ কিছুটা হালকা করার জন্য এই উপমহাদেশে পাকিস্তানকে বদু হিসেবে পাওয়ার প্রয়োজনকে খটি করে দেখার উপায় নেই। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির এই জটিল পরিস্থিতিতে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পিকিং-সমর্থক অংশ ক্রমশ আইয়ুব খানের প্রতি অপ্রকাশ্যভাবে ঝুঁকে পড়ে। আইয়ুব খানকেই সারা পাকিস্তানের সমাজতন্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার নিয়ামক বলে গণ্য করতে শুরু করে এবং তলায় তলায় তাঁর উপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

পঁয়ষষ্ঠির সতের দিনব্যাপী ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ থামানোর ব্যাপারে মধ্যস্থে ভূমিকা প্রেরণ করেছিল সোভিয়েত রাশিয়া। সোভিয়েত রাশিয়ারও নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থ ছিল। রাশিয়ার বিশ্বব্যাপী রণকোশলের অংশ হিসেবে ভারত-পাকিস্তানকে একলঙ্ঘ একটি ব্লক হিসেবে দাঁড় করিয়ে চিনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে খাট করাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই রাশিয়া চাইল অথবা পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে মিলেমিশে চিনবিশেষ সোভিয়েত-সমর্থক একটি ব্লক হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াক। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সাহায্য সহযোগিতার দর ক্যাকাষি করার অভিযানে এই দুই বিবদমান সমাজতাত্ত্বিক দেশকে প্রয়োজনমত সুযোগ দিয়ে পাকিস্তানের সিহাসনে দীর্ঘকাল অটুট থাকার পথটিই প্রসরিত করলেন না শুধু, পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলার স্বায়ত্ত্বাসনের দাবি থেকেও উপদল দুটির দাবি অন্যত্র সরিয়ে দিতে পারলেন। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মক্ষে-সমর্থক অংশ তাঁদের মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত্বাসনের দাবি পাশ কাটিয়ে টেকনাফ থেকে খাইবার পাস অবধি বিস্তৃত ভূখণ্ডে সমাজতাত্ত্বিক সমাজ সৃজনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠলেন। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালি জনগণ যে স্বতন্ত্র একটি জাতিসন্তান অধিকারী, শুরুতে যে কথা আভাসে-ইঙ্গিতে বলে আসছিলেন এবং সে জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে ঘনঘন বিচ্ছিন্নতাবাদীতার অভিযোগ আনা হত, সে কথা এক রকম বিস্মিত হয়েছিলেন সেই সময়। অবশ্য এজন্য ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানকে উভয় দলের নেতৃত্বে উপনেতাদের কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা দিতে হয়েছিল। মক্ষে-সমর্থক অংশের নেতৃত্বে উপনেতাবৃন্দ সমাজতন্ত্রের মক্ষে ঘূরে আসতে পেরেছেন। পিকিং-সমর্থকরা পিকিং। দুই দেশের পুস্তক আবাধে আমদানির সুযোগ দিয়ে স্বায়ত্ত্বাসন-কর্মীদের প্রকৃত লক্ষ্য এবং দাবির কথা ভুলিয়ে একেবারে বিপ্লবের স্বপ্নে মজিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। এইভাবে আইয়ুব খান তাঁর সবচেয়ে প্রতিষ্পত্তি শক্তির ভূল থেকে সবচেয়ে অব্যর্থ তীরটি চুরি করে নিয়েছিলেন। অঞ্চল-বহির্ভূত রাজনৈতিক অক্ষ-আনুগত্যের এমন বেদনাদায়ক নজির বোধ করি দুনিয়ার ইতিহাস সন্ধান করলেও অধিক পাওয়া যাবে না।

সমাজতাত্ত্বিক সমাজ প্রতিষ্ঠান দাবিদার দুটি দলই যখন পরম্পরাগ আত্মকলহে রত এবং কাল্পনিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠান মোহে বিভোর, সেই সময় শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফা দাবি নিয়ে জাতির সামনে আবির্ভূত হলেন। উভয় দল তাঁকে ছি ছি করল এবং অভিহিত করল মার্কিন-সম্ভাজ্যবাদের এক নম্বর অনুচর হিসেবে। কিন্তু এই মধ্যে দুটি দলের পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছে। গোটা পাকিস্তানকে ভিত্তি করেই তাঁরা নীতি নির্ধারণ করেছেন, রণকৌশল নির্ণয় করেছেন, কিন্তু সেই পাকিস্তান রাষ্ট্রটার যায় যায় দশা। বাঙ্গালিরঘোষে একটি আলাদা জাতিসন্তা রয়েছে, যার কথা শুরু থেকেই তাঁরা বলে আসছিলেন, অথচ আশানুরূপ সমর্থন লাভ করতে পারেন নি, সেটি যে কখন জেগে উঠেছে তাঁরা টেরও পাননি। দুটি উপদলই যখন আদি অবস্থানে ফিরে আসতে চেষ্টা করল, ততদিনে ঘাটের জল অনেক দূরে সরে গিয়েছে। তাঁদের ভাল কথাও কে শোনে?

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মক্ষে-সমর্থক অংশ যখন শেখ সাহেবকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, আপনি কিংবা আপনার দল এককভাবে এ কঠিন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে

পারবেন না, আমাদেরকেও এহেণ করুন, তখন শেখ মুজিবুর রহমান জবাব দিলেন, আপনাদের মতের সঙ্গে আমার মতের এতই মিল যখন, ভাল কথা, দলের নাম এবং সাইনবোর্ড পরিবর্তন করে একেবারে আমার দলেই চলে আসুন। জনগণের মনোভাব আঁচ করতে পেরে পিকিংপন্থী ন্যাপ প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী পন্টনে প্রকাশ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিলেন। মওলানা সাহেব স্বাধীনতা ঘোষণা করে তাঁর রাজনৈতিক অর্তনৃষ্ঠির পরিচয় দান করলেন, তাতে বিস্মুত্ত্ব সদেহ নেই। কিন্তু তখন মওলানার পিছনে কে যায়? আর গেলেও কী লাভ হত?

৩

আওয়ামী লীগ গুরু থেকেই ছিল তৎকালীন বিকশ্যামান পূর্ব পাকিস্তানি বাঙালি মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক সংগঠন। নিজের স্থিতি এবং স্বর্বর্ধনের জন্য যত দিন পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে থাকা প্রয়োজনীয় ছিল, ততদিন পাকিস্তানের জাতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে দলটি অকৃত্ত্বারে সহাবস্থান করেছে। এমনকি নিজেদের দলীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং শ্রেণীগত স্বার্থ বজায় রাখার জন্য এক সময় পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত্বাসনের বিরোধিতা ও তাঁরা করেছিলেন, সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে। পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে থেকে তাঁদের শ্রেণীগত আশা আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করা সম্ভব নয়—এ কথা যখনই উপলক্ষ্মি করতে সক্ষম হয়েছেন, তখন থেকেই আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবি-দাওয়াসমূহকে নিজেদের দলীয় দাবিতে রূপান্তরিত করেছে। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর আওয়ামী লীগ তাঁদের দাবি-দাওয়ার অনুকূলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে একটা অনুকূল জনমত গঠনের সুযোগও পেয়েছিল।

মূলত স্বায়ত্ত্বাসনের দাবি যারা প্রথমে উচ্চাবণ করেছিল, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আদোলন দ্বিবিভক্তির কারণে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির দুটি অংশের এলাকা বিহুর্ভূত আদর্শবাদী আন্ধ-আনুগত্যের দরুণ এবং জেনারেল আইয়ুব এই বৈপরীত্যসমূহ সার্থকভাবে এককে অন্যের বিরুদ্ধে খেলাতে পেরেছিলেন বলেই সামগ্রিকভাবে বামপন্থীদের মধ্যে এক ধরনের মিথ্যা আশাবাদ, এক ধরনের দিকচিহ্নান্তা ও এক ধরনের সূক্ষ্ম সুবিধাবাদ জন্য নিয়েছিল এবং তাঁরা মূল দাবি থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছিলেন। আওয়ামী লীগ এই সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাধিক জনগণের সামনে প্রমাণ করতে পেরেছিল যে একমাত্র তাঁরাই পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের পাহারাদার। এতে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ঘটনাস্থানকে প্রভাবিত করার মত তেমন কোন বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করার অবস্থা বামপন্থীদের আর নাইল না।

দশ বছরের একটানা সৈরেশাসনে সারা পাকিস্তানের মানুষ আইয়ুবের বিরুদ্ধে বিশুল্ক হয়ে উঠেছিল। সে বিষয়েও আওয়ামী লীগের অনেকগুলো প্রত্যক্ষ বক্তব্য ছিল এবং তা সেই সময় এতদূর হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছিল যে তাঁরা পাল্টা কোন বক্তব্য

কর্মপাত করতে মানসিকভাবে প্রস্তুতই ছিল না। বাঙালি অর্থনৈতিকবিদরা পশ্চিম পাকিস্তান বৃহৎ পুঁজিপতিদের অর্থনৈতিক আগ্রাসন থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে যে দুই অর্থনৈতিক প্রবর্তনের কথা দীর্ঘকাল ধরে বক্তৃতা সেমিনার, আলোচনা সমালোচনায় বিবৃত করে আসছিলেন, ছয়দফা কর্মসূচিতে আওয়ামী লীগ তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে। কথটা স্ফীরণে বললে এভাবে বলা যায় যে দুই অর্থনৈতিক তত্ত্বকে কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ধরে নিয়ে আওয়ামী লীগ জাতীয় কর্মসূচি ছয়দফা প্রণয়ন করে।

যে পদ্ধতিতে অর্খণ্ড ভাবতের বিকশমান মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিস্ব মধ্যবিত্তের সঙ্গে একটি উঠাতে না পেরে একটি অনন্তর্দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় ক্রমবর্ধমান হারে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুসলমান জনগণের একটি স্বতন্ত্র বাসভূমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের দিকে ঝুকে পড়েন, সেই একই পদ্ধতি বাংলাদেশ সৃজনের পেছনেও ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল। মুসলমানদের আলাদা বাসভূমি প্রতিষ্ঠার পেছনে ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং আর্থিক যুক্তিসমূহ সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ঘাত প্রতিযাতে একেবাবে চোখা হয়ে উঠতে পেরেছিল। তাছাড়া ইংরেজ-রাজন্ত্রের শুরুতে স্যার সৈয়দ আহমদ থেকে আবস্থ করে সৈয়দ আমির আলি পর্যন্ত অনেক মুসলিম মুন্মীর চিঠা চেতনার মধ্যে জ্ঞাবস্থায় একটা মুসলিম বাস্ত্রের অক্তুর সুষ্ঠ ছিল। পরবর্তীকালে মুসলিম মধ্যবিত্ত তাঁদের নিজেদের ঘোরজনেই সে যুক্তিসমূহ সুবিন্যস্ত করে পাকিস্তান-দাবি আকারে দাঁড় করিয়েছিলেন।

কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাপারটি ঘটেছে একেবাবে হঠাতে। বাঙালি জনগণ যে আলাদা একটি জাতিসন্তা—এখনকার ডান-বাম কোন রাজনৈতিক দলের ঘোষণাতেই তার মুস্পষ্ট সীকারেক্ষি মেলে না। ঘটনার ঘাত প্রতিষ্ঠাতেই বাঙালি জাতিসন্তা নিজেকে উন্নোচিত করেছে। মনীয়া ও প্রজার বলে সচেতন বুদ্ধি খাটিয়ে ঐতিহাসিক অস্তদৃষ্টির নিরিখে এই জাতিসন্তাৰ অস্তিত্ব কেউ আবিক্ষাৰ করেনি। না কোন দল, না কোন নেতা। বাংলাদেশ বৰ্তমানে যে কঠিন সন্ধানে নিপত্তি, তাও মূলত জাতিসন্তা চিনতে না পাৰাবই সন্ধান।

আওয়ামী লীগের পেছনে মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাঁদের শ্রেণীস্থার্থের ভাগিদে দাঁড়িয়েছিল। তাঁরা মনে করেছিলেন, বাংলাদেশ যদি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ছয়দফা দাবি আদায় করতে সক্ষম হয় তাহলে তাঁরা ব্যবসা বাণিজ্য, কাৰবাল তেজীৱাতি, চাকুৰি বাকুৰিতে পশ্চিম পাকিস্তানি মধ্যবিত্তের সমান সমান সুযোগ সুবিধা লাভ কৰবেন। তাছাড়া বুদ্ধিজীবী শ্রেণীৰ একাংশ এবং জনগণ আওয়ামী লীগকে একেবাবেই অকুণ্ঠ সমর্থন দান কৰেছিল। কাৰণ এছাড়া তাঁদের সামনে অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। কেননা বামপাদ্ধি উপদল দুটিই তাঁদের কৰ্মপন্থৰ মাধ্যমে জনসাধারণের বিশ্বাসভাঙ্গন কোন কিছু তুলে ধৰতে পাৰেনি। তাছাড়া পশ্চিম বাংলার বনক্ষণ নেতা চাকু মজুমদার, কানু সান্ধান প্রযুক্তিৰ রাজনৈতিক প্ৰভাৱে ন্যাপেৰে পিকিং-সমৰ্থক অংশ ও পিকিংপাদ্ধি কমিউনিস্টদের মধ্যে অধিকতর ফুন্দ ফুন্দ উপদলের জন্ম হয়েছিল। এদের নিজেদের মধ্যে না ছিল কোন ঐক্য সংহতি, না ছিল সুদূরপ্ৰসাৰী কোন রাজনৈতিক দৰ্শন।

অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে পাকিস্তান চেমোক্রেটিক পার্টি, নেজামে ইসলাম, জামায়াতে ইসলামী এবং আইনুব খানের এককালীন তৰণ পৰৱৰ্ত্তমন্ত্রী জুলফিকৰ আলি ভুট্টোৰ নেতৃত্বে সদ্য সংগঠিত পাকিস্তান পিপলস পার্টি ইত্যাদি ছিল তৎকালীন পাকিস্তানের প্ৰধিধায়োগ্য রাজনৈতিক সংগঠন। ভুট্টোৰ রাজনৈতিক দলটি ছিল একেবাবে আনকোৱা নতুন। পূৰ্বাঞ্চলে তাৰ কোন সংগঠন ছিল না বললেই চলে। অন্যান্য রাজনৈতিক দলা ছিল হয়তো একেবাবে দক্ষিণপাদ্ধি, নয়তো দক্ষিণযৈৰ্যা। গোড়া থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের আৰ্থিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক দাবিৰ ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে কোন রকম সচেতনতা ছিল না। বৰং পূর্ব পাকিস্তানের যে কোন ন্যায়সঙ্গত দাবিকেই তাৰা প্ৰকাশ্যে পাকিস্তানের সংহতি বিনাশ কৰাৰ ঘৃণ্যতা বলে অভিহিত কৰত।

বামপাদ্ধি বলে কথিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিৰ দুই উপদলই আওয়ামী লীগেৰ সাথে পাল্লা দিয়ে হালে পালি পায়নি। তাৰা নিজেদেৰ কৃত রাজনৈতিক প্ৰমাদেৰ জন্য জনগণ থেকে এক রকম বিছুন্নই হয়ে পড়েছিল। আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তান কৰ্তৃক পূর্ব পাকিস্তানকে একটানা শোষণেৰ বিৰুদ্ধে জোৱ প্ৰচাৰণা চালিয়েছিল। তাছাড়া জেনারেল আইয়ুবেৰ একটানা দশ বছৰেৰ বৈৰশাসনামলে—আমলাতত্ত্বেৰ উৎপাতে, মৌলিক গণতন্ত্ৰীদেৰ দোৱাত্ত্বে—জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তাৰা যে কোন রকমেৰ একটা রাজনৈতিক পৰিবৰ্তনেৰ মধ্যে ভাৱি আশা আকঞ্চন্নৰ রূপায়নেৰ ব্যথ দেখতে আৰস্থ কৰেছিল। জনগণেৰ এই মনোভাবেৰ সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা কৰে আওয়ামী লীগ প্ৰচাৰভিয়ান, সভা সমিতি, শোভাযাত্ৰা ইত্যাদি অব্যাহতভাৱে কৰে যেতে থাকে। অবিভুত ভাৱতে মুসলিম লীগেৰ পাকিস্তান দাবি যেমন এই অঞ্চলেৰ মুসলিম জনগণেৰ চোখে 'সব পেয়েছি'ৰ দেশ হিসেবে স্বপ্নেৰ অঞ্জন মাখিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল, তেমনি আওয়ামী লীগেৰ ছয়দফা দাবিৰ অবিচ্ছিন্ন প্ৰচাৰণা এই একই জনগণেৰ দৃষ্টিতে একটি কল্পনৰ্গ খাড়া কৰে তুলেছিল।

বিকশমান বাঙালি মধ্যবিত্তেৰ সংগঠন আওয়ামী লীগেৰ মূল দাবি ছিল ছয়দফা আন্দোলনেৰ মাধ্যমে বাংলাদেশেৰ স্বায়ত্তশাসন অৰ্জন কৰা। নেতৃত্বদ একেবাবে চূড়ান্ত মুহূৰ্তেও শ্ৰেণীগত দোদুল্যমানতা ত্যাগ কৰতে পাৰেন নি। নেতৃত্বদ কখনো স্পষ্টভাৱে উপলক্ষ কৰতে পাৰেন নি যে বাংলাদেশে স্থাবীন সাৰ্বভৌম একটি বাস্ত্রসন্তাৰ জন্য হতে চলেছে এবং তাৰা সে সংহামে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বাঙালি জাতীয়তাৰাদেৰ উথনেৰ চূড়ান্ত উভাল মুহূৰ্তেও শ্ৰেণীগত সঞ্চৰণতা পৰিহাৰ কৰে তাৰা বাঙালি জাতিসন্তাৰ সঙ্গে পুৱোপুৱি একাত্ম হতে পাৰেন নি। অবশ্য এ কথাৰ মিথ্যা নয় যে ছাত্রদেৰ এগাৰ দফা আন্দোলন, শ্ৰমিকদেৰ আন্দোলন এবং বুদ্ধিজীবীদেৰ আন্দোলনেৰ মধ্য দিয়ে বাংলাৰ জাতিসন্তা দ্রুত বিকশিত হয়ে উঠেছিল এবং সে বিকশিত জাতিসন্তাৰ চাপে তাৰা তাঁদেৰ স্বাভাৱিক ভূমিকাৰ চাইতে একটি অধিক যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। জনমতেৰ প্ৰবল চাপ তাঁদেৰকে ইয়াহিয়া কিংবা ভুট্টো—কাৰো সঙ্গে কোন রকমেৰ আপোস নিষ্পত্তিতে আসতে দেয়নি। একতলা ভিত্তেৰ উপৰ যেমন তিনতলা বাঢ়ি নিৰ্মাণ কৰা যায় না, তেমনি স্বায়ত্তশাসনেৰ দাবিতে রাজনৈতিক কৰ্মকাণ্ডেৰ বিস্তৃতি ঘটিয়ে হঠাতে কৰে তাকে স্থাবীনতাৰ সংহামে রূপায়িত কৰা যায় না।

আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসই করতে পারেন নি যে তাঁরা সত্য পাকিস্তানি ধর্মতাত্ত্বিক রাষ্ট্রকাঠামো থেকে বাংলাদেশকে বের করে আনার জন্ম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে একটি সম্মুখ সমরে অবস্থার্থ হতে যাচ্ছেন। তাঁদের দৃষ্টি যদি পূর্ব থেকে সচ্ছ থাকত তাহলে সে সমস্যে পূর্বপ্রস্তুতি ও তাঁরা গ্রহণ করতেন। বাঁশের লাঠি দিয়ে ঘরে দুর্গ তৈরির 'যুক্ত যুদ্ধ খেলা' ঘোষণার বদলে অন্য কোন কার্যকর পথ অবলম্বন করতেন। বাংলাদেশের প্রায় কোটিখানেক লোক ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। এই কারণে প্রবর্তীকালে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে ভারত পুরোপুরি তার উপর নির্ভরশীল করে ফেলেছিল। এই ভারতের সঙ্গেও যদি পূর্বাহ্নে চুক্তি ইত্তাদি করে কিছু অন্তর্শ্রদ্ধ এনে তাঁরা একটা শক্তিশালী প্রতিরোধ ব্যবস্থা রচনা করত, তাহলেও পরিস্থিতি ভিন্ন আকার ধারণ করত।

অবশ্যে পালে সত্য সত্য বাধ পড়ল। পঁচিশে মার্চের বাত্রে পাকিস্তানি সৈন্য নগরে জনপদে প্রচও হিংস্তা সহকারে ঝাপিয়ে পড়ল। শেষ মুজিবুর রহমানকে বন্দি করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গেল। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ হত্ত্বাঙ্গ হয়ে পলায়ন করলেন। জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায় প্রতিরোধ ব্যৱহূলো ভেঙ্গে পড়তে লাগল। গোটা বাংলাদেশে নির্মতাব, নির্মৃতাব, হৃদয়হীনতার মৰ্ম্মদ স্বীকৃতধারা প্রবাহিত হল। ভারত সীমান্ত খুলে দিল। এই ধরনের পরিস্থিতিতে বাঙালি জনগণের একাংশের ভারতে যাওয়ার হিড়িক পড়ে গেল। দলে দলে লোক একটু আশ্রয়ের আশ্রয় এবং বেশির ভাগ প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে ভারতে পাঢ়ি দিল। নানা স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নেতা উপনেতা জড় হয়ে ভারতে গিয়ে একটা সরকার গঠন করলেন, পরে ভারত সরকার তার অভিভাবক হয়ে দৌড়ান। সুতৰাং 'যুক্ত যুদ্ধ খেলা'র পরিণতিসংক্ষেপ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পায়ে হেঁটে সীমান্ত পেরিয়ে আশ্রয় ভিজা করতে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হল। এতে কাবো পূর্বপৰিকল্পনা ছিল না, যেন্নার নিয়মে ঘটনাটি ঘটে গিয়েছে।

৪

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে ভারতের জড়িত হয়ে পড়ার পেছনেও যথেষ্ট কারণ বর্তমান ছিল। এই কারণগুলো উপরাহদেশের বিত্তিশব্দীর আনন্দলন থেকে উৎসারিত। কোনটার সঙ্গে সাম্প্রতিককালের অর্থনৈতিক এবং প্রতিরক্ষার প্রশ্ন ও সম্পর্কিত ছিল।

আদি থেকেই পাকিস্তানের উপর ভারতের শাসক নেতৃশ্রেণীর একটা বিজাতীয় ঘৃণা প্রবলভাবেই ক্রিয়াশীল ছিল। এই ঘৃণা ভারত ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত জাটিলতা থেকেই উত্তৃত। যদিও এই ঘৃণা ভারতীয়দের পুরোপুরি একতরফা বিষয় ছিল না, তথাপি একথা বলা বোধ করি অসঙ্গত হবে না, এই ঘৃণা ইতিহাসের গর্তগুহা থেকে বেরিয়ে এসে সামাজিক এবং রাজনৈতিক কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে এমনভাবে প্রবাহিত হয়েছে যে কোন

কিছুই তার কৃষ্ণপূর্ণের প্রভাব এড়াতে পারেনি। হিন্দুসুলত ঐতিহাসিক ধ্যান ধারণা এবং মুসলিমানসুলত একই রকমের ধ্যান ধারণার চৌপার্শে অন্যান্য সামাজিক এবং রাজনৈতিক উপাদানগুলিয়ে আবর্তিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত দুটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্যেই পরিণতি লাভ করে।

যে সকল দার্শনিক, চিন্তানায়ক, কবি এবং রাজনৈতিক নেতার চিন্তা এবং কর্মের মধ্য থেকে আধুনিক ভারত সম্ভূতিত হয়ে উঠেছিল তাঁদের প্রায় সকলেরই দৃষ্টি স্থির ছিল প্রাচীন ভারতের প্রতি। প্রাচীন ভারত বলতে তাঁরা অনেক সময় আর্যভারত এবং আর্যভারত বলতে হিন্দুভারত ধরে নিতেন। ভারতীয় ইতিহাসের মধ্যাখনে যে বায় সূপ্তান্ত্রের এবং নানা সময় যে সংশ্লেষ সমন্বয় ঘটেছে, তা স্বীকার করে নেয়ার মত মানসিকতা অনেক উদারনৈতিক চিন্তা চেতনাসম্পন্ন মনীষীরও ছিল না।

মুমুক্ষু সচেতনভাবে যথন অতীতে অবগাহন করে, তখন সে অচেতনে ভবিষ্যৎকেই নির্মাণ করে যায়। এইভাবে মধ্যায়ুগীয় ইউরোপের কবি, শিল্পী এবং দার্শনিকবৃন্দ প্রাচীন প্রিসকে ফিরিয়ে আলতে দিয়ে অজাতে আধুনিক ইউরোপের জন্মান করেছিলেন। পোপের ব্রেচ্চারিতার বিরুদ্ধে ইতিবাদী মার্টিন লুথারের শিয়াবৃন্দ আদি খ্রিস্টধর্মের পুনর্জীবন দান করতে গিয়ে নতুন একটি ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তেমনি ভারতীয় হিন্দু মনীষীরাও সচেতনভাবে প্রাচীন ভারতের পুনর্নির্মাণের স্থপ দেখে আধুনিক ভারতকেই সৃজন করেছিলেন। আধুনিক ভারতের সৃজন প্রক্রিয়াতে প্রাচীনের প্রাচীনত্বকু সর্বাংশে কাটা যায়নি। অতিকায় যুক্তিবাদী মনীষীদের চিন্তার মধ্যেও বারেবারে প্রাচীন ভারতের হিন্দু যিথ বিলক দিয়ে জেগে উঠেছে এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তা অনেকটা অর্থবহু রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে।

কলে তার অতিথাতে মুসলিম মিথসমূহও নতুন করে প্রাণ পেয়েছে এবং মুসলিম জাতীয়তার রূপায়নের সংগ্রামে সমান ব্যবহারিক গুরুত্ব লাভ করেছে। বাল গঙ্গাধর তিলক, অরবিস্ত, দয়ানন্দ সরস্বতী, লালা লজপত রায়, বিবেকানন্দ, এমলকি শহীং বরীসুল্লাখও ভারতের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেছেন। [কিন্তু] প্রাচীনত্বের প্রতি মোহসুল শুরুবোধ কদাচিংই বর্জন করতে পেরেছেন। হয়তো শৈল্পিক এবং সাংস্কৃতিক অনুশীলন হিসেবে এতে দোষের কিছুই নেই। কিন্তু সে অনুশীলন একটি জাতির আত্মনিয়জ্ঞণের সংগ্রামে উঠে এসে যদি গোটা জাতীয় মাসকেই অতীতচারী করে তোলে, তার ফলাফল বড় মারাত্মক হতে বাধ্য। আধুনিক ভারতে তা-ই যাচ্ছে। ত্রিপুর ভারতকে কেটে দুটি টুকরো করতে হয়েছে। প্রকাশ্য ঘোষণা যাই হোক না কেন, দুই দেশে দুটি প্রাচীন ঐতিহাসিক মিথই নতুন জীবন লাভ করেছে।

যা বলছিলাম, শুন থেকেই ভারতীয় শাসকবর্গ পাকিস্তানের প্রতি কথনে সম্প্রীতির দৃষ্টিতে তাকাতে পারেন নি। কেননা তাঁদের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধেই পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল। অনেক ভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন ভারতবিভাগকে মাতৃ-অঙ্গবাহনে মনে করত এবং তারা এও বিশ্বাস করত যে পাকিস্তান দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারবে না। তার কারণও ছিল। ভোগোলিক অসংলগ্নতার জন্য প্রতীচ্যের অনেক নিরপেক্ষ দর্শকও মনে করত — পাকিস্তান ঠিক রাষ্ট্র নয়, নতুন ধরনের একটি

বাস্ট্রের এক্সপ্রেসিমেন্ট মাত্র। আপাত দ্বিতীয়ে সাফল্যের চাইতে ব্যর্থতার সম্ভাবনাই তার অধিক। জওয়াহরলাল নেহেরু মনেগোণে আসমুদ্দিমাচল প্রসারিত বৃহত্তর ভারতের পথ দেখতেন এবং এই স্পন্দকে তিনি ভারতের শাসক নেতৃত্বাধীন মনে ভাল করে চারিয়ে দিতে পেরেছিলেন। জার্মানদের ফাদারল্যান্ড এবং ইহুদীদের হোলিল্যান্ডের মত বৃহত্তর ভারতের স্পন্দণ ভারতীয় নেতৃত্বাধীন মর্মের গভীরে গেথে গিয়েছিল। তাঁরা মনে করতেন, বৃহত্তর ভারতের স্পন্দণ মিথ্যা হওয়ার নয়, প্রশ়্নটা শুধু সময়ে।

বাজনেতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে পাকিস্তানের অবস্থিতিই ভারতের মাথাখাথান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পাকিস্তান ছিল বাস্ট্রেরিজানের বিচারে পুরোপুরি একটা বিসঙ্গত রাষ্ট্র—একটি অংশের পর্যায়ক্রমিক শোষণের উপর অপর অংশের স্বত্ত্ব। দু অংশের সংযোগের মধ্যবর্তী নিবিড়তার অভাবের কথা পাকিস্তানের শাসক নেতৃত্বাধীন ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাই পাকিস্তান বাস্ট্রের সংহতি অঙ্গুল রাখার জন্য তাঁরা একটা আতঙ্কের পরিস্থিতি সব সময় সৃষ্টি করে রাখতেন। জনগণকে সব সময় বোৰাতে চেষ্টা করতেন যে ভারত যে কোন সময় ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বাধীনতা এবং সংহতি বিনাশ করতে পারে। এটা ছিল পাকিস্তানি জাতীয়তাবোধকে বাইরের দিক দিয়ে সব সময়ের জন্য চান্দা করে রাখার একটি কৃত্রিম ব্যবস্থা। শাসকদের কাছে এটা ধৰতাই বুলি হলেও মনস্তত্ত্বের সাধারণ নিয়ম অনুসারে জনগণের কাছে, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছে, তার প্রভাব বেশি দিন সক্রিয় ছিল না। পাকিস্তান সব সময় যুদ্ধাতক্তে ভুগত এবং পাকিস্তানের এই মনোভাবকে অর্থ ও অস্ত্র সরবরাহ করে জিহুয়ে রাখার জন্য আন্তর্জাতিক বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে পাকিস্তানের বন্ধুর অভাব ছিল না।

যতকাল গণচৰিতের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব আটুট ছিল, ততকাল ভারত পাকিস্তানের তর্জন গর্জনকে আমল দেয়ার বিশেষ একটা প্রয়োজন বোধ করেন। ভারত-চিন যুদ্ধের পূর্ব থেকেই চিনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক যখন উত্তোলন খারাপ হতে আবশ্য করে, পাকিস্তান সত্যি সত্যি ভারতের কাছে একটা মারাত্মক হৃষকি হয়ে দাঁড়াল। চিন এবং পাকিস্তান দুই সীমান্তের নিরাপত্তা অঙ্গুল রাখতে গিয়ে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যায় চারণুণ বেড়ে গেল। ভারত বৃহৎ দেশ এবং দরিদ্র দেশ। এই প্রতিরক্ষা ব্যায় কি বছর মেটাতে গিয়ে তার উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বক হয়ে গেল, দেশে অভাব এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, প্রতিটি রাজ্যে শাসক কংগ্রেসের প্রতিস্পর্ধী রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকল। উগ্র এবং চরমপঞ্চাদের সৌরাত্যে শাসনযন্ত্র বিকল হয়ে পড়ার অবস্থা।

এই ধরনের অনিশ্চয়তা থেকে উক্তার পাবার জন্য কার্যকর একটা কিছু করা শাসক কংগ্রেসের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছিল। ভারতের অভ্যন্তরীণ নানা দুদ্দ এমনভাবে পরম্পর মাথা ঠোকারুকি করছিল যে জনগণের চিন্তা চেতনাকে সংযোগ প্রত্যক্ষ দৰ্শনের ফেত্রসমূহ থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছিল। বিশেষত সেই সময়, যখন ভারতের রাজ্যসমূহে কংগ্রেসের প্রভাব ভয়ঙ্করভাবে হাস পেতে আবশ্য করেছে, একটা যুক্ত লাগালে সেই দুদ্দসমূহ সাময়িকভাবে নিরসন করা যায়। এই যুদ্ধ চিন কিংবা পাকিস্তানের সঙ্গেই লাগাতে হয়। এর আগেও দু দুবার এই দুটি দেশের সঙ্গে ভারত যুদ্ধ করেছে। কিন্তু তার ফলাফল

ভারতের বাস্ট্রীয় জীবনে নানা বিপর্যয় ডেকে নিয়ে এসেছে। তাছাড়া একটি সরাসরি যুদ্ধ ভারতের মত বৃহৎ একটি দেশের জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়াও চাপিয়ানি কথা নয়।

আন্তর্জাতিক দিকটিও ভেবে দেখাব মত। নিজের দেশের জনমত এবং বিশ্ব জনমতের প্রশ়্নাটি ভাল করে দেখাব উপর নেই। পাকিস্তানের শাসকবর্গ যেমন অভ্যন্তরীণ দুন্দু প্রবল হয়ে উঠলে যে কোন অছিল করে ভারতের সঙ্গে একটা গোলমাল পাকিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতেন, ভারতও একই পদ্ধতি অনুসরণ করে বাংলাদেশের দাবি দাওয়ার প্রশ্নে পাকিস্তানের সঙ্গে বিবাদ ঘনিয়ে তুলবে তাতে এমন বিচিত্র কী?

তোগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে বিচার করলে পাকিস্তান একটি কৃত্রিম এবং বিসঙ্গত রাষ্ট্র। রাষ্ট্র হিসেবে এটাই পাকিস্তানের দুর্বলতার আসল উৎস। পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে তোগোলিক কোন সংযোগ নেই। পূর্ব ছাড়া উভয় অংশের মধ্যে স্থায়ী কোন বন্ধনের সূত্র অনুপস্থিত। পূর্বাঞ্চলের পর্যায়ক্রমিক শোষণের উপর পশ্চিমাঞ্চলের সম্মতি। পাকিস্তানের এই দুর্বল হ্রানটিতে আগাত করে অভ্যন্তরীণ প্রবল দুন্দুটি শাপিত করার কাজে ভারতীয় শাসকবর্গ সব সময় তৎপর ছিলেন। সরাসরি যুদ্ধে না গিয়ে দুই অংশের দুন্দুটা আন্তর্জাতিকভাবে ঘোষণা না করেও যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব এবং তাতে জয়লাভের সম্ভাবনা অত্যধিক। ভারতীয় শাসকবর্গ প্রচারমাধ্যমগুলো এই লক্ষ্যে ব্যবহার করতেন।

উনিশশ বায়ান সালের ভাষা আন্দোলন এবং উনিশশ চুয়ান্ন সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের ভারতীয় প্রচারমাধ্যম এবং পত্রপত্রিকা ফলাও প্রচার করেছিল। এই প্রচারণার মধ্যে কোন এক দেশের অবহেলিত অংশগুলির জনগণ যে সংযোগ করে আপন ভাষায় কথা বলার অধিকার আর্জন এবং আরো নানা দাবি দাওয়া আদায় করে নিচ্ছে, তার চাইতে অধিক কিন্তু ছিল। পাকিস্তানের ভাসনের বীজটি অঙ্গুরিত হতে দেখে তারা উত্তৃসিত হয়েছিল। সেই মনোভদ্রিকুণ্ড প্রচারণার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল।

উলঙ্গ ভুক্তির এবং হন্দিতমির চাইতে ধীরে ধীরে সময় বুঝে কাজ করাই ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য। উনিশশ পঁয়ষষ্ঠি সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনী তাদের আক্রমণ মূলত পশ্চিম পৰাগনেই সীমিত রেখেছিল। আক্রমণকারী হিসেবে উপস্থিত হলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনোভাব বিগড়ে যাবে—এ আশঙ্কা করেই ভারতীয় সেনাবাহিনী বলতে গেলে একেবাবে অরাফিত পূর্ব পাকিস্তানে স্থলপথ, জলপথ কিংবা বিমানপথে কোন আক্রমণ করেন। কোন রকমের সামরিক হামলা না করে পূর্ব পাকিস্তানের জনমতকে জয় করার ইচ্ছাই ছিল তার মূলে—এ কথা স্বয়ং ভারতীয় জেনারেল কাউলও তাঁর আত্মকথায় স্বীকার করেছেন।

উনিশশ পঁয়ষষ্ঠি সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর আওয়ামী সীগ শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পুনরায় সংগঠিত হয়। ছয়দফা আন্দোলন যে জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, তা নিচ্য ভারতীয় শাসকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকবে। ছয়দফার অস্তর্ভুক্ত দফাসমূহের একটি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের লোক দিয়ে একটা প্যারামিলিটারি গঠন করতে হবে। অন্য একটি দফায় ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সুযোগ

মুনিধামত যে কোন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যচক্রি সম্পাদন করার অধিকার দিতে হবে। এই ছয়দফার মধ্যে অভীষ্ঠ সিদ্ধির পথ স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল ভারত। পাকিস্তানের দুই অংশ যদি শুধুভাবে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, তাহলে ভারতের প্রতিস্পন্দিত শক্তি হিসেবে পাকিস্তানের রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেকাংশে কমে আসবে। পাকিস্তান যখন তখন আর যুদ্ধের হুক্মের দিতে পারবে না। আন্তর্জাতিক শক্তিবর্গ সহত পাকিস্তানকে যেভাবে অস্ত্রসাহায্য করে, অর্থযোগান দিয়ে ভারতের সমর্পণায়ের একটি শক্তি হিসেবে টিকিয়ে রাখত, শিথিল পাকিস্তান বৃহৎ শক্তিবর্গের দৃষ্টিতে সে বেকম গুরুত্ব বহন করবে না। পাকিস্তান দুর্বল হয়ে পড়লে তার যুদ্ধক্ষণেই মনোভাব আপনা থেকেই প্রশ্নামিত হয়ে আসবে। তখন বৃহৎ শক্তিবর্গ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক ভারসাম্য বক্ষা করার জন্য ভারতদের সীমাত প্রণয়ন করতে বাধা হবে।

ছয়দফার একটা দফায় পূর্ব পাকিস্তানের আলাদা বাণিজ্যচক্রি সম্পাদনের অধিকারের কথা উচ্চারিত হয়েছিল। তাতেও ভারত লিঙ্গের স্বার্থটি খুব বড় করে দেখতে পেয়েছিল। পর্শিমবঙ্গের হৃগলির পাটকলঙ্কলো কাঁচামালের অভাবে থায় বন্ধ হয়ে পড়েছিল। পূর্ব পাকিস্তান বিদেশে অচেল পাটি বঙ্গলি করে এবং তাকে বিদেশ থেকে পচুর কয়লা আমদানি করতে হয়। ভারতের কয়লার বিনিময়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাটি আমদানি করতে পারলে চট শিল্পের মত ভারতের একটি বুনিয়াদি শিল্পের সকলের সহজ সমাধান হয়ে যায়। ইত্যাকার বিষয় বিবেচনা করে শুধু থেকেই ভারতের শাসক কংগ্রেস আওয়ামী লীগ এবং শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি একটি অনুকূল মনোভাব তৈরি করে রেখেছিল। ছয়দফা আন্দোলন যখন ধাপে ধাপে বেগ ও আবেগ সম্ভয় করে সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল—তার প্রতিটি ধাপে, প্রতিটি উৎক্রান্তিতে আওয়ামী লীগ যে কোশল এবং প্রচার পদ্ধতি এইগ করছিল, ভারতের শাসক কংগ্রেস প্রতিক্রিয়া এবং প্রচারাম্বন তার ঢালাও প্রচার করেছিল। ফলে ভারতীয় জনগণের মধ্যেও শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর আন্দোলনের প্রতি একটি স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগ জ্যুলাভ করে।

শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর দল আওয়ামী লীগ কখনো সুভাষচন্দ্র বসুর মত তেজোদীপ্তি অন্যান্যী ভঙ্গিতে বক্তব্য হাজির করেছেন, কখনো চিন্তরজ্ঞ দাসের মত উদার বাণিজ্যানার পরিচয় দিয়েছেন। আবার কখনো বা প্রতিটি জওয়াহরলাল নেহেরুর মত সমাজতন্ত্রীয়ের উদারাত্মিক ধ্যান ধারণার প্রবর্ত্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন শেখ মুজিবুর রহমান। ছয়দফা আন্দোলনের শেষ গৰ্বে অহিংস অসহযোগ কর্মসূচি ঘোষণার পরবর্তী পর্যায়ে শেখ মুজিবুর রহমান ভারতীয় জনগণের দৃষ্টিতে মহাত্মা গান্ধির মানসস্মৃতি হিসেবে দেখা দিলেন।

অহিংসা ছিল মহাত্মা গান্ধির জীবনাদর্শ। সর্বকাজে সর্বচিন্তায় নিজেকে হিংসামুক্ত বাধাই হল গান্ধি দর্শনের মূলকথা। চৌরিচোরার সংঘর্ষে মাত্র কজন পুলিশ অগ্নিধন হয়েছে জেনে মহাত্মা গান্ধি সমগ্র ভারতের জাতীয় আন্দোলন থামিয়ে দিয়েছিলেন। এজন তাঁকে কম জববদিহি করতে হয়নি। তথাপি তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে একচুল নড়েন নি। অন্যদিকে শেখ মুজিবুর রহমানকে মহাত্মা গান্ধির মত অহিংসামন্ত্রে বিশ্বাসী বলার কোন উপায় নেই। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা থেকে পরিণতি পর্যন্ত সন্ধান

করলে এমন প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যাবে না যে তিনি অহিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাসস্থাপন করেছিলেন। সুতরাং তিনি অহিংস আন্দোলনকে শুধু একটা রাজনৈতিক ট্যাকটিক্স হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন।

আর বাংলাদেশ আন্দোলন সত্যিকার অহিংসও ছিল না। বিস্তর হিংসাত্মক কার্যকলাপ সংগঠিত হয়েছে। জুলানো পোড়ানো, লুঠত্বাজ এবং খুনজখনের অনুষ্ঠানও হয়েছে বিস্তর। আওয়ামী লীগ হাইকমান্ড এসবের বিরুদ্ধে মৌখিক বক্তব্য বাখলেও থামানোর জন্য কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। ফলে বিহারি এলাকাগুলোতে নানা রকম নৃশংস কার্যকলাপের অনুষ্ঠান ঘটে। এই নৃশংসতা দমনের অচিলায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী পাঁচিশে মার্চ রাতের অন্ধকারে ঢাকার দুমত নগরবাসীর উপর ঝাপিয়ে পড়ে।

ভারতীয় জনগণের পক্ষে বাংলাদেশি অহিংসা চোখে দেখার উপায় ছিল না। তাঁরা কাগজে দেখেছেন, বেতারে শুনেছেন এবং বিশ্বাস করেছেন। শেখ মুজিবের মধ্যে ভারতীয় জনগণ একই সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসু, চিন্তরঞ্জন দাস, জওয়াহরলাল নেহের এবং মহাত্মা গান্ধির সান্দেশ লাভ করেছিল। তাঁদের প্রতি ভারতীয় জনগণের যে একটি সুশু শুন্দাবোধ মনের ভিতরে লুকায়িত ছিল, শাসক কংগ্রেসের প্রচারণায় শেখ মুজিবকে আশ্রয় করেই তা পর্যবৃত্ত হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের সামনে একেবারে নববাদেবতার বেশে দেখা দিলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

তিনি এবং আওয়ামী লীগ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ত্রিটিশবিরোধী ইমেজগুলো অভিতের গর্ভ থেকে ভুলে এনে ঝালিয়ে রঙ ঢিয়ে দীর্ঘ পরিবর্তন করে নতুনভাবে ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন। এই কারণেও ভারতীয় জনগণ তাঁকে চোখে দেখার আগেই একেবারে অতিমানব বলে বিশ্বাস করে ফেলে। তাঁর দলের পক্ষ থেকে তাঁকে ‘বঙ্গবন্ধু’ খেতাবে ভূষিত করা হয়েছিল। ‘বঙ্গবন্ধু’ শব্দের সঙ্গে ‘দেশবন্ধু’-এর একটা শব্দগত সামঞ্জস্য রয়েছে। ভারতীয় কংগ্রেসের ত্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের একটা পর্বে গুণমুক্ত দেশবাসী আইনজীবী রাজনীতিবিদ চিন্তরঞ্জন দাসকে ‘দেশবন্ধু’ হেতাব প্রদান করেছিল। দলের পোশাক হিসেবে ‘মুজিবকোট’ নামে যে জ্যাকেটটি শেখ মুজিব চালু করেছিলেন, সেটা ছিল প্রতিটি জওয়াহরলাল নেহের উত্তীব্রত ‘জহরকোট’-এর বাংলাদেশি সংস্করণ। জওয়াহরলাল শৈর্ষবান পাঠ্ঠান উপজাতির গায়ের ফতুয়াকে পছন্দমত অদল বদল করে নিজের পোশাক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। দলীয় কর্মী এবং শেছাসেবকদের জন্য যে ধৰনের টুপি উত্তীব্রন করেছিলেন, তা ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের টুপির অনুকরণ মাত্র।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম পুরোপুরি দিজাতিত্বের ভ্রম সংশোধন ছিল না, এর মধ্যে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা এবং প্রাপ্তর সমাজদর্শন সমাজতন্ত্রের প্রচুর উপাদান ছিল। কংগ্রেসের সুচৰ্চুর প্রচারণার দরুণ বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে ভারতীয় জনগণ এভাবে বুঝেছেন যে জিন্নাহর দিজাতিত্ব মিথ্যা হতে যাচ্ছে, পাকিস্তানের ভাস্তুন আসন্ন হয়ে উঠেছে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশি জনগণ যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে তা মূলত কংগ্রেসের ত্রিটিশবিরোধী সংগ্রামেরই অসমান্বিত পর্যায়।

তাই সেখানে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নায়কদের ইমেজসমূহ বাংলাদেশে ইস্থ পরিবর্তিত আকারে প্রাণ পেয়ে জেগে উঠেছে। এই সমস্ত কারণে ভারতীয় জনগণের একটি মুখ্য অংশ পঁচিশে মার্চের পূর্ব থেকেই আওয়ামী লীগের প্রতি সহানুভূতিসম্পর্ক হয়ে উঠেছিল।

আওয়ামী লীগ, শেখ মুজিবুর রহমান এবং বাংলাদেশ—এই তিনটি বিষয় ছিল কংগ্রেস সরকারের হাতে ভারতীয় জনগণের চোখে ধূমজাল সৃষ্টি করার মোক্ষম হাতিয়ার। কারণ তখন ভারতের রাজ্যে রাজ্যে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছিল। কেরাণাতে কমিউনিস্টদের প্রভাব বৃদ্ধি, আসামে ভাষাদান্ড, বিহারে খরা, উত্তিয়ায় দুর্ভিক্ষ, তামিল ভাষাভাষী অঞ্চলে হিন্দুবিরোধী আন্দোলন এবং পশ্চিম বাংলায় চৰক মজুমদার, অসীম চ্যাটার্জী ও কানু সান্যালের দলের উৎপাত জনজীবনকে প্রায় অসহনীয় পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল এবং রাজ্যগুলের মধ্যে শাসক কংগ্রেসের প্রভাব দ্রুত হারে হাস পাচ্ছিল। দূর্মীতি, ব্যজনতোষণ, গণপীড়নের এমন দ্রুতান্ত শাসক কংগ্রেস স্থাপন করেছিল যে জনসাধারণের হত আস্থা বিহুরে আনার কেন পথ দৃশ্যত খোলা ছিল না। ভারতীয়, বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার মধ্যবিস্ত শ্রেণী, যারা আইনসংজ্ঞল মেনে শাস্তিপূর্ণ জীবনযাপনে অভ্যন্ত, রাজনৈতিক নৈরাজ্যের পীড়নে একেবারে আশাহত হয়ে পড়েছিলেন। সরকারি প্রশাসনসম্মত তাঁদের জীবনধারণের নিরাপত্তা প্রদান করতে একেবারে ব্যর্থ হয়ে পড়েছিল।

এই সময় আওয়ামী লীগের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তাঁদের দৃষ্টিতে ভৱসার সাম্পাদন হয়ে দেখা দেয়। পঁচিশে মার্চের পর দলে দলে বাংলাদেশের লোক যখন ভারতে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে, তখন এই মধ্যবিস্ত লোকবাই সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সভা সমিতি করে বলতে আরম্ভ করলেন, শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশের তরঙ্গরা দেশমাতৃকার মুক্তিসাধনের জন্য কঠোর ব্রত গ্রহণ করে সমরসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আর পশ্চিম বাংলার যুবকরা রাজনীতির নামে দিক্বন্দ্ব হয়ে খুন, জখম, ডাকাতি, বোমাবাজি ইত্যাদিতে লিঙ্গ হয়ে অনর্থক ভাস্তবক্তে হস্ত কলান্তি করছে। সামাজিক হিংসা বরখে দাঁড়াবার পক্ষে তারা সমিলিত আওয়াজ তুলল। অতি শিগগিরই এই মধ্যবিস্ত মানসিকতার সপক্ষে একটা জনমত গড়ে উঠে এবং শাসক কংগ্রেস এই অনুকূল জনমতকে কাজে খাটাতে ভুল করে নি।

পশ্চিম বাংলার জনগণের একটি অংশ সম্পূর্ণ ভিন্ন এক কারণে শেখ মুজিবুর রহমানের আন্দোলনের প্রতি অতিশয় সশন্দ এবং আশাব্যঙ্গক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। তাঁরা শেখ মুজিবের আন্দোলনের মধ্যে বাঙালির একটি জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জুলান্ত সম্ভাবনাকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের প্রতিটি স্তরে বাংলা দিয়েছে সব চাইতে বেশি, পেয়েছে সব চাইতে কম। ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত করে ব্রিটিশ সরকার কলকাতার যে গুরুতৃ খর্ব করেছে সে ক্ষতি বাঙালি কেন দিন পুরিয়ে নিতে পারেন। উনিশশ সাতক্ষণি সালে ভারতবর্ভাগের সময়ও বাংলায় হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কতক গণনায়ক গোটা বাংলা

ভাষাভাষী অঞ্চল নিয়ে আলাদা রাষ্ট্রের রূপরেখা প্রণয়ন করেছিলেন সে কথা তখনো তাঁদের স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি।

আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সব দিয়ে স্বাধীনতার পর বাঙালির ভাগ্যে বরঞ্জনা নেমে এসেছে। সেজন্য তাঁরা দুঃখবোধ করতেন এবং তাঁর সম্ভাব্য প্রতিকারের কথা ও চিন্তা করতেন। অস্তত বাংলার অপরাখ্যে একজন বাঙালির নেতৃত্বে একটি জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চলছে—তার প্রতি সমর্থন দান এবং সাধ্যমত সহায়তা দান করা প্রতিটি বাঙালির নৈতিক কর্তব্য বলে তাঁরা মনে করতেন।

পঁচিশে মার্চের পর স্বোত্তরে মত বাংলাদেশের মানুষ যখন ভারতে প্রবেশ করতে আরম্ভ করল, উত্তিপূর্বিক কারণসমূহের দরুণ ভারতীয় জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁদের সাহায্য করতে এগিয়ে এল। সর্বশ্ৰেণীর মানুষ বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সমর্থনে রাজপথে নেমে এল। পশ্চিম বাংলা এবং প্রিপুরার জনসাধারণ তাতে অগ্রণী ভূমিকা নিল। ক্ষমতাসীম কংগ্রেস সরকার জনমতের এই শক্তিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে আরম্ভ করল যে বিরোধী দলসমূহের সরকারের সাথে কর্তৃ মিলিয়ে বাংলাদেশের কথা বলতে হল। এক বাংলাদেশ সমস্যা সমস্যা ভারতীয় সমস্যা চাপা দিল। জনগণ যেমন, তেমনি বিরোধী দলগুলোও বাংলাদেশ সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করতে আরম্ভ করল। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ নিয়ে কে কার চাইতে বেশি যেতে পারে—এ নিয়ে বীতিমত প্রতিযোগিতা চলতে লাগল। সামান্য জেলা বোর্ডের নির্বাচনে জেতার জন্যও বাংলাদেশ একটা উপলক্ষ হয়ে দাঁড়াল। জনমতে এমন সুবোৰ্শলে আগুন ধরানো হল যে বাংলাদেশের বিকল্পে কেউ টু শব্দটি উচ্চারণ করলে ভারতীয় রাজনীতিতে তার পরাজয় অবধারিত হয়ে দেখা দিল।

বাংলাদেশে একটি নতুন জাতি জন্মাত করার সংগ্রাম, কিন্তু তার ধার্মীয় কাজ করছিল ভারতের শাসক কংগ্রেস। শেকসপিয়র সরণিতে প্রায়-অন্তর্বীণ আওয়ামী লীগের তাজউদ্দীন মন্ত্রিসভা ছিল একটা উপলক্ষ মাত্র।

৫

উনিশশ একান্তর সালের জানুয়ারি থেকে শুরু করে মার্চ পর্যন্ত সময়ে বাঙালির জাতীয় সম্ভা পাকিস্তানের ধর্মতাত্ত্বিক রাষ্ট্রিকাঠামোর ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসার জন্য যে প্রচণ্ড আবেগে উন্নয়িত হচ্ছিল, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী কী করে তার প্রতিবিধান করতে হবে গোড়া থেকেই তা ঠিক করে রেখেছিলেন।

পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক নেতৃশ্রেণীর একটি বৃদ্ধমূল ধারণা এই ছিল যে পূর্ব পাকিস্তানের দাবি দাওয়া সম্পর্কিত যে কোন আন্দোলনই হিন্দুদের মেপথা কারসাজি। যখনই পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবি দাওয়ার প্রশ্নে কোন আন্দোলন হয়েছে, সব ক্ষেত্রেই বাষ্পবিরোধী শক্তির তৎপরতা, ভারতীয় চরদের জন্য ঘৃণ্য অভিধায় এ সমস্ত আন্দোলনকে চিহ্নিত করতে শাসকগোষ্ঠী কখনো কসুর করেন নি।

রাজনৈতিক প্রচার প্রোপাগান্ডার মধ্যে এ মনোভাব সীমিত ছিল না। অনেকে মনেপ্রাণে তা সত্য বলেও বিশ্বাস করতেন। দেশের দুটি বিচ্ছিন্ন অংশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা ইত্যাদির বৈপরীত্যই তার কারণ। পূর্ব পাকিস্তানি জনগণের মনের গতিবিধি যথনই তাদের কাছে অবোধগম্য প্রতীয়মান হয়েছে, এই অবোধগম্যতাকে হিন্দুস্তানি কাজ করাবার বলে অভিহিত করতে তারা কখনো কৃষ্টিত হননি।

অতীতের বাংলা ভাষা আন্দোলন, হরফ বর্জন, রবীন্দ্রসাহিত্য পঠন-পাঠন ইত্যাদি প্রশ়্নার প্রত্যেকটিতে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, তাতে একটি বিষয়ই সম্মান প্রমাণিত হয়েছে যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এবং জনগণের ভাষা ও সংস্কৃতিকে হিন্দুস্তানি প্রভাবমুক্ত করে একটি খাঁটি পাকিস্তানি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি নির্মাণ করার জন্যই এই সব বিধিনিষেধ আবোপ করা হয়েছে। তাদের যুক্তি ছিল অত্যন্ত সহজ। উর্দু পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্র ও প্রদেশেরই মাতৃভাষা নয়, তবু তাঁরা অস্মানবদনে উর্দুকে গ্রহণ করতে পেরেছেন। তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের লোকদের উর্দু গ্রহণ করতে বাধাটি কোথায়? উর্দু বর্জন করতে গিয়ে যাঁরা খাঁকে খাঁকে মরতে পারেন, তাদের মুসলমানিত্বের খাঁটি নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর মনে একটা সন্দেহ প্রবলভাবে বিরাজমান ছিল। আইয়ুব খান তার আত্মকথায় এই সন্দেহ চেপে রাখতে পারেন নি। তাই পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক যে কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে যথনই কোন আন্দোলন দানা বেঁধে উঠত, পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী নিজেদের বন্ধনমূল ধারণা অনুসরেই স্থির করে নিতেন। এর পিছনে নিচ্ছয় হিন্দুদের হাত রয়েছে।

শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের সে সন্দেহ আরো ঘনীভূত হল। তাঁরা প্রচার করতে আরম্ভ করলেন যে শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগ হিন্দুদের প্ররোচনায় পাকিস্তান ভেঙ্গে ফেলার ব্যক্তিগত পাকাছে। পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ সেই কথা সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করেছিল। জনগণের এক বিশিষ্টাংশের মনে এই ধারণা ফৌখে গিয়েছিল যে একটা সামরিক হস্তক্ষেপ ব্যতীত পূর্ব পাকিস্তানকে কিছুতেই হিন্দুদের কারসাজি থেকে উদ্ধার করা যাবে না। ইয়াহিয়া-ভুট্টোর সঙ্গে পাকিস্তানি শাসক নেতৃত্বশীর্ষে অধিকাংশ এই একটি প্রশ্নে একমত ছিলেন।

ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে প্রকাশ্যে আলোচনার ছল করে গোপনে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অস্ত্র এবং সৈন্য আমদানি করে সেনানিবাসগুলো ভর্তি করে ফেললেন। অবশ্যেই পঞ্চিশে মার্টের বাতে আঘাত হানার চূড়ান্ত সংকল্প নিয়ে সৈন্যদের নির্দেশ দান করলেন ইয়াহিয়া। প্রথমে আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ঢাকা শহর হেস্তনেস্ত-লঙ্ঘন করে দূরবর্তী শিরা উপশিরাসমূহ কেটে দেয়ার জন্য চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল সেনাবাহিনী। বিদ্রোহের কেন্দ্রগুলো মিসামার করে দিয়ে সেনাবাহিনী সংখ্যালঘু জনগণ, আওয়ামী লীগ এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বাতন্ত্র্যকামী রাজনৈতিক কর্মীদের উপর অত্যন্ত সুশ্রেষ্ঠাবাবে আক্রমণ চালাতে লাগল। আম গঞ্জে, শহর বন্দরে অক্রম্যত হামলা করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে এমন আসের সংঘাত করল যে তারা ঘরদের জমিজোরাত সবকিছু ফেলে সীমান্তের অপর পারে চলে যেতে বাধ্য হল। এভাবে হিন্দু

রাজনৈতিক জটিলতা

জনসাধারণকে বলপূর্বক তাড়িয়ে দিয়ে ইয়াহিয়া খানের সামরিক জাত্তা এক চিলে অনেকগুলো পার্থি মারার সংকল্প গ্রহণ করেছিল।

প্রথমত পূর্ব পাকিস্তান পৃথিবীর মধ্যে ঘনতম বসতিপূর্ণ এলাকা। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা অনেকদিন থেকেই বলে আসছিলেন যে জনসংখ্যার আধিক্যই এখনকার রাজনৈতিক অস্তিত্বের কারণ। সাড়ে সাত কোটি অধিবাসীর মধ্যে সংখ্যালঘু জনগণের সংখ্যা এক কোটি কিংবা সামান্য কিছু কম। তাদের কিছু হত্যা করে বাকি সবার মধ্যে আসের সংঘাত করতে পারলে তাঁরা সীমান্ত অভিক্রম করে ভারতে চলে যেতে বাধ্য আসের সংঘাত করতে পারলে তাঁরা সীমান্ত অভিক্রম করে ভারতে চলে যেতে বাধ্য আসে। তাদের ঘরবাড়ি, জমিজোরাত, কারবার তেজারাতি—সব অবশিষ্টাংশের হাতে পড়বে। এভাবে প্রায় এক কোটি মানুষকে চলে যেতে বাধ্য করা হলে বাকিরা একটু নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ পাবে। তাদের ঘরবাড়ি, জমিজোরাত অন্যদের হাতে পড়লে তাদের দায়িত্বজনিত কন্দুরোষ্টা অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নিত হবে।

দ্বিতীয়ত পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু-মুসলমান একই সঙ্গে বসবাস করার দরশণ মুসলমানদের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক চিন্তা চেতনার মধ্যেও অনিবার্যভাবে হিন্দু প্রভাব এসে পড়ে। কারণ যৌথ জীবনপদ্ধতি চিন্তাপদ্ধতিকেও অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই স্মৃতিগে যদি অন্ত্রের মুখে সংখ্যালঘুদের সীমান্তের অপর পারে চালান করে দেয়া যায়, তাহলে এই অঞ্চলে পাকিস্তানি নাগরিকরা খাঁটি পাকিস্তানি হিসেবে গড়ে উঠবে। যীরে যীরে তাদের চিন্তা চেতনায় পরিশুরি আসবে।

তৃতীয়ত কোটিখানেক সংখ্যালঘুকে তেলে যদি ওপারে প্রেরণ করা সম্ভব হয়, তাহলে ভারতের দুর্দশার অস্ত থাকবে না—যে ভারত গোড়া থেকে পাকিস্তানকে ভাঙ্গার স্থপ্ত দেখে আসছিল, তার বদলে নিজের কলে নিজে আটকা পড়ে ভারতের ভাস্তর স্বত্ত্বাবনাটি আসন্ন করে তুলবে।

পশ্চিম বাংলা এমনিতে অধিক বসতিপূর্ণ অঞ্চল। এখানে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে সকল বাস্ত্যাগী এসেছে, এখানে তাঁরা স্থানীয় জনগণের সঙ্গে এক হয়ে মিশে যেতে পারেন। অদ্যবাহি ভারত সরকার তাদের মেঠে থাকার সবগুলো দাবি প্ররূপ করতে পারেন। এই বাস্ত্যহারারাই রাজনৈতিকভাবে চরমপন্থী হয়ে ওঠে এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার চূড়ান্ত বিপর্যয় দেকে আনে। বাস্ত্যহারার আধিক্যের কারণেই পশ্চিমবঙ্গে চারুক মজুমদার, কানু সান্যালদের দলের সমর্থকের সংখ্যা অধিক। তাঁরা তিন চার বছর এত উৎপাত করেছে যে পশ্চিমবঙ্গ এবং প্রিপুরা রাজ্যের শাসন কঠামো প্রায় ভেঙে পড়ার অবস্থা। তাঁর উপর আরো কোটিখানেক মানব সত্ত্বানকে যদি গলা ধাক্কা দিয়ে বন্ধুক দেখিয়ে সীমান্ত পার করে পশ্চিমবঙ্গে পাঠিয়ে দেয়া হয় তো পশ্চিমবঙ্গের দুর্দশার অস্ত থাকবে না। প্রায় কোটিখানেক মানুষকে তো ভারত সরকার মেরে ফেলতে পারবে না। তাদের থাকবার ঘর দিতে হবে, খাবার জেগান দিতে হবে। যদি এদের দাবিতে সরকার কর্মপাত না করে, তাহলে বিরোধী দলগুলো এদের সমর্থন আদায় করে শক্তিবৃদ্ধি করে কংগ্রেস সরকারের পতন ঘটাবে। আর যদি সময়ের প্রতি যত্নবানও হয়, তবে কুতুম্ব আর কী করতে পারবে? এক একখানি করে ঘর দিতে হলে একসঙ্গে ভারতের বাজেটের চার পাঁচ বছরের সমপরিমাণ অর্থ কাবার হয়ে যাবে।

তারপরও তো তাদের দাবি মিটবে না। উদ্বাস্ত মানসিকতার কারণেই তারা চরমপন্থী দলসমূহের শক্তি বৃদ্ধি করবে। ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনকাঠামো থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অন্ত প্রদেশের লোকরা লড়াই করছে, লড়াই করছে নাগরা। তাদের সঙ্গে এদের সংগ্রামও যদি যুক্ত হয়, দেখা যাবে, একদিন ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। পাকিস্তানকে দুর্বল করার জন্য ভারত চেষ্টা করে আসছে অনেক দিন থেকে। তার প্রতিবাদে পাকিস্তানও এমন কিছু করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল যা পুরোপুরি কার্যে পরিণত করতে পারলে ভারতের সোজা হয়ে দাঁড়াবার স্থপু চিরতরে স্থান থেকে যেত এবং ভারত ভাঙ্গার সম্ভাবনাটি অত্যাসন্ন হয়ে উঠে।

পাকিস্তানি শাসকরা এটা ও জানত যে সংখ্যালঘুদের সঙ্গে সঙ্গে যদি কিছু আওয়ামী লীগপন্থী ও অন্যান্য দলের লোকজন ভারতে চলে যাবে। তাদের বিষয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতে পাকিস্তান রাজি ছিল না। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে ভারতে কিছুদিন অবস্থান করার পর তাদের কেউ হতাশ হয়ে দেশে ফিরে আসবেন। কেউ নেপালে অশ্রয়প্রাপ্তী ১৮৫৭ সালের সিপাহিদের মত যুরে যুরে বেয়োরে প্রাণ হারাবে। কেউ কেউ একেবারে হারিয়ে যাবে। যারা ফেরত আসের তাদের কাউকে ফাঁসিতে লটকানো হবে, কাউকে সাধারণ ক্ষমা প্রদান করে বেঁচে থাকতে দেয়া হবে। এভাবে জনগণের মধ্য থেকে ভারতীয় প্রভাব একেবারে উপড়ে ফেলা হবে।

পাকিস্তানের শাসকরা স্থির করে নিয়েছিলেন, যে স্বায়ত্ত্বাসনের নামে পূর্ব পাকিস্তানে যখন তখন আন্দোলন হয়, তাও কিছু অংশ দিয়ে দেয়া হবে। পশ্চিমার ভেবে নিয়েছিল, এভাবে এগিয়ে তারা জগতকে বোঝাতে সক্ষম হবে যে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যবর্তী যে সমস্যা তা একাত্তই পাকিস্তানের ঘরোয়া সমস্যা। তৃতীয় একটি দেশের তাতে মাথা গলানোর কোন অধিকার নেই। যারা ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, ভারত সরকার পাকিস্তান ধূংস করার উদ্দেশ্যে তাদের প্ররোচিত করে নিজের দেশের অভ্যন্তরে নিয়ে দিয়েছে। তারা ভারতেরই অনুচর। যারা একটি পার্শ্ববর্তী দেশের সঙ্গে মিলেমিশে নিজেদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ঘড়্যবন্ধ করে, তারা ঘড়্যবন্ধ, তাদেরকে পাকিস্তান আপন ভূখণ্ডে ফিরিয়ে নিতে নৈতিকভাবে বাধ্য নয়। ভারত আপন কুমতলব চিরার্থ করার জন্য এই সমস্ত ঘড়্যবন্ধীদের নিজের দেশে ডেকে নিয়েছে, সুতরাং তাদের খাওয়া পড়া এবং নানাবিধি দায়িত্ব গ্রহণ করা ভারতের নিজস্ব ব্যাপার। যেহেতু ভারত মুহূর্ত অঙ্গ চুলকে ঘা প্রস্তুত করেছে, তাই পূর্ণ খেসারত ভারতকেই বইতে হবে।

ভারতে আগত শরণার্থীদের নিয়ে ভারত যত হৈ চৈ-ই করুক না কেন, পাকিস্তান একই উভর দিয়েছে। ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঘড়্যবন্ধ করেছে, যারা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ঘড়্যবন্ধ করে, তাদের অপরাধ মারাত্মক। আর যে সকল সরল নাগরিক কুচকুচীদের পাল্লা পড়ে ভারতে চলে গেছে, তারা যদি ফিরে এসে মার্জনা ভিক্ষা করে এবং অপরাধ থাকার করে, তাহলে চলে আসতে পারে। বিশ্ব জনমতকে প্রভাবিত করার জন্য পাকিস্তান আরো প্রচার করে যাচ্ছিল যে কুচকুচীদের চক্রান্তে যে সকল সরল নাগরিক ভারতে চলে গেছে, ভারত সরকার তাদের জোর করে আপন ভূখণ্ডে আটকে রেখেছে, দেশে ফিরতে দিচ্ছে না।

ভারত এই এক কোটি বাড়তি মানুষের ভার সব সময়ের জন্য বইতে রাজি হবে না। তাকে পাকিস্তানের শর্তে রাজি হয়ে একটা আপোন করতেই হবে। নতুন যুদ্ধ করতে হবে। ভারত যদি যুদ্ধ ঘোষণা করেই বসে, পাকিস্তান মিত্রদের আহ্বান করবে। হয়তো পঁয়ষষ্ঠির মত সতের-আঠার দিন যুদ্ধ চলবে। একটা সময় আসবে যখন বৃহৎ শক্তিবর্ণের হস্তক্ষেপে যুদ্ধবিরতি চূক্তি করতে হবে। এ রকমও যদি ঘটে, পাকিস্তান দু ভাবে লাভবান হবে—এক কোটির মত জনসংখ্যা ভারতে পাচার করে দিতে পারবে এবং তা করে ভারতে একটি স্থায়ী গোলমাল সৃষ্টির বিষয়ক রোপণ করে দেবে। অন্যদিকে এই অঞ্চলকে একেবারে নিহিন্দু করে ফেলতে পারবে। ফলে এই অঞ্চলে রাজনৈতিক শান্তি সহজে ভঙ্গ হবার সম্ভাবনা অন্ত থাকবে।

৬

পাকিস্তানকে দুর্বল করা ভারতের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ভেঙ্গে একেবারে দু টুকরো করা ভারতের উদ্দেশ্য ছিল না। স্থিক্ষ মন্ত্রিকে বিবেচনা করে দেখলে এই বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে একটি সবল সংহত পাকিস্তানের বদলে একটি দুর্বল শুখ পাকিস্তান ভারতের জন্য অনেক বেশি কাছিত ছিল। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাংলাদেশ যদি ছয়দফা আদায় করতে পারে, তাহলে ভারতের সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়। কারণ কেন্দ্রীয় সম্পত্তি ব্যতিরেকে যদি পূর্ব পাকিস্তান পছন্দমত দেশের সঙ্গে বাণিজ্যাচারি সম্পাদন করতে পারে, তাহলে ভারতের সমস্ত উদ্দেশ্যই সাধিত হয়। অথবা একটি শুখ পাকিস্তান ভারতের জন্য মোটেই ভয়ের কারণ ছিল না। কেননা শুখ পাকিস্তানের যুদ্ধ করার মনোভাব থাকতে পারে না। আর বৃহৎ শক্তিবর্ণও তখন পাকিস্তানকে অক্রুশন্ত দিয়ে বলীয়ান করে বাখা খুব একটা লাভজনক মনে করবে না। দ্বিতীয়ত যদি ভারত পূর্ব পাকিস্তান থেকে সরাসরি কাঁচাপাট আমদানি করতে পারে, তাহলে কাঁচামালের অভাবে প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়া তার পাটকলগুলো আবার বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব হবে। অন্তিমদূর ভবিষ্যতে ভারতের শিল্পজাত পণ্যের বাজার গড়ে উঠার সম্ভাবনাও হেলায় উড়িয়ে দেয়া যায় না।

কিন্তু ভারত কখনো কামনা করতে পারেনি তার এলাকার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ভাষ্যাভিত্তি একটা জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক। বহুভাষী এবং বহুজাতিক ভারত রাষ্ট্রের একেবারে প্রাত্তিশীমায় ভাষ্যাভিত্তিক জাতীয় রাষ্ট্র ভারতের ঐক্যের পক্ষে যে মূর্তিমান ছয়ক তা ভারত সরকারের অবিদিত থাকার কথা নয়। পাকিস্তানের প্রতি যতই আকেশ থাকুক, ভারত-রাষ্ট্রের অস্তর্নিহিত দুর্বলতার প্রতি তারা কম সজাগ ছিল, এ কথা মনে করলে ভুল করা হবে।

যে কারণে পাকিস্তানের বাস্তুকাঠামো ভেদ করে পূর্বাঞ্চল বেরিয়ে আসার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে, সেই সকল কারণ তো ভারত ইউনিয়নের শরীরেও সংগৃহ রয়েছে।

ভারতেও তো বলবৎ রয়েছে অঞ্চল বিশেষের এবং জাতি বিশেষের শোষণ। হিন্দি ভাষার ঔন্দত্য অন্যান্য ভারতীয় ভাষা বিকাশের পথ অনেকটা পাথরচাপা দিয়ে রয়েছে। অঞ্চল বিশেষের অর্থনৈতিক শোষণের বিরক্তে অ-হিন্দি প্রদেশসমূহের বিক্ষেপ এবং অসন্তোষ ভাষা সংস্কৃতি নানা প্রশ্নে মুখিয়ে উঠে ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার উপর আগ্রহ হচ্ছে।

ভাষা সংস্কৃতির স্থানের অধিকারের দাবি সরলরেখায় প্রবাহিত হতে পারলে ভারতীয় রাজসমূহের স্থায়ত্বাসনের প্রশ্নটি উর্ধ্বে উঠে আসতে বাধ্য। জনসংখ্যার দিক দিয়ে ভারত পৃথিবীর বৃহত্তম পুঁজিবাদী দেশ এবং পুঁজির পরিমাণের দিক দিয়ে এশিয়াতে জাপানের পরই ভারতের হাল। সুতরাং যে নেতৃত্বের ভারতকে শাসন করেন এবং যে ধনিক বণিকরা সব রকম মদদ ঘুঁটিয়ে এই শাসক নেতৃত্বের কে লালন করেন থাকেন, তাঁরা সচেতনভাবে এই পুঁজিবাদী শ্রেণীর স্বার্থে পাহারা দিয়ে থাকেন। ভারতের গোটা প্রশাসনযন্ত্র এবং সামরিক ব্যবস্থাপনা এই লক্ষ্যেই নির্বিদিত।

ভারত টিক একটি দেশ নয়, আনেক দেশের পাশাপাশি সমাহার। ভারতের যে এক্য তা ভারতীয়দের স্বতন্ত্রত প্রয়াসে গড়ে উঠেনি। হিন্দু, মোগল এবং ইংরেজ—সমস্ত শাসনামলে একের চাপিয়ে দেয়া ঐক্যের উপর অন্যে এসে জুড়ে বসেছে। ইংরেজরা মোগল থেকে একটি প্রশাসনযন্ত্র উন্নয়নাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন। অনুরূপ আরেকটা সামরিক ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনযন্ত্র ভারতের আধুনিক শাসকরা ইংরেজদের কাছ থেকে পেয়েছেন। এই আধুনিক ভারতীয় প্রশাসনযন্ত্রকে হিন্দিভাষা, ভারতীয় ঐতিহ্য ইত্যাদি কতিপয় কৃত্রিম প্রতীতির উপর দাঁড় করিয়ে মূলত পুঁজিবাদী হিন্দিভাষীরা গোটা ভারত শাসন এবং শোষণ দু-ই করে থাকেন।

বৃষ্টি ভারতীয় ঐতিহ্য বলতে তেমন কোন সোনার পাথরবাটি নেই। একবার যদি ভারতের জাতি ও ভাষাসমূহ জেগে ওঠে এবং নিজেদের অর্থিক জীবনের নিয়ন্ত্রণের জন্য আলাদা আলাদা জনগোষ্ঠীর মানুষকে সংজ্ঞবক্ত করতে লেগে যায়, বর্তমান ভারতের কৃত্রিম ঐক্য ভেঙে পড়বে এবং ভারতীয় ঐক্যের জোড়গুলো খুলে পড়তে আরম্ভ করবে। ভারতের প্রাস্তদেশে যদি কোন জাতীয় রাষ্ট্র জন্মান্ত করে তাহলে শিগগির কিংবা বিলম্বে ভারতের অন্যান্য শোষিত জাতিসমূহও এই একই পথ অবলম্বন করবে।

বিশেষত বাঙালির একটি ভাষাভিত্তিক জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা একেবারে আনকোরা নতুন নয়। উনিশ সাতচতুর্বিংশের ভারতবিভাগের পূর্বে শরৎ বসু, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি, আবুল হাশেম প্রযুক্ত হিন্দু-মুসলিম জননায়ক এ রকম একটা খসড়া পরিকল্পনা করেছিলেন। যেহেতু ত্রিপুরাবৰোধী আদোলনে মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের যাবতীয় ব্যয়ভাব বহন করতেন অবাঙালি হিন্দু-মুসলিম পুঁজিপতিরা, তাই [বাঙালি নেতারা কোন অর্থনৈতিক সমর্থন পাননি।] মূলত অর্থনৈতিক সমর্থনের অভাবেই এ জাতীয় রাষ্ট্রের পরিকল্পনা গোড়াতে বানচাল হয়ে যায়।

কেঁচো খুড়তে গেলে ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম অনুসারে সাপ বেরিয়ে আসতে পারে, এই আশঙ্কা করেই ভারত প্রথমে সরাসরি একটা যুক্তি অবস্থার না হয়ে নিজে

চাপ প্রয়োগ করে এবং বৃহৎ শক্তিবর্গকে দিয়ে চাপ প্রয়োগ করিয়ে এই সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিল। ভারতের দাবি ছিল, পাকিস্তান বাস্তুতাণি অধিবাসীদের ফেরত গ্রহণ করুক, তাদের নিশ্চিত এবং নির্বিঘ্ন জীবনযাপনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হোক, পূর্ব পাকিস্তানিদের ন্যায্য দাবি মেনে নেয়া হোক এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেয়া হোক। পাকিস্তান ভারতের প্রচারণায় দৃশ্যত কোন কান না দিয়ে পথিকীর মানুষকে বোঝাতে চেয়েছে যে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা পাকিস্তানেরই অভ্যন্তরীণ সমস্যা। ভারত একটি তৃতীয় দেশ। সুতরাং ভারতের কোন কথা বলার অধিকার নেই। বরং ভারতই অনুগ্রহেশ্বকারী পাঠিয়ে এবং কতিপয় কুচক্ষে বিদ্রোহীদের আশ্রয় দিয়ে ঘোলা জলে মৎস্য শিকার করার উদ্দেশ্যে একটা গোলমাল পাকিয়ে তুলছে।

ইয়াহিয়া খানরা ভোবেছিলেন, ভারতকে স্বাক্ষর সলিলে ফেলে দিয়ে মজা দেখবেন। যে অস্ত্র ভারত পাকিস্তানকে ঘোলেন করার জন্য শাশিয়ে তুলছে, তা ভারই বুকে বজ্রশেলের মত এসে বাজে। পূর্ব পাকিস্তানের শাসন-শৃঙ্খলা কোন রকমে কিছুদিন পর্যন্ত টিকিয়ে রাখতে পারলেই একটা সময় আসবে, যখন ভারতকে পাকিস্তানের প্রস্তাবে রাজি হতে হবে।

ভারত-পাকিস্তান যুক্তের পূর্বে স্বদেশে কিংবা বিদেশে ভারত কোথাও যুক্তের কথা উচ্চারণ করেনি। যুক্তের কথা বলার মধ্যে যে বিপদ আছে, সে বিষয়ে ভারত পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিল। বাংলাদেশের সমস্যা যে মানবিক সমস্যা এবং এর গ্রহণযোগ্য বাজনৈতিক সমাধান প্রয়োজন, সে বিষয়ে বিশেষ নেতৃত্ব এবং জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টার জটি করেনি ভারত। ভারতীয় নেতৃত্ব পৃথক পৃথক পৃথিবীর রাজধানীসমূহে বিবামবিহীন সফর করেছেন এবং পৃথিবীর নেতৃত্বকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান হওয়া খুবই প্রয়োজন।

একইভাবে পাকিস্তানে নেতৃত্বে পৃথিবী সফর করেছেন এবং তাঁরা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে বাংলাদেশ ব্যাপারটি একত্রভাবেই পাকিস্তানের ঘৰোয়া সমস্যা। মাঝখানে ভারত আহেতুক নাক গলিয়ে গায়ে পড়ে শক্তি সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশের ব্যাপারটি ছিল ভারতের অমর্তাসীন কংগ্রেস দলের তুরপ্রের তাস। বাংলাদেশে প্রশ্নটির উপর দাঁড়িয়েই শাসক কংগ্রেস বিরোধী দলগুলোকে নাজেহাল করার এবং কিছুটা পুরানো ঐতিহাসিক প্রতিহিস্তার চরিত্রার্থতা সাধন, কিছুটা সুবিধা অর্জন আর সর্বীপরি আগমানীতে ফ্রমতা দখল করার পথ নিষ্কটক করার জন্য উঠে পড়ে লাগল। এজন্য সূচনাপূর্ব থেকেই কংগ্রেস অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বিষয়টাকে আগামোড়া একটি লাজ্য চলিত করার জন্য দলীয় ক্যাডবরদের নিয়োজিত রেখেছিল। মক্ষে-সমর্থক ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেস সরকারকে বাংলাদেশের ব্যাপারে অফ আনুগত্য প্রদান করেছে।

এছাড়া বাকি বাজনৈতিক দলগুলো প্রথম থেকেই কংগ্রেসের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের প্রতি অতিশয় সমালোচনামূল্য দিল। কংগ্রেস বাংলাদেশ প্রশ্নটি মূলধন করে কেন্দ্রা জয় করে ফেলবে, তা বিরোধী দলগুলো খুব একটা সুনজরে দেখেনি। অথচ কংগ্রেস সরকার বাংলাদেশের ব্যাপারটি জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের সঙ্গে এমনভাবে

তেলেসমাতি করে জড়িয়ে ফেলেছিল যে সরাসরি কংগ্রেসের কিংবা বাংলাদেশের বিরোধিতা করার সাহস বিরোধী দলগুলোরও ছিল না। দেখতে না দেখতেই কংগ্রেসের নতুন একটা ভাবমূর্তি গড়ে উঠে। ভারতীয় জনগণ কংগ্রেসের ভূমিকার প্রতি ঐক্যবদ্ধ সমর্থন ও প্রশংসন করে। প্রতিশ্ফুলভাবে জনমত জথম না করে বিরোধী দলগুলো কিভাবে কংগ্রেসের ভাবমূর্তি শুন করা যায় বিরামহীন সে প্রয়াস চালিয়ে যেতে থাকল।

যেহেতু ভারত সরকার ভেবেছিল, যুদ্ধে না গিয়ে রাজনৈতিক সমাধান পাকিস্তানকে দিয়ে গ্রহণ করানো সম্ভব হবে। তাই সেদিকে লক্ষ্য হিসেব করে কংগ্রেস সরকার সেই পথেই অহসর হচ্ছিল। কিন্তু যুদ্ধের সম্ভাবনা একেবারে উভিয়ে দিতে পারেনি। এদিকে ভারতীয় জনগণও প্রায় কেটিখানেক বাড়তি মানুষের চাপে দিনে দিনে বিবর্জ্জন হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, প্রিপুরা, মেঘালয়, শিলং ইত্যাদি অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রতিদিনই কামনা করছিল, সরকার যা হোক কিছু একটা করে এদের দেশে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করকৃ। প্রথম দিকের সমর্থন এবং সহানুভূতি দিনে দিনে শুকিয়ে ফীণ হয়ে আসছিল। সরকার তত্ত্বাবধি কিছু করছে না দেখে সরকারের উপর তাদের আহ্বান দিনে দিনে দুর্বল হয়ে আসছিল। এই সুযোগে ভারতের বিরোধী দলের লোকেরা সভা সমিতি করে সর্বত্র বলে বেড়াতে লাগল যে ভারত সরকার বাংলাদেশের জনগণকে প্রতারিত করতে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে পেছন দিকে ছুরিকাহত করে খুনী জল্লাদ ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে একটা আপোস-রফা করার স্বত্যন্ত্র করছে। এ নিয়ে কাগজপত্রে লেখালেখি হতে লাগল বিস্তর।

এমনকি স্বয়ং কংগ্রেস-সমর্থক কিছু কিছু কাগজও সরকারের নিক্রিয় আপোসকামী ভূমিকার নিম্নে করতে লাগল জোরাল ভাষায়। তার ফলে সরকারকে নানামুখী সমস্যার সম্মুখীন হতে হল।

প্রথমত বিরোধী দলগুলোর প্রশ্ন। দ্বিতীয়ত ভারতীয়, বিশেষ করে বাংলাদেশের, সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহের জনমত। তৃতীয়ত পাকিস্তানকে রাজনৈতিক সমাধানে রাজি করানোর প্রশ্ন। চতুর্থত আওয়ামী লীগের কর্মী এবং নেতৃবৃন্দের মনোবল ও আঙ্গ টিকিয়ে রাখার ব্যাপার।

সূচনার দিকে আওয়ামী লীগের লোকজন এক রকম নিঃসন্দেহই ছিলেন যে ভারত অচিরেই একটা সামরিক ইত্তেক্ষণ করবে। সেদিকে না গিয়ে ভারত যখন পাকিস্তানের সঙ্গে আলাপ আলোচনার দিকে অহসর হচ্ছিল, তাঁরা মনে খুবই শক্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা জানতেন যে বাংলাদেশের জনগণ একটিমাত্র দাবি ছাড়া আর কোন দাবি মেনে নেবেন না। সেটি স্বাধীনতা। বাংলাদেশ যদি তাঁদের নেতৃত্বে যে কোনভাবেই হোক স্বাধীনতা লাভ না করে তাঁদের দেশে প্রত্যাগমন করা এক রকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। ভারত সরকার পাকিস্তান সরকারকে যে আলাপ আলোচনা আহ্বান করছে, সেটি তো তাঁরা পঁচিশে মার্চের পূর্বেই করতে পারত। আর যদি আলাপ আলোচনা করতেই হয়, তাহলে তাঁরাই তো পারে, মাঝখানে ভারত কেন? আলাপ আলোচনা মানে তো স্বাধীনতা নয়। স্মরণকালের নির্মূলতম বলি হওয়ার পরও তাঁদের নেতৃত্বে বাংলাদেশের জনগণ কি পাকিস্তানের অস্তিত্ব মেনে নেবে? এইসব প্রশ্ন

আওয়ামী লীগারদের মনে সময়ের অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানকভাবে তোলপাড় করছিল এবং তাঁরা কংগ্রেসের উপর আহ্বা হারিয়ে ফেলছিল।

পঞ্চমত যে সকল শরণার্থী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, তাদের মধ্যে সপরিবারে যারা ছিল, তাদের শতকরা আশ্রিতাগাই ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক। তাদের অধিকাংশই মনে করত, যেহেতু উনিশশ সাতচলিশ সালে মহাজ্ঞা গান্ধি এবং জওয়াহুরলাল নেহের প্রযুক্ত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দ্বিজাতিতত্ত্ব অনুসারে ভারতবিভাগ মেনে নিয়েছিলেন, তাই তাঁরা সেই ভারতবিভাগেই বলি। তাদের স্বাধীন বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর দায়িত্ব বর্তমান ভারত সরকারে। যত আলাপ আলোচনাই হোক না কেন, বাংলাদেশ যতকাল পাকিস্তানের অংশ হিসেবে টিকে থাকবে, ততকাল তাঁরা কিছুতেই ফেরত যাবে না।

ষষ্ঠত যে সকল তরুণ মুক্তিযোদ্ধা ভারতের নানা স্থানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ করার জন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করত, ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ তাদের হাতে কোন ভারি অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করত না। কংগ্রেস সরকার সব ব্যাপারে একটা সংযম রক্ষা করে আসছিল, যাতে করে আলোচনার মাধ্যমে একটা আপোস-নিষ্পত্তির পথ বন্ধ হয়ে না যায়। হালকা অস্ত্রপাতি, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গামছাবাঁধা করেকটা প্রেনেজ এবং রাইফেলজাতীয় কিছু যন্ত্রপাতি সহল করে এপারে এসে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিশেষ কোন স্ফতিই করতে পারত না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ধরা পড়ে প্রাণ দিতে হত তাঁদের। যাঁরা সাহায্য করতেন তাঁরাও বিপদে পড়তেন। এই অবস্থা পৌঁঁঝপুঁক চলতে থাকলে অবিশ্বাস এবং সন্দেহ তাদের হেঁকে থরে—হয়তো ভারত সরকারের পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করার কোন অভিধায়ই নেই। মাঝখানে তাদের প্রাণগুলো বলতে গেলে একরকম অকারণেই খোয়াচ্ছে। তাদের মধ্যেও হতাশার হিমেল হাওয়া সঞ্চারিত হচ্ছিল।

সপ্তমত বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অত্যাচারে এবং স্বাধীনতার প্রতি দুর্দমনীয় স্পঘায় ছেট ছেটি প্রতিরোধাবিনী জন্মলাভ করছিল। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন যথেষ্ট রকমের মুক্তিযোদ্ধা, চারিত্রে অনেকে বেশি দৃঢ় ও প্রত্যয়সমৃদ্ধ এবং সমাজদর্শনের দিক দিয়ে অনেক বেশি প্রাগ্মসর। তাঁরা নানা স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর উপর ছেটখাট হামলা পরিচালনা করছিলেন। দখলদার পাকিস্তানি সৈন্যের বর্ণনাত্তীত অভ্যাচারের মুখে তাঁদের সংখ্যা দ্রুতভাবে বৃক্ষিলাভ করার যথেষ্ট সংস্কার হচ্ছিল। তাঁরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে যেমন, তেমনি ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে তাঁদের সরাসরি সংঘর্ষ হয়েছে। যতই দিন অতিবাহিত হচ্ছিল, ততই তাঁদের সংখ্যা বাড়ছিল। এভাবে যুদ্ধটি যদি গণযুদ্ধের আকারে ভিয়েতনামের মত ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে ভারতের সমূহ সর্বনাশ। জনগণের অস্তর থেকে আওয়ামী লীগের ভাবমূর্তি একেবারে মুছে যাবে। এমনকি এক সময় চিন তাঁদের পিছনে মদদ নিয়ে দাঁড়াতে পারে। আওয়ামী লীগারদের যদি বাংলাদেশে আসীন করতে না পারে, তাহলে ঘৰে বাইরে দু দিক দিয়েই কংগ্রেসের ভৱাভু ঘটবে এবং বাংলাদেশ চিরদিনের জন্য হাতের বাইরে চলে যাবে।

কংগ্রেস সরকার আশা করেছিল, অন্তত ইয়াহিয়া খানরা ভারতের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে একটা রাজনৈতিক ফয়সালা করে যে কোন ভাবেই হোক, পাকিস্তানের অভিভূতি টিকিয়ে রাখবেন। কিন্তু ইয়াহিয়া খানরা চিন্তা করলেন, তাদের অবস্থান সুবিধাজনক। ভারতকেই পাকিস্তানের শর্ত মেনে নিতে হবে। অতএব ভেতর বাইবের অসংখ্য দুর্ঘ নিরসনের জন্য ভারতের সামনে একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন খোলাপথ রইল না। ভারত সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হল। একে একে সোভিয়েত প্রভাবাধীন সরকারসমূহ দিয়ে ভারতে অধিত্বাওয়া মুক্তি আন্দোলনের আইনবুৎ সরকার বলে স্বীকৃত করিয়ে নিল। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, প্রেট ব্রিটেন প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশসমূহের রাজধানী সফর করে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে এলেন, যদি সত্য সত্য ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ লাগে, অন্তত তাঁরা যেন পাকিস্তানের পক্ষ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হন এবং জনগণকে বোঝাতে চাইলেন যে ভারত যদি যুদ্ধ করেন, তাহলে করবে একাত্ত বাধা হয়ে।

৭

পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিসমূহ এবং মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের ভূমিকার উপর কিপিং আলোকপাত না করলে বাংলাদেশের জন্য ইতিহাস অনেকটা কুয়াশাছন্দ থেকে যাবে। এই রাষ্ট্রসমূহ বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সময় যে ভূমিকা পালন করেছে তার সার্বিক প্রভাব যেতাবে মুক্তিসংগ্রামের গতিধারাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে ও বাংলাদেশের অভসরহ সামাজিক শক্তিশালোকে সামনে টেনে এনেছে ও পক্ষাতে ঠেলে দিয়েছে—সে কথা একটা আলোচনা করার আপেক্ষা রাখে। সে সমস্ত দেশ সরাসরি বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে সহায়তা দান করেছে, তার পিছনে তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতিক প্রভাব বিস্তারের বাসনা কতদুর ছিল, সে কথাও একটু নির্মোহভাবে দেখা প্রয়োজন।

শুরু থেকে সোভিয়েত রাশিয়া বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে সক্রিয় সহায়তা দান করেছে। ভারতের সঙ্গে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বেও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সোভিয়েত রাশিয়া ব্যবহার সমর্থন দান করেছে। সোভিয়েত প্রভাবাধীন দেশসমূহও সূচনাপূর্ব থেকেই বাংলাদেশের প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করেছে। প্রধানত সোভিয়েত রাশিয়ার মূলবিহুনার কারণেই পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহ ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হওয়ার বহু পূর্বেই ভারতের তত্ত্বাবধানে গঠিত আওয়ামী লীগ সরকারকে বাংলাদেশের বৈধ সরকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। এসবই সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সোভিয়েত রাশিয়ার অনুকূল মনোভাবে কারণে। ভারতের ভারত সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী-চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে এবং পাকিস্তানের সঙ্গে আসন্ন যুক্ত জয়লাভ করার জন্য প্রয়োজনীয় সমরাত্মক থেকে শুরু করে সব রকমের সুযোগ সুবিধা লাভ করেছে। যুক্ত ভারতীয় সৈন্যের হাতে পাকিস্তানের

পরাজয় ঘটে। সুতরাং এ কথা বলা বোধ করি অসমীয়ান হবে না যে পরোক্ষে সোভিয়েত রাশিয়ার অকৃষ্ট সাহায্য এবং সহযোগিতার প্রতিশ্রূতি না থাকলে বর্তমান আন্তর্জাতিক জটিল পরিস্থিতিতে ভারতের পক্ষে সশস্ত্র সামরিক হস্তক্ষেপ করে পাকিস্তানকে ভাস্তো মত একটি সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হত না।

শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধির সরকার পূর্ব থেকেই চিনা ভূমিকির মুখ্য সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি একটি সমরোচ্চাপূর্ণ মনোভাব গ্রহণ করেছিল এবং ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নিজের আসন আটুট রাখার জন্য ভারতের মক্ষেপস্থী কমিউনিস্ট পার্টি'কেও নিজের দিকে আকর্ষণ করেছিল। তারপর থেকে ভারতের শাসক কংগ্রেস এবং মক্ষেপস্থী কমিউনিস্ট পার্টি পারস্পরিক প্রয়োজনে একে অপরকে সহায়তা করতে থাকে। শাসক কংগ্রেসের স্বার্থ ছিল অন্যান্য বিবোধী দলীয় রাজনৈতিক দলগুলোকে পরাজিত করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র সমর্থনে বাজ্যসভা এবং লোকসভার সংখ্যাগুরু আসন লাভ করা। বিশেষত সেই সময়ে বখন মূল কংগ্রেস—আদি কংগ্রেস ও শাসক কংগ্রেস এই দুটি দলে—বিজ্ঞ হয়ে পড়ে। আর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র স্বার্থ ছিল, যেহেতু ইন্দিরা গান্ধির সরকার সোভিয়েতের দুরবন্ধনানীতি প্রণয়ন করেছে এবং লালচিমের প্রতি একেবারে ফরাহাইন এবং খড়গহস্ত, তাই এ দলের নেতৃত্বে ইন্দিরা গান্ধির সরকারের প্রতি সমর্থন যুগিয়ে যাওয়া একটা নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করতেন। আসন্নেও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' দুর্দে কংগ্রেসের স্ফুর্দে সহযোগী হয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার স্বার্থকে রক্ষা করত এবং রাশিয়ার স্বার্থকে নিজেদের স্বার্থ বলে মনে করত।

সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের যে বন্ধুত্ব তার মৌল উৎস হল এই সত্য: ভারতে চিন একটা যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে এবং সে অবধি চিনের সঙ্গে ভারতের প্রথর শক্ততা চলছে। এটা ভারতীয় দিক। আর রাশিয়ার দিকটি হল, বাহ্যত আদর্শগত কারণে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে গণচিনের ঐতিহাসিক বন্ধুত্ব সময়ের বিবর্তনে ঐতিহাসিক শক্তিত্ব রূপ নিয়েছে। চিন সোভিয়েত রাশিয়া এবং ভারত উভয়ের শক্তি। সুতরাং ভারত ও সোভিয়েত রাশিয়া পারস্পর প্রস্তুত পরম্পরের বন্ধু। অন্যদিকে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যেও প্রস্তুত শক্তিতার সমন্বয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই ভারত ঠেকানোর জন্য পাকিস্তানকে একদিকে গণচিনের সঙ্গে মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়েছে, অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক বচন করতে হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক এবং ধনতান্ত্রিক প্রতিটি বৃহৎ রাষ্ট্রই আপনাপন রাষ্ট্রদৰ্শ প্রচার করে পৃথিবীর জনগণের মনে স্থান করে নেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু উপর্যুক্ত সময় সকলেই আপনাপন স্বার্থকেই সব কিছুর উর্ধ্বে স্থান দিয়ে থাকে, সে কথা বলাই বাহ্য। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন দিয়ে সোভিয়েত রাশিয়া দুরকমে লাভবান হতে চেয়েছিল। প্রথমত, এশিয়া-আফ্রিকার দেশসমূহে চিনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে আটকানো। সে কাজটি একমাত্র সম্ভব এশিয়ার অপর বৃহত্তম দেশ ভারতকে প্রতিস্পর্ধী শক্তি হিসেবে দোড় করিয়ে। পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলকে যদি ভারতের প্রত্যক্ষ প্রভাবের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হয় তাহলে পাকিস্তানের সঙ্গে মৈত্রী-চুক্তিতে আবদ্ধ

গণচিনের প্রভাব এই অঞ্চলে চিরদিনের মত শেষ হয়ে যাবে। প্রবর্তীকালে ভারতের সাহায্যে পাকিস্তানের অপরাপর প্রদেশের মধ্যে বিরাজমান দ্বন্দ্বসমূহ শান্তি করে ধীরে ধীরে গোটা উপমহাদেশকেও ভারতের তত্ত্বাবধা। একটি চিনিবিরোধী ব্রক হিসেবে দাঁড় করানো যাবে।

সোভিয়েত রাশিয়ার দু নথর লাভ হল, যেহেতু আন্তর্জাতিকভাবে প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা উষ্ণ প্রতিযোগিতা চলছে, সেহেতু প্রথমে পাকিস্তানকে ভেঙ্গে দু টুকরো করে, পরে পাকিস্তানের মূল অংশের মধ্যে ভাঙ্গনের প্রক্রিয়াটি দ্রুত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপরও কৃটনৈতিক বিজয় অর্জন করা সম্ভব হবে। সোভিয়েত রাশিয়ার এবং ভারতের স্বার্থের সমস্যাতে অবস্থানের দরবণ বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মক্ষোপস্থী অংশ এবং মক্ষো-সমর্থক বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি বলতে গেলে হঠাতে প্রুরোচনাগে চলে আসে। উনিশশ সন্তুর সালের নির্বাচনে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বোধ করি একটি কি দৃঢ় আসনে বিজয়ী হতে প্রেরেছিল। কমিউনিস্ট পার্টি তো পাকিস্তানে নিষিদ্ধই ছিল। তাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রাই ওঠে না। তা সঙ্গেও এ রকম একটি সংযোগস্থু দল মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন হঠাতে করে আওয়ামী লীগের অভিভাবক হয়ে দাঁড়াল কেমন করে তা বীরভিত্তি কৌতুহলের বিষয়।

আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ডে যখন থেকে ভারতমুখিতা স্পষ্ট হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে তখন থেকেই সোভিয়েত রাশিয়ার সমর্থক দল এবং দলের অধীন উপদলগুলো আওয়ামী লীগের কাছে ঐক্যের প্রস্তাব দিয়েছিল। আওয়ামী লীগ নিরক্ষুল বিজয়ে এত বেশি আংশীয় ছিল যে এ রকম একটি অপ্রধান রাজনৈতিক দলের সঙ্গে একত্ববদ্ধ হওয়ার কোন প্রয়োজন বোধ করেনি। এছাড়া আরেকটি কারণ ছিল। আওয়ামী লীগের বেশির ভাগ লোকই ছিল উঠতি বাঙালি মধ্যবিত্ত। তাঁরা সরাসরি সমাজতাত্ত্বিক রাষ্ট্রাদর্শের বিরোধিতা করতেন। চিন্তা চেতনার দিক দিয়ে, অন্য অনেকের কথা বাদ দিলেও, স্বয়ং শেখ মুজিবুর রহমানও পাকিস্তানের বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেকটা অনুবর্তী ছিলেন।

মক্ষোপস্থী দলগুলোর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড যা-ই হোক না কেন, তারা সমাজতাত্ত্বিক রাষ্ট্রাদর্শে বিশ্বাসী ছিল। এই কারণেও তারা আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। বাধা দু দিক থেকেই ছিল। আন্তর্জাতিক প্রয়োজনে মক্ষোপস্থী দলগুলোর নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন অনুভূত করছেন, কিন্তু কর্মীদের তাঁরা কোন সন্দৰ্ভের দিতে পারেন নি, সমাজতাত্ত্বিক রাষ্ট্রাদর্শ অনুসারী দল কী করে একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রাদর্শ অনুসারী দলের সঙ্গে এক হয়ে যায়।

আর আওয়ামী লীগের মধ্যে যে ছাত্র-যুবকদল সমাজতাত্ত্বিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রস্তুনের কথা বলতেন, ঠিক মক্ষোর তাঁবেদার দলগুলোর সঙ্গে অপোস করে শুধু সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য সমর্থনের উপর নির্ভর করে কিভাবে সমাজতাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠা করা যায়, এ বিষয়ে তাঁদের কোন আস্থাই ছিল না। পঁচিশে মার্চের ঘটনার পর আওয়ামী লীগের লোকরা ভারতে চলে যায় এবং ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে তারা জড় হতে থাকল ও

রাজনৈতিক জটিলতা

একটি আশ্রিত সরকার গঠন করল। পঁচিশে মার্চের পূর্বে আহিংস অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন বাংলাদেশের বাস্তুরপটি কী হবে, আওয়ামী লীগ সে বাপারে ঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। কেননা আওয়ামী লীগ দলটি বাঙালি মধ্যবিত্তের দ্বারা গঠিত এবং তাঁরাই এর মুখ্য উপাদান। সুতরাং নিজেদের শ্রেণীগত অবস্থানের জন্যই তাঁরা সমাজতাত্ত্বিক রাষ্ট্রকে কুরু করতে পারেন না।

অন্যদিকে শ্রমিক, ক্ষক, ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবীদের দাবি এমন চরমে উঠেছিল যে আওয়ামী লীগের পক্ষে সরাসরি তা অস্থীকার করার উপায়ও ছিল না। আর আওয়ামী লীগের অন্তর্ভুক্ত যে যুবক এবং ছাত্র অংশটি সমাজতাত্ত্বিক সমাজব্যবস্থার স্পন্দকে ছিল, দলীয় সিদ্ধান্ত প্রণয়নে তাদের হাত ছিল না। বর্তমান পর্যালোচনার একটি পর্যায়ে আমরা দেখতে পাব যে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পর, তাঁরা আর আওয়ামী লীগের আমরা দেখতে পাব যে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পর, তাঁরা আর আওয়ামী লীগের সঙ্গে অবস্থান করতে পারেনি, সম্পূর্ণ আলাদা একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে নতুন সুরক্ষার কর্মসূচি গ্রহণ করে আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। সে যাহোক, মধ্যবিত্তশাসিত আওয়ামী লীগ দলটিকেও সেই সময় আন্দোলনের বেগ অপ্রতিহত রাখার জন্য এই অংশকে হাতে রাখতে হয়েছে। বিশেষত আন্দোলন যতই জঙ্গি হয়ে উঠছিল ততই এই অংশের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধিলাভ করছিল।

বাংলাদেশের মাটিতে অবস্থান করার সময় যে আওয়ামী লীগ সমাজতন্ত্রকে স্থীকার করে নেয়েনি, ভারতে নিয়ে দিয়ে দিয়ে চাপের মুখে সেই সমাজতন্ত্রের কথাই তাদের বলতে হল। প্রথমত আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব সম্পূর্ণ দেশের বাইরে ছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলাদেশের যুক্তে তাঁদের শুধু মুখে কথা বলা ছাড়া পালনীয় কোন ভূমিকা বর্তমান রাইল না। দেশের ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণের জন্য তাঁদেরকে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে সমাজতন্ত্রের কথাও বলতে হল। অন্যদিকে বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারতের প্রধান সহায় ছিল সোভিয়েত রাশিয়া। এদেশের রুশ সমর্থকর ফ্রেমালিনের নেতৃবৃন্দকে বুধিমত্তাহিলেন যে শেখ মুজিবুর রহমানের ইমেজ সামনে রেখেই, ভারত রাষ্ট্রের সহায়তায় বাংলাদেশে একটি সমাজতাত্ত্বিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তাই রাশিয়াও চাপ প্রয়োগ করে অন্যান্য রাষ্ট্রীয় মূলনীতির সঙ্গে সমাজতন্ত্র শব্দটি যোগ করিয়ে দিয়েছিল। ভারতের মত পুঁজিবাদী একটি দেশের একেবারে উপাত্তে পুঁজিবাদ ক্ষমতায় আসীন থাকার সময় কী করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, এবং এই ধারণা হাস্যকর কিনা, সেই সময় আওয়ামী লীগের দেখে দেখার বিষয় হয়ে উঠতে পারেনি।

ভারত থেকে পরিচালিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মক্ষোর পরোক্ষ সাহায্য-সহযোগিতা এবং সমর্থনের পথ বেয়ে ন্যাপের মক্ষোপস্থী অংশ এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি অংশীয়তাবে আওয়ামী লীগের ঘাড়ের উপর সিদ্ধাবাদের বুড়োর মত চেপে বসে। আওয়ামী লীগ বেড়ে ফেলার জন্য যতই কাঁধ ঝাড়া দিয়েছে তাঁরা ততই শক্ত হয়ে বসেছে। বারবার ভারত-রাশিয়ার মিলিত চাপের কাছে আওয়ামী লীগকে নতুনীকার করতে হয়েছে। এইভাবে জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক বিবর্জিত

সংখ্যালঘিষ্ঠ দল হওয়া সত্ত্বেও মক্ষোপছী নাপ এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি অভিভাবকদের স্থে সিদ্ধান্ত প্রণয়নে অংশগ্রহণ করতে পেরেছে। স্বাধীনতার পরে তাদের প্রভাব খর্ব না হয়ে আওয়ামী লীগের উপর উত্তরোত্তর বুদ্ধিলাভ করেছে। এমর্যাক তাদেরই পরামর্শে এবং সক্রিয় সমর্থনে আওয়ামী লীগ দলটি তেজে বাকশাল নামে তিন দলের একটি সমিলিত ফ্রন্ট গঠন করে শেখ মুজিবুর রহমানকে মৃত্যুর পথ প্রশংস্ক করতে হয়েছে।

সোভিয়েত রাশিয়ার পরে আসে চিনের কথা। চিন বিশ্বের সর্বাধিক জনগণ অধ্যুষিত সমাজতান্ত্রিক দেশ। চিনের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার ইকাশে আদর্শবাদের বিরোধ এবং মূলত প্রভূত্বের দুর্বল উলঙ্গভাবে পরিস্ফুট হবার পর দুটি দেশ পরস্পরের প্রভাব প্রতিপন্থি র্থব করার লক্ষ্যে সব সময় সর্ব প্রকার প্রয়াস প্রযত্ন নিয়ে গ করে আসছে। এশিয়ার অপর বৃহৎ দেশটি ভারত। আর ভারতে-চিনে একটি যুদ্ধ অতি সাম্প্রতিকক্ষালে সংঘটিত হয়েছে। ভারতের চিন-বৈরিতার সুযোগ নিয়ে এই বিশ্বাল ভূখণ্ডে সোভিয়েত রাশিয়া চিন-বিশ্বোবী একটি শক্তিশালী অগ্রণ রচনা করতে চেয়েছিল। চিন এই উপমহাদেশে সোভিয়েত রাশিয়ার মনোভাব আঁচ করতে পেরে ভারতের জন্মশক্তি উপমহাদেশের অপর দেশটির সঙ্গে মৈত্রী রচনা করেছিল এবং ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষে প্রভূত সহযোগ করে সেই মৈত্রী প্রমাণও দিয়েছিল।

উনিশ একান্তর সালের পর উন্নত বাংলাদেশের পরিস্ফুটি চিন। নেতৃবৃন্দকে সত্ত্ব সত্ত্ব নাজুক অবস্থায় ফেলে দিয়েছিল। বাংলাদেশের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জন্ম ভারত যখন উচ্চপদে লেগেছে এবং বাশিয়াও ক্রমাগত মদন যুগিয়ে চলেছে, তখন গোটা বাংলাদেশের ব্যাপারটিই রুশ-ভারতের ঘড়্যস্ত্র বলে তাঁরা ধরে নিলেন। পাকিস্তানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে না বললেও ঢোক গিলে শ্বিকার করে নিত্বে হল যে সত্ত্ব সত্ত্ব ভারত পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলিয়ে অথবা গোলমাল পাকিয়ে তুলছে। বাংলাদেশের ব্যাপারটি পাকিস্তানের ঘৰোয়া ব্যাপার। বাংলাদেশে যে একটি নির্যাতিত জাতিসভা ইতিহাসের হিংস্রতম হত্যাকাণ্ডের মুখে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবিতে জেগে উঠেছে, চিনারা প্রথমদিকে তার স্বরূপ পুরোপুরি চিনতে ভুল করেছে, এ কথি বলতেই হবে। এই ভুল যতটা চিনের, তার চাইতেও বেশি চিনপছন্দীদের। তারা তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচির সঙ্গে অতীতে কথনো বাংলাদেশের জাতিসভার সংগ্রামকে একীভূত করে নেয়েনি। বরং বাংলাদেশের প্রশংস্তি এড়িয়ে গিয়ে আইনুব থানের প্রতি সমর্থন দান করে সমাজতন্ত্র আন্তে পারবে এই রকম একটি বিশ্বাস তাদের আশ্রয় করেছিল।

শেষ পর্যন্ত গণচিনকে বাংলাদেশের মুক্তিসংঘামের প্রতি আরো একটু খোলা চোখে তাকাতে হল। বাংলাদেশে পাকিস্তানি সৈন্যদের ঝুংসতা, নির্মতা এবং তদুপরি বাঙালি জনগণের জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অনমনীয় সংগ্রাম তাদের মনে দ্বিতীয় চিন্তার জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু তারা বাংলাদেশের ব্যাপারটি বাংলাদেশের জনগণই ঠিক করবে—এর বেশি কিছু বলতে পারল না।

অন্যদিকে পাকিস্তানের সঙ্গে কৃত চুক্তিসমূহের সম্মানণ রশ্ব করতে হল। পাকিস্তানের যে সকল রাজনৈতিক অতিথি চিনে গমন করেছেন, তাদের সঙ্গে তোজসভায় বলতে হল, বিপদে আপদে চিনের জনগণ সব সময় পাকিস্তানের পক্ষে থাকবে। আর চিনের রাষ্ট্রীয় অভিহিঁরা পাকিস্তানে এসেও একই ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করলেন। পাকিস্তান সরকার সমস্ত প্রচারায়ের মারফত প্রচার করল যে চিন ভারতের এই আংহাসী মনোভাবের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে সর্বাত্মক সাহায্য দেবে। আবার ভারতীয় প্রচারায়ে ফলাফল করে প্রচার করা হল যে বাংলাদেশের নির্বিচার গণহত্যার বিরুদ্ধে চিনের কোন বক্তব্য নেই। বরং তারা পাকিস্তানি হত্যাকারীদের অর্থ এবং অন্তের মদন মুগিয়ে চলেছে।

চিনের নেতৃবৃন্দ এক মহাফাপড়ে পড়ে গেলেন। বাংলাদেশের প্রশংস্তি তাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ এবং আন্তর্জাতিক কৃটনীতি প্রস্পরের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। রাষ্ট্রাদর্শ এবং জাতিগত নিপীড়নের বক্তব্যের মুখোমুখি যখন আন্তর্জাতিক কৃটনীতি এসে দাঁড়ায়, তখন অনিবার্যভাবেই আন্তর্জাতিক কৃটনীতিরই জয় হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে।

চিনের এই ভূমিকা চিনপছন্দীদেরই সবচেয়ে বেশি বেকায়দায় ফেলে দিল। চিনের আসল মনোভাব যা-ই থাকুক না কেন, ভারত-পাকিস্তানের প্রচারে এদেশের জনগণের সামনে প্রতিভাত হল যে বাংলাদেশের নির্বিচার গণহত্যার বিরুদ্ধে চিনের কোন বক্তব্য নেই এবং অধিকন্তু চিন পাকিস্তানকে সহযোগ করে যাচ্ছে। এ কারণে চিনপছন্দী রাজনৈতিক দল এবং উপদলগুলো, পূর্ব থেকেই যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাংলাদেশের আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিল, কী করবে বুবাতে পারল না।

চিনপছন্দী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীসহ চিন-সমর্থক বামপছন্দী নেতৃবৃন্দের একাংশও গ্রাম বীচাবার তাগিদে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের হৃত্তিযুক্ত পরিচালনার যে চতুর্সদস্য বিশিষ্ট কাউন্সিল গঠিত হয়েছিল, মওলানা ভাসানীর নামও তার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। আর এমনভাবে প্রচার প্রোগ্রাম করা হল, যার ভিত্তিতে জনগণও মনে করতে অনেকটা বাধ্য হল যে স্বর্য মওলানা ভাসানীও চিনের ভূমিকার নিন্দা করেছেন। তার ফলে চিনপছন্দী নানা উপদলের মধ্যে মতান্বেদ দেখা দিল। কেউ মনে করল যে তাদের পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধ করা উচিত এবং ভারত যে সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা পাঠাচ্ছে তাঁদেরও বাধা দেয়া প্রয়োজন। কোন কোন উপদল সুচিহ্নিত এবং সুস্পষ্ট বক্তব্য হাজির করল, বঙ্গলি জাতীয়তাবাদের নামে পাকিস্তানকে ঝংস করে রুশ সংশোধনবাদ এবং ভারতীয় আধিপত্যবাদ কায়েম করেছে, তার বিরুদ্ধে অন্ত তুলে নেয়া তাদের নৈতিক কর্তব্য। চিন-সমর্থক বামপছন্দী উপদলসমূহের সঙ্গে অনেক স্থানে ভারত থেকে আগত মুক্তিযোদ্ধাদের সংঘর্ষও হয়েছে।

যেহেতু চিন সমর্থন করে না বাংলাদেশকে, সেই জন্য বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক পরও চিনপছন্দী নানা উপদল তাদের আদর্শগত অক্ষ আনুগত্যের দরবণ বাংলাদেশের মুক্তিমান অস্তিত্বটি মেনে নিতে পারেনি। জনগণ থেকে তাঁরা এক রকম

বিচ্যুতিই হয়ে পড়েছিল। এই কারণে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যে একটি নতুন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সূচনা হতে যাচ্ছিল, তাতে তারা কোন রকমের অংশগ্রহণই করতে পারেনি। নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব ঘোষণা করার জন্য খুন, ঝথম, হত্যা ইত্যাদি নানা হিংসাত্মক কর্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে তাদের।

শেখ মুজিবুর রহমান রাজাকার আলবদরদের মত তাদেরও রাজনৈতিক অধিকার হরণ করে নিলেন—কাউকে জেলে ভরলেন, কাউকে একেবারে সোজাসুজি হত্যা করলেন। ডার্মান কবি গ্যেটের ফাউন্ট নাটকের নায়ক ফাউন্ট যেমন শয়তানের কাছে আত্মা গচ্ছিত রাখার জন্য অস্থিরভাব মধ্যেই জীবন অভিবাহিত করেছিলেন, অঞ্চলবহুভূত রাজনীতির প্রতি নির্বিচার অক্ষ-আনুগত্যের জন্য আজো চিপপ্টী বলে কথিত অনেকের মানসিক ছিরতা আসেন। মকো-সমর্থকদের তো কথাই গঠে না।

তাবৎ বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভৃতুবিস্তরী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৃহৎ শক্তি। সোভিয়েত রাশিয়া এবং চিনের বিপক্ষে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার ধনতাত্ত্বিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সমর্থনে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশেই সমরানল জুলিয়ে রেখেছে। চিনের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরোধ বাঁধার পূর্বে চিনসহ সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহ নিয়ে ছিল সমাজতাত্ত্বিক শিবির এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেছনে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এবং অন্যান্য ইউরোপীয় ধনতাত্ত্বিক দেশের সমবায়ে গঠিত ছিল ধনতাত্ত্বিক শিবির। সমস্ত পৃথিবীবাপী প্রভৃতুবিস্তারের প্রশংস্য ধনতাত্ত্বিক এবং সমাজতাত্ত্বিক শিবিরের বিরোধ অনেকটা স্পষ্ট, সোজাসুজি এবং জটিলতামুক্ত ছিল। ঐতিহাসিক অংশগতির একটা পর্যায়ে রাশিয়ার ভুক্ষেত্র-প্রশাসন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শাস্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি ঘোষণা করল।

তিতরের ব্যাপার জানার উপায় নেই, এই শাস্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিকে উপলক্ষ করেই সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চিনের মধ্যে বিরোধ বাঁধল। চিন ঘোষণা দিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং সংশোধনবাদের পথে পা বাঢ়িয়েছে। অতএব সোভিয়েতের বিশ্বের সর্বহারার সংগ্রামের নেতৃত্ব দান করার নৈতিক অধিকার নেই। যারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করে, তারা কী করে জগতের নিপীড়িত মানুষের যুক্তির সংগ্রামে নেতৃত্ব দান করতে পারে? এই বিরোধকে কেন্দ্র করেই তাবৎ দুনিয়ার সমাজতাত্ত্বিক শিবির দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। কাগজে পত্রে প্রচার প্রোপগান্ডায় একদল আরেক দলের ভৌঘোষণ কুঠসা করতে থাকল। সমাজতাত্ত্বিক শিবিরে ভাঙ্গন ধরার কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের ম্যাকার্থি এবং বৈদেশিক ম্যাক্সী জন ফট্টোর ডালেস যে নীতি প্রণয়ন করেছিলেন, তা পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৈদেশিক প্রভাব বিস্তারের কর্মকাণ্ডকে সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পরিবর্তে সম্পূর্ণ নতুন একটি আঙিকে বিন্যাস করে নিল। তার ফল দাঁড়াল এই যে চিন কর্তৃক বহু নিষিদ্ধ বহু ধিকৃত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে টেবিল টেনিস কুটীতির মাধ্যমে চিনও রাশিয়ার মত একটি সম্পর্ক গড়ে নিল। এই সম্পর্কের মর্মবস্তু চিন-রাশিয়া উভয়ের

ক্ষেত্রে অনেকটা এরকম: সোভিয়েত রাশিয়া আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং সেই সঙ্গে চিনের প্রভাবকে খর্ব করবে। চিনেরও লক্ষ্য অনেকটা তা-ই—আমেরিকার বিরোধিতা করবে এবং সোভিয়েতের প্রভাব খর্ব করবে। রাশিয়া যেমন চিনের প্রভাব টেকাবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহাবস্থান করতে রাজি, তেমনি চিনও সোভিয়েতের প্রভাব খর্ব করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহাবস্থানে গরবার্জি নয়। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা আলোচনার বেলায় চিন-সোভিয়েত দ্বন্দ্বের এই প্রকৃতিটি বোঝার এবং উপলক্ষ করার প্রয়োজন আছে।

লিয়াকত আলি খানের আমলে পাকিস্তান ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির সঙ্গে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু ভারত সমাজতাত্ত্বিক কিংবা ধনতাত্ত্বিক কোন দেশের সঙ্গে কোন প্রকার চুক্তিতে আবদ্ধ না হয়েই উভয় শিবির থেকে সাহায্য সহযোগিতা আদায় করতে থাকে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওয়াহৰলাল নেহের কেন জেটে না শিয়ে উভয় জেট থেকে সাহায্য সহানুভূতির ব্যাপারে দরকার্যাক্ষীর সুযোগ পেলেন যেমন, তেমনি জেটনিরপেক্ষ দেশসমূহকে একটি আন্তর্জাতিক মোর্চার মধ্যেও নিয়ে এলোন। এতে করে ভারত একদিকে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হল, অন্যদিকে বিশ্বের স্থানোন্নত দেশসমূহের জনগণের কাছে ভারতের মর্যাদাও অনেকগুণ বৃদ্ধি পেল। সামরিক জোটে অংশগ্রহণ করার কারণে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে পর্যন্ত পাকিস্তান সম্পর্কে খারাপ ধারণা জন্ম লিল। কিন্তু হিসাব করে দেখা গেল, পাকিস্তান সামরিক জোটের আওতাভুক্ত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্যের দেশগুলো থেকে যে পরিমাণ সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছে, ভারত পেয়েছে তার চাইতে অনেক গুণ বেশি।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ চলাকালেই সামরিক চুক্তির অসারতা পাকিস্তানি শাসককুলের চোখে স্পষ্টভাবে দৰা পড়ে। অবশ্য তার কিয়ৎকাল পূর্ব থেকেই পাকিস্তানের সঙ্গে উরুয়ান-সহযোগিতার প্রশংস্য একটু মৃদু রকমের অবনিবন্ধন চলছিল। পাকিস্তানি শাসকবর্গ বারবার আবদ্ধার করেছেন, অনুমোগ করেছেন, কখনো কখনো আক্ষেপও করেছেন, পাকিস্তান চুক্তিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভরতকেই অধিক অর্থ সাহায্য দিচ্ছে। এসব কাকুতি মিনতি হোয়াইট হাউসের কর্তাব্যজিদের এক কান দিয়ে চুকেছে, আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

এই মান-অভিমান, অভাব অভিযোগের সময় চিন ভারত এবং ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। যুদ্ধের পরিণতিতে স্থির হয়ে যায় যে ভারতে সোভিয়েত-মার্কিন শক্তি সহাবস্থান করবে এবং পাকিস্তানে চিন-মার্কিন শক্তি সহাবস্থান করবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের মত ভারত-পাকিস্তানও স্থলোন্নত দেশ। দু দেশেরই নিয়াতিত জনগণ, অস্তত তাদের মুখ্য অংশ, সামাজিক ব্যাপক পরিবর্তনে প্রয়াসী। সোভিয়েতে যে সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে, চিন একই রকম পরিবর্তনে আগ্রহী। মুশকিল হল, এই সমস্ত দেশের সমাজগুলো প্রাচীন এবং রাষ্ট্রগুলো নবীন। যারা এই নবীন রাষ্ট্রবাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের বেশির ভাগই মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আগত। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিজেদের ক্ষমতায় অবস্থানের জন্য ধনতাত্ত্বিক দেশসমূহের গলগাহ না হয়ে উপায় থাকে না।

ধনতাত্ত্বিক দেশসমূহ এই শ্রেণীকে কিছু সংক্ষার, কিছু উন্নয়ন সাধন করার মত অর্থ সাহায্য দিয়ে হাতে রাখে যেমন একদিকে, তেমনি অন্যদিকে তাদের বাণিজ্য ও সামাজিক প্রতিস্পর্ধী হিসেবে গড়ে উঠার প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি ও প্রতিরোধ করে। এইভাবে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যবিত্তের অর্থসাহায্য দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের ফলমতা টিকিয়ে রাখছিল। এই উপমহাদেশের নেতৃত্বের মধ্যে তাদের সমর্থকের কথনে অভাব হয়নি। এক মধ্যবিত্ত সরকারের আচার-আচরণ তাদের কাছে অসুবিধাজনক মনে হলে অন্য এক মধ্যবিত্ত সরকারেকে ফসলতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। পাকিস্তানে এমনটি ঘটেছে বারবার। এই পদ্ধতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমস্ত দেশে তার প্রভাব অঙ্গুষ্ঠ রাখে। এই উপমহাদেশেও তার ব্যতায় ঘটেনি।

বাংলাদেশের ব্যাপারটি যখন ঘোরাল হয়ে দেখা দিল তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসকর্গ প্রকৃটিকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছে। প্রথমত, ভারত-পাকিস্তান মিলিয়ে এই উপমহাদেশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সব সময় একলঙ্ঘ ব্রিক হিসেবে দেখেত। এখনে কমিউনিজম ঠেকানোই তার লক্ষ্য। কোন নতুন রাষ্ট্র জন্য নিল কিংবা মারা গেল—তাদের অত মাথাব্যাখার কারণ নেই, যদি না তা তাদের কেন বিশেষ প্রয়োজনে আসে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ। কিন্তু অতীতে এই চুক্তি সঙ্গেও ভারতকে আর্থিক সাহায্য করতে তার আটকায় নি। যতই চুক্তি থাকুক না কেন, ভারতীয় মধ্যশ্রেণীর অসন্তোষের কারণ ঘটে, তেমনি কিছু করতে যুক্তরাষ্ট্র কখনো ইন্সট্রুমেন্ট ছিল না। আবার পাকিস্তানের শাসকশ্রেণীকেও সে একেবারে নিরাশ করেনি। চুক্তির শর্ত অনুসারে কিছু কিছু অন্তর্বরাষ্ট্র করেছে। পাকিস্তান যখন আরো অধিক অন্তর্বে স্মরণ করিয়ে দিতে ভুল করেনি যে পাকিস্তান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী যে চুক্তি তা কমিউনিস্ট শক্তি ঠেকানোর চুক্তি। এ ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপমহাদেশ সংজ্ঞান্ত নীতির ব্যাপারে একটা মৌটামুটি ভারসাম্য রক্ষা করে আসছিল।

মোদা কথায় বাংলাদেশের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দু ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারত। প্রথমত সরাসরি পাকিস্তানের সাহায্যার্থে আসতে পারত। কিন্তু তা করলে তাকে ভারতের শাসকবর্গের অধিকতর বিরাগভাজন হতে হত এবং ভারতের মার্কিন-সমর্থক মধ্যবিত্ত শ্রেণীটির উপর চিরতরে প্রভাব হারাতে হত, এক কথায় ভারত থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে হাত গোটাতে হত। সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে তাদের আতঙ্ক ছিল। ভিয়েনাম যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কারণে দেশে-বিদেশে [তাদের] যে অখ্যাতি বাটেছে, সে বিষয়ে মার্কিন শাসকরা অতিশয় সজাগ ছিলেন। দ্বিতীয়ত বাংলাদেশের পক্ষে অধিকতর, সুস্পষ্ট একটা ভূমিকা পালন করতে পারত। একান্তর সালের পঁচিশে মার্চের পূর্বে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে জেনারেল ফার্ল্ডের এ রকম একটি বোঝাপড়া হয়েছিল জানা যায়।

বাংলাদেশের সপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত সরকারকে শরণার্থীদের প্রতিপালন করার কিছু অর্থসাহায্য দেয়া ছাড়া আর বিশেষ কিছু করেনি। তার কারণ অমেরিকা সামাজিক অবস্থানের দিকে না তাকিয়ে কেন আর্থিক সাহায্য করে না। বাংলাদেশে

সেই শ্রেণীটি ছিল না। বাংলাদেশের যে মধ্যশ্রেণীটি আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দিচ্ছে সেটি ততদিন ভারতবর্ষের, অধিকতর বিশদ করে বলতে গেলে সোভিয়েত রাশিয়ার, ক্রীড়লকে পরিণত হয়েছে বাধ্য হয়ে। তাই এ কথা বলা বোধ করি অসঙ্গত হবে না যে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তানে যে যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারসাম্য রক্ষা করার নীতিই মেনে চলেছে।

বাকি রইল মুসলিম দেশসমূহ। আইয়ুব খান ক্ষমতায় থাকার সময়ই পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার ভিত্তিতে ইরান, তুরস্ক এবং পাকিস্তানের মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতার চুক্তি গড়ে তুলেছিলেন। পারস্পরিক প্রয়োজনে একে অপরকে সামরিক সহযোগিতা দান করবে বলেও তারা প্রতিশ্রূত ছিল। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব থেকেই আর.সি.ডি.-ভৃক্ত দেশসমূহের [পাকিস্তান, ইরান ও তুরস্ক মিলে গঠিত পাশ্চাত্যপর্ষী জেট] সেনাপতি এবং নেতৃবৃন্দ পাকিস্তান সফর করেছেন, সাংবাদিকদের কাছে বক্তব্য রেখেছেন—পাকিস্তানের মত ইসলামি দেশের প্রয়োজনে তারা পাশে এসে দাঁড়াবেন। অনুরূপভাবে পাকিস্তান নেতৃবৃন্দও ঐ সকল দেশ সফর করেছেন। সমগ্র মুসলিম জাহান এবং আরব বিশ্ব পাকিস্তানের পক্ষে রয়েছে, এ কথা পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ দিনে-রাতে প্রচার করতে লাগলেন।

বাংলাদেশের তিন শ্রেণীভুক্ত মানুষকে বিভাস্ত করার জন্য পাকিস্তান তিন ধরনের প্রচারণা চালাতে লাগল। প্রথমত জনসংখ্যার যে অংশটি শুধু ইসলামের স্বার্থের খাতিরেই পাকিস্তানের অব্যুত্পন্ন রাখতে চাইত, তাদের উদ্দেশ্যে প্রচার করত—পাকিস্তানের পেছনে আরব বিশ্ব এবং মুসলিম জনগণ রয়েছে, যে কোন মুহূর্তে ইসলামের স্বার্থে তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারে। যারা সমাজতাত্ত্বিক সমাজব্যবস্থার বিরোধী ছিল তাদের উদ্দেশ্যে প্রচার করত—পাকিস্তানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক চুক্তি রয়েছে, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ভারত মহাসাগরে সগূম নৌবহর হস্ত করে ভেসে উঠবে। যারা ঝুশ-ভারত চক্রের বিরোধী তাদের উদ্দেশ্যে প্রচারযন্ত্রে ফলাও প্রচার করা হল, অতি শিগগিরই পাকিস্তানের মিত্র জনগণতাত্ত্বিক চিন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে। সকলের মধ্যে এমন একটি আশা ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল যে পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষা করতে তিন মিত্র একই সঙ্গে ছুটে আসছে। কিন্তু ইরান কিংবা তুর্কিদেশের কেন সিপাহসালার ইসলামের খাতিরেও পাকিস্তানের রণক্ষেত্রে শাহাদত বরণ করলেন না। ভারত মহাসাগরের সগূম নৌবহরের টিকিটও দেখা দিল না। কারাকোরাম সড়ক বেয়ে চিনের ড্রাগনের মত অপরাজেয় এবং দুর্ধর্ষ চিনা মিলিশিয়া দেখা দিল না। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী লজ্জাজনকভাবে পরাজিত হল।

কার যুদ্ধ কে করে? মুসলিমান কিংবা কমিউনিস্ট সকলকেই নিজের লড়াই নিজেকে করতে হয়। পাকিস্তানটি ভেঙে গেল।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর সরাসরি হস্তক্ষেপের ফলে বাংলাদেশ পাকিস্তানি সৈন্যের ক্ষমতা হয় এবং স্বাধীনতা লাভ করে। যুদ্ধের স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ যে সকল দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়, তার মূল নিহিত ছিল রাজনৈতিক দলটির অভ্যন্তরেই। উনিশশ একান্তর সালের পূর্বে পর্যন্ত এই দলের রাজনৈতিক দলফুল আদায় করা। আওয়ামী লীগের মুখ্য অংশ ধনতাত্ত্বিক রাষ্ট্রীয়দলের সমর্থক ছিল। এই আদর্শগত বৈপরীত্যের কারণেই তারা মক্ষেপস্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সঙ্গে কোন রকম একমত্যে গোছাতে পারেন। উনিশশ একান্তর সালে প্রধানত আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের নির্দেশমাফিক রচিত আন্দোলন এবং প্রচারণার ফলে গোটা বাংলাদেশের জাতিসভাটি যখন জেগে উঠেছে, দেখা গেল পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে তাকে আর ধারণ করা সম্ভব নয়, তখনই আওয়ামী লীগ অন্য কোন বিকল্প না দেখে তা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। অর্থাৎ ছয়দফা দাবির উল্লাঘণ্টন করে যখন জনগণের দাবির স্বাধীনতার ক্ষেত্রে উত্তরণ ঘটেছে, দলীয় নেতৃত্ব অটুট রাখার জন্য তা মেনে নেয় ছাড়া গত্যুষের বইল না।

কিন্তু শুরু থেকেই আওয়ামী লীগের আন্দোলন ছিল স্বায়ত্ত্বাসন্ত্বিক। বাংলাদেশের মধ্যশ্রেণীভুক্ত লোকরা এ কারণেই আওয়ামী লীগের পেছনে জড় হয়েছিল। তারা ভেবেছিল, আওয়ামী লীগকে সমর্থন দিয়ে ছয়দফা সঞ্চালনে বিজয়ী করতে পারলে পাকিস্তানি নেতৃত্বশীর্ষের প্রতাবমুক্ত একটি নতুন নেতৃত্বশীর্ষের উন্নয়ন ঘটার সময় সম্ভবনা রয়েছে। সতরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের টিকিটে যে সকল প্রার্থী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁদের মুখ্য অংশ ছিলেন হয় নতুন উন্নয়নিত রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষায় প্রেরুক একেবারে নবাগত নবগঠিত মধ্যবিত্তশীর্ষী, যাঁরা সুযোগ সুবিধাপ্রত্যাশী অন্যান্য রাজনৈতিক দলত্যাগী। তাঁরাই ছিলেন আওয়ামী লীগের মূল সিদ্ধান্তপ্রণেতা। উনিশশ পঁয়ষষ্ঠির পূর্বে যারা আওয়ামী লীগ করত এবং পরে যারা আওয়ামী-লীগার হয়েছিল, দুই ধরনের আওয়ামী লীগের মধ্যে চিন্তা চেতনার আকাশ-পাতাল ফারাক বর্তমান।

এই দুই শ্রেণীভুক্ত লোক ছাড়া জনসংখ্যার তৃতীয় একটি বিশাল অংশ আওয়ামী লীগের প্রতাকাত্মনে সমর্পিত হয়েছিলেন। তাঁদের অধিকাংশই ছিল ছাত্র এবং তরুণ। বামপন্থী সংগঠনগুলো যদি সঠিক পদ্ধতিতে বাঙালির রাজনৈতিক গন্তব্যাটি স্পষ্ট করে তুলতে পারত, শুরু থেকে তাঁদের অধিকাংশ সেদিকেই বুঁকে পরতেন। তাঁরা চিন্তা ধারণায় ছিল আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তুলনায় অনেক অগ্রসর। তাঁরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা তো অতিশয় কৃষ্ণাখণ্ডভাবে দাবি করতেনই, সঙ্গে সঙ্গে এও দাবি করতেন যে এই অঞ্চলে একটি সমাজতাত্ত্বিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আওয়ামী লীগের ছয়দফা আন্দোলনের প্রাণস্পন্দন এঁরাই যুগিয়েছিলেন। সুতরাং আওয়ামী

লীগের মূল নেতৃত্বকে এদের উপরই ভরসা করতে হত। তাই এরা স্বাধীনতা এবং সমাজতন্ত্রের দাবি উথাপন করলেও সরাসরি বিবেচিতা করে এঁদের চটিয়ে দিতে সাহসী হতে পারেন। এসব কারণেও স্বাধীনতা এবং সমাজতন্ত্রের দাবিটি বাংলাদেশের ভেতর থেকে ফুরিত হয়ে সংগ্রামের ঠিক অঞ্চলাগে না হলেও একপাশে স্থান করে নিতে পেরেছে।

আওয়ামী লীগের মূল নেতৃত্ব যে অংশের উপর অর্পিত ছিল তাঁরা স্বাধীনসার্বভৌম সমাজতাত্ত্বিক বাংলাদেশ নয়, ভৌগোলিক সীমাবেষ্টার চৌহদিতে মধ্যে গণতাত্ত্বিক একটি স্বাধীন বাংলাদেশেরও কল্পনা করতে পেরেছিলেন, এ কথা মনে করার কোন উপায় নেই। সত্য বটে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগার দফা দাবির প্রতি উভাল মুহূর্তে মৌখিক সমর্থন জানিয়েছিলেন, কিন্তু আওয়ামী লীগের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক রংপুরেখার মধ্যে স্বায়ত্ত্বাসনের দাবির অতিরিক্ত স্বাধীন রাষ্ট্রের কোন পরিকল্পনা সেই সময় অনুপস্থিত ছিল।

পঁচিশে মার্চ তারিখের পর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে যখন ভারতে চলে গেলেন, ভারত সরকার বাংলাদেশের সংগ্রামটি পরিচালনার ভার স্থান্ত্রে এহণ করল এবং পেছনে সোভিয়েত রাশিয়া এসে জুটল। এই যুদ্ধে জনগণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার জন্য 'স্বাধীনতা' এবং 'সমাজতন্ত্র' শব্দ দুটি আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকে স্পষ্ট ভাষ্যায় উচ্চারণ করতে হল। দেশের স্বাধীনতা অর্জন এবং সমাজতাত্ত্বিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য দলে ছাত্র যুবক সীমাত্ত পেরিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য ভারতে গমন করেন। ভারতে অবস্থানকালেও আওয়ামী লীগের মূল নেতৃত্ব এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-তরুণদের দুই রকমের চিন্তা, দুই রকমের জীবনদৃষ্টি স্পষ্টত লক্ষ্যগোচর ছিল।

উনিশশ একান্তর সালের ডিসেম্বর পরবর্তী সময় অনেকটা ভারতীয় সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের প্রশাসনের দায়িত্ব বুঝে নেয়ার পর এই নতুন ক্ষমতা দিয়ে কী করবে তা নিয়ে মন্ত ফাঁপড়ে পড়ে গেল। অর্থনৈতিক পদ্ধতি যে কোন রাষ্ট্রের হৃৎপিণ্ডস্বরূপ। মারাত্মকভাবে যুদ্ধবিধ্বন্ত এবং অর্থনৈতিক অন্তর্দাহে জর্জরিত বাংলাদেশে অবিলম্বে একটি অর্থিক পদ্ধতির সূচনা করে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ শুরু করা আশ প্রয়োজন। কিন্তু কোন অর্থনৈতিক পদ্ধতিটি তাঁরা চানু করবেন? যুদ্ধ চলাকালীন তাঁরা ধনতাত্ত্বিক এবং সমাজতাত্ত্বিক দুই ধরনের অর্থনৈতিক বিনির্মাণেরই প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। যদি তাঁরা বলেন যে বাংলাদেশে ধনতাত্ত্বিক অর্থনৈতিক দেশটি এগিয়ে আসবে? পশ্চিমা ধনতাত্ত্বিক দেশসমূহ আর্থিক সাহায্য দিয়েও থাকে, কিন্তু তাঁদের রাজনৈতিক স্বার্থটি ও ভালভাবে হাসিল করে নেয়। যদি

অন্যদিকে ভারত রাশিয়ার সঙ্গে নানাবিধ গাঁটিছড়ায় আবদ্ধ। তাঁদের প্রত্যক্ষ প্রতাবধীন বাংলাদেশের আর্থিক পুনর্গঠনে সহায্য প্রদান করতে পশ্চিমের কোন ধনতাত্ত্বিক দেশটি এগিয়ে আসবে? পশ্চিমা ধনতাত্ত্বিক দেশসমূহ আর্থিক সাহায্য দিয়েও থাকে, কিন্তু তাঁদের রাজনৈতিক স্বার্থটি ও ভালভাবে হাসিল করে নেয়। যদি

তাঁরা বলেন, সমাজতাত্ত্বিক অর্থনৈতিক পদ্ধতি চালু করবেন, তাহলে তাঁদের নিজেদের পায়ের তলার মাটি সরে যায়। ধরতাই রুলি হিসেবে শৰ্কটি উচ্চারণ করতে বাধ্য হলেও মনেয়াগে তাঁরা সমাজতন্ত্রের প্রতি নিবেদিত ছিলেন না।

অধিকষ্ট তাঁদের সামাজিক রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল ধনতাত্ত্বিক। সেই অনুসারে দলীয় কর্মদের আশা আকাঙ্ক্ষা, চিঠা চেতনাকে ঝপ দিয়েছেন। তাঁরা আওয়ামী লীগের পেছনে জড় হয়েছিলেন শ্রেণীগত লোক লালসা চিরতার্থ করার জন্য। এই বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি অর্থনৈতিকভাবে সুগঠিত হয়ে উঠতে পারেনি বলেই যেমন সুস্পষ্টভাবে স্বাধীনতার ঘোষা দিতে পারেনি, তেমনি দেশের অভ্যন্তরে এবং বৈদেশিক নীতির ফেরেও ধনতন্ত্র কিংবা সমাজতন্ত্র কোন একটি শক্তির সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি। ধরে নেয়া যেতে পারে পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহ যেভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বে যে ধরনের সমাজতাত্ত্বিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছে, এখানেও তাঁরা সোভিয়েত অনুরাগী দলগুলোর দৌলতে তাঁদের মাধ্যমে সেই ধরনের সমাজতাত্ত্বিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চেয়েছিল। সেক্ষেত্রে অন্য প্রশ্ন ওঠে। ভারতীয় ধনিক বণিক শ্রেণী বাংলাদেশে তাঁদের একটা বাজার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে দেখে সংগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল এবং জাতীয় কংগ্রেস সরকার ছিল তাঁদেরই সরকার। আর সোভিয়েত রাশিয়া চাইত ভারতের মাধ্যমে বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে। ভারতীয় শাসকদের চাঁচিয়ে বাংলাদেশে তাঁদের স্বার্থের পরিপন্থী কিছু করতে চাইলে নিশ্চয়ই তাঁরা সহ্য করত না।

এ রকম অনিচ্ছয়া এবং দোদুল্যমানতার মধ্যে আওয়ামী লীগাদের দীর্ঘদিন কাটিয়ে দিতে হয়। এই সময় তাঁদের লোক লালসার প্রতি গুটিবসন্তের জীবাশুর মত ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে। অবাঙালিদের ঘরবাড়ি দখল, দোকান-ব্যবসা আন্দুনিৎ এবং যে সকল লোক মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন দখলদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করেছে তাঁদের ধন সম্পদ দুর্ভীরাজ করাই আওয়ামী লীগের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের পেশা হয়ে দাঁড়াল।

তাঁরা লুটপট এবং ব্যক্তিগত সংরয়ে এত তনায় এবং নিবিট ছিল যে এরই মধ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পরিত্যক্ত অস্ত্রপত্তি, কলকারখানার নাম যত্নাংশ, মিলের মজুত সামঞ্জসী ভারতে পাচার করে দিতে সক্ষম হয়েছে। এই সময় পাকিস্তানের কাবাগার থেকে যুক্তি পেয়ে শেখ যুক্তিযুক্ত রহমান বাংলাদেশে এলেন। তাঁর বড় বড় হৃষ্কার দেয়া ছাড়া করারও কিছু ছিল না। যে রাজনৈতিক দলটির তিনি সর্বাধিনায়ক সেই দলটির ধরণগা তাঁরা যুক্ত করে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছে। আপাতত দেশে কোন অর্থনৈতিক পদ্ধতি চালু করতে অপারগ হওয়ায়, তাঁরা মনের আনন্দে লুটপাটের ব্যবসাটি চালিয়ে যাচ্ছে এবং পাকিস্তানের শক্তি সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ মাড়োয়ারিদের কাছে বেঁচে দু পঞ্চাশ কামাই করছেন। এই কর্মের সঙ্গে কর্মী এবং নেতা এত অধিক হারে জড়িত ছিল যে দলীয় কোন শৃঙ্খলা প্রয়োগ করে তাঁর পক্ষে বাশ টেনে ধরা অসম্ভব ছিল। বরং ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক এই পক্ষিল আবর্তে মিগতিত হয়ে তিনি নিজেও খেই হারিয়ে এই কর্মকাণ্ডের অংশীদার হয়ে উঠেছিলেন।

বাংলাদেশের শিল্পপাদন ব্যবস্থাটির সিংহভাগ ছিল অবাঙালি পশ্চিম পাকিস্তানি শিল্পপতিদের পরিচালনাধীন। যুক্তশ্বের পূর্বাহ্নে শিল্পমালিকরা পশ্চিম পাকিস্তানে পলায়ন করেন এবং এই সকল কলকারখানা পরিচালনার দায়িত্ব সরকারকেই দ্রহণ করতে হয়। আওয়ামী লীগ সরকার নিজ দলীয় লোকদের এই সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠানে প্রশাসক নিয়োগ করে তাঁদের হাতে শিল্পকারখানার প্রশাসন ভার হেঢ়ে দেয়। তাঁদের না ছিল দক্ষতা, না ছিল অভিজ্ঞতা। সুতৰাং তাঁদের পক্ষে যে কাজটি করা প্রত্যাবৃত্ত যুক্তিসঙ্গত তা-ই তাঁরা করেছেন—যন্ত্রাংশ এবং মজুত দ্রুব সামঞ্জসী, উপচার-উপকরণ সমর্মাদের সহযোগিতায় পাচার করে দিয়েছেন।

এই অসংকরের ফলে মিলগুলোর উৎপাদন অনেকটা বদ্দ হয়ে যাওয়ার উপক্রম দেখা দিল। কারখানায় কোন উৎপাদন নেই অথবা ব্যাক থেকে আগাম টাকা খণ্ড নিয়ে শ্রমিকদের মাঝে পুরিয়ে দিতে হল। যেহেতু কলকারখানায় কোন কাজ নেই তাই আওয়ামী লীগ দলের অনুসারী শ্রমিক-নেতৃত্ব শ্রমিকদের দিয়ে আওয়ামী লীগ দলীয় নেতা উপনেতাদের সংবর্ধনার আয়োজন করতে থাকলেন। বিশেষ দল যাতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে সেজন্য শ্রমিকদের সর্বক্ষণ নিয়োজিত রাখলেন। এইভাবে উৎপাদনের পরিবেশ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে ফেলা হল। সরকার-সমর্থক শ্রমিক নেতাদের উৎপাতে সরকারি শিল্প-কারখানার সঙ্গে ব্যক্তি মালিকানাধীন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর পণ্ড্যাংপাদনও শূন্যের বোঠায় এসে দাঁড়াল। উৎপাদনের এই নৈরাজ্য দেশের জনজীবনের সর্বস্বত্ত্বে সংযোগিত হতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়নি।

বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের জনগণের তরফ থেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবনধারা পুনর্নির্মাণের জন্য রাষ্ট্রীয় এবং মানবিক কারণে যে অভেল সাহায্য এসেছিল, তাঁর সিকিউরিটি ও উপন্যস্ত মানবদের হাতে পৌঁছেতে পারেনি। রাষ্ট্রশক্তির সহযোগিতা এবং সহায়তায় অতি-আওয়ামী মানুষগুলোই সব কাবার করে দিয়েছিল। একশ্রেণীর মানুষের দ্রুত ধনী হওয়ার লোভ এত অধিক শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে কোন কিছুই তাঁর প্রতিরোধ করতে পারেনি। কোন রকম প্রতিবক্তক রচনা করার কথা দূরে থাকুক, রাষ্ট্রশক্তি নিজে অধীনী হয়েই তাঁদের সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছে। অন্যান্য দেশে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় ধনিক শ্রেণী গড়ে উঠেছে, কিন্তু তাঁরা সমাজকেও কলকারখানা, শিল্প বাণিজ্য নাম দিক দিয়ে ধনী হিসেবে গড়ে তুলেছে। রাষ্ট্র এবং সমাজকে একেবারে দরিদ্র-দিগন্বর রেখে একা একটি শ্রেণী অনর্জিত অর্থে ধনী হতে চেষ্টা করলে সমাজ জীবনে যে বিষয়িয়া হয়, বাংলাদেশ তা প্রত্যক্ষ করেছে।

উৎপাদনের নৈরাজ্য সামাজিক নৈরাজ্যকে হাজার গুণে বড়িয়ে দিয়েছিল। এই নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়েছিল সমাজের রক্তে রক্তে। নৈরাজ্য যখন একটি সমাজকে পুরোপুরি শাসন করে, স্বাভাবিক নিয়মানুসূর্যে নৈরাজ্যের সব চাইতে বড় এজেন্ট হয়ে বসতে হয় ক্ষমতাসীন ললকেই। আওয়ামী লীগকেও তা হতে হয়েছিল। যে সকল তরুণ দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা দেশপ্রেমে উদ্বৃক্ষ হয়ে স্বাধীনতা সংহারে অংশগ্রহণ করেছিলেন

তাঁরা—এই সকল সংবেদনশীল তরঙ্গ—দেখলেন বাংলাদেশে তাঁরা রকম দিয়ে, আত্মাগোপন মাধ্যমে স্বার্থপর সুবিধাভোগীদের স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। এরা এতই নেতৃত্বাতোধি বিবর্জিত যে গোলায় আগুন দিয়ে খই খেতেও তাদের আটকায় না। দেখে তরুণদের হতাশার সীমা রইল না। তাঁরা ভয়কর রকম দমে গেলেন। আবার অন্যদিকে কতিপয় উচ্ছুল তরঙ্গ মুক্তিযোদ্ধা নাম ভাঙিয়ে লুটতরাজ এবং রাহজানিব আশ্রয় এইগ কৰল। নির্মম বেকারত, অভাব এবং দ্রব্যমূলোর ক্রমাগত উর্ধ্বগতিতে কেউ কেউ একেবারে মুহূর্দে পড়লেন। সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সবল দুর্বলের গলায় পা দিয়ে নিজের প্রবল অস্তিত্ব ঘোষণা কৰল। সামাজিক মূল্য চেতনা খুলায় গড়াগড়ি দিতে থাকল এবং নতুন কোন মূল্য চেতনা উন্মুক্তের লক্ষণও দেখা গেল না।

পাকিস্তানি দৈনন্দিন সশস্ত্র অত্যাচারের মুখে যাদের ঘৰবাড়ি, কাৰবাৰ তেজাৱাতি ছেড়ে দিয়ে ভাৰতে আশ্রয় গ্ৰহণ কৰতে হয়েছিল তাদের মুখ্য অংশ ছিল সংখ্যালঘু জনসাধাৰণ। পাকিস্তানি শাসকৰা কেন তাদের অমন নৃশংসভাৰে ভাৰতে মেতে বাধা কৰেছিল সে সম্বন্ধে একটু আগোকপাত কৰা হয়েছে। সংখ্যালঘু—ওধু এই অপৰাধজনিত কাৰণে তাদের এই বাঢ়তি অত্যাচার নিৰ্যাতনেৰ শিকার হতে হয়েছিল। ভাৰত সৱকাৰ পৰিচালিত আশ্রয়-শিৰিৱেৰ অৰ্বনীয় অবস্থার মধ্যে জীৱন অতিবাহিত কৰতে হয়েছে তাদেৰ। তাঁৰা আশা কৰেছিল বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তাদেৰ আৰ কোন দুঃখ দুর্দশা থাকবে না। পাকিস্তানে তাদেৰ সঙ্গে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৱিক হিসেবে ব্যৱহাৰ কৰা হত। কিন্তু স্বাধীন ধৰ্মনিৰপেক্ষ বাংলাদেশে ধৰ্মীয় কাৰণে তাদেৰ আৰ নিগৃহীত হতে হবে না।

কিন্তু তাঁৰা ফিরে এসে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম একটি পৰিস্থিতিৰ সম্মুখীন হল। তাদেৰ ঘৰবাড়ি, ব্যবসাপত্ৰ, পুঁজিপত্ৰি আৰ কিছুই অৰবশিষ্ট নেই। পাকিস্তানি শাসকৰা বাদবাকিদেৰ বুৰুয়োছিল যারা চলে গেছে, তাদেৰ কেউ ফিরে আসতে পাৰবে না। তাদেৰ স্থাবৰ সম্পদ মুসলমান জনসাধাৰণেৰ হাতে এনে দিয়ে তাদেৰ দাবিৰ কথাপিতৃত থাই মিটাবাৰ জন্য ইয়াহিয়া খান তাদেৰ বলপূৰ্বক বিতান্তনেৰ ব্যবস্থা কৰেছিলেন। তাদেৰ সম্প্ৰদায় হিসেবে চলে যেতে হয়েছিল এবং সম্প্ৰদায় হিসেবেই ফিরে আসতে হল। তাদেৰ পুনৰ্বাসনেৰ কোন পথ রইল না। সৱকাৰ কিংবা অন্য কেউ তাদেৰ সাহায্য সহায়তা দেয়াৰ জন্য বিশেষ এগিয়ে এল না।

তদুপৰি তাদেৰ অধিকাংশ এই বোধ দিয়ে ফিরে এসেছে যে বিগত পঁচিশ বছৰ তাঁৰা যে রকম দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৱিক হিসেবে পৰিগণিত হয়ে আসছিল, এখন তাদেৰ অবস্থা সে রকম নহয়। তাঁৰা দুর্বল সম্প্ৰদায় হলেও সৰ্বক্ষেত্রে প্ৰবল সম্প্ৰদায়েৰ লোকদেৰ মত সমান সমান তাদেৰ অধিকাৰ। কিন্তু প্ৰবল সম্প্ৰদায়েৰ লোকেৰা আওয়ামী লীগেৰ আন্দোলনে এই কাৰণে সমৰ্থন দিয়েছিল যে আওয়ামী লীগ তাদেৰ বোৰাতে পেৰেছিল যে আওয়ামী লীগেৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষতা নীতি মেনে নিয়ে তাদেৰ প্ৰতি সমৰ্থন জ্ঞাপন কৰে পশ্চিমাদেৰ তাড়াতে পাৱলে তাঁৰা সুখে শান্তিতে থাকতে পাৰবে। একইভাৱে সুখ শান্তিৰ লোভ দেখিয়ে একবাৰ নওয়াব সলিমুল্লাহ বাংলাকে বিভক্ত কৰেছিলেন। একবাৰ ফজলুল হক হিন্দু মহাজনদেৰ বিৰুক্তে ফেপিয়ে মুসলমান

প্ৰজাৰ। তোট আদায় কৰেছিলেন। একবাৰ জিম্মাহ সাহেব পাকিস্তান প্ৰতিষ্ঠা কৰেছিলেন। একবাৰ যুক্তফুন্ট একুশ দফাৰ দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। একবাৰ ভাসানী 'জুলাও-পোড়াও' অভিযানে নামিয়ে দিয়েছিলেন। একবাৰ শেখ সাহেব ধৰ্মনিৰপেক্ষ বাংলাদেশেৰ ডাক দিয়ে পাগল কৰেছিলেন। মূলত সলিমুল্লাহৰ বাংলাভিভাগ, হক সাহেবেৰ জমিদার-মহাজনবিৰোধী আন্দোলন, জিম্মাহৰ সাম্প্ৰদায়িক পাকিস্তান আন্দোলন, যুক্তফুন্টেৰ একুশ দফা আন্দোলন এবং শেখ মুজিবুৰ রহমানৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ আন্দোলন—সব তাঁৰ একেক পৰ্যায়ে সমৰ্থন কৰেছিল। কাৰণ তাদেৰ বিশ্বাস কৰাবো হয়েছিল প্ৰতিটি পৰ্যায়ে যুক্তবাংলাৰ আন্দোলন, পাকিস্তান আন্দোলন, স্বায়ত্ত্বাসনেৰ আন্দোলন, ধৰ্মনিৰপেক্ষ স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলন সমৰ্থন কৰলে তাদেৰ দুঃখ দুর্দশাৰ অবসান ঘটবৈ।

স্বার সলিমুল্লাহ, ফজলুল হক, মুহুমদ আলি জিম্মাহ এবং একুশ দফাৰ এই আন্দোলনেৰ মধ্যে কোনটা ছিল ধৰ্মনিৰপেক্ষ, কোনটা ছিল ধৰ্মভিত্তিক, কোনটা স্বায়ত্ত্বাসনেৰ। তাঁৰা সে আন্দোলনসমূহ সমৰ্থন কৰেছিল। কাৰণ তাদেৰ বোৰাবো হয়েছিল, তা কৰলে দাবিৰেৰ অবসান ঘটবৈ। শেখ মুজিবুৰ রহমানৰ পশ্চিমা তাড়ানোৰ আন্দোলনেৰ সৰ্বাস্তংশকৰণে অংশ নিয়েছিল, তাও এজন্য যে তাদেৰ বোৰাবো হয়েছিল, যদি তাঁৰা সংখ্যালঘু জনগণেৰ সঙ্গে মিলেমিশে পশ্চিমাদেৰ বিভাগিত কৰতে পাৰে, তাহলে অতিশয় লাভবান হবে। তাঁৰা খেতে পৰতে পাৰবৈ। অধিকতৰ সুখে শান্তিতে জীৱন অতিবাহিত কৰতে পাৰবৈ।

কিন্তু বাংলাদেশ প্ৰতিষ্ঠিত হওয়াৰ পৰ তাঁৰ বিপৰীত অভিজ্ঞতাৰ সম্মুখীন হল। সাবা দেশেৰ পৰিস্থিতি সামঞ্জিকভাৱে পূৰ্বেৰ তুলনায় অনেকগুণ খারাপ হয়ে গেল। সবচেয়ে সত্য কথা, তিন চার বছৰেৰ মধ্যে একেবাবে সাধাৰণ অবস্থাৰ মধ্য থেকে যে শাসক নেতৃত্বশৈৰ্ষীটি আওয়ামী লীগেৰ রাজনৈতিক দৌলতে দুধেৰ সৱেৰ মত ভেসে উঠেছিল, জনগণেৰ দুঃখ এবং কষ্টভোগেৰ প্ৰতি তাঁদেৰ কোন সহানুভূতি নেই। তাঁৰা বাংলাদেশেৰ জনগণেৰ সম্পদ ভাৰতে পাচাৰ কৰে দিয়ে ভাৰতীয় পুঁজিপতিৰ যোগসাজশে দেশেৰ মানুষেৰ দাবিৰ বাড়িয়ে তুলেছে—এ কথা সাধাৰণে ব্যাপকভাৱে প্ৰচাৰিত হয়ে পড়ল। জনগণ সদস্ত কাৰণেই বিশ্বাস কৰে বসল যে ভাৰতই তাদেৰ যাৰতীয় দুৰ্দশাৰ মূল কাৰণ। ভাৰতে জিনিসপত্ৰ পাচাৰ হয়ে যাচ্ছে, সে জন্য তাদেৰ এই ভোগাতি। আওয়ামী লীগেৰ নেতা এবং কৰ্মীবৰ্ন্দ যদি জনগণেৰ দুঃখ কষ্টে অংশগ্ৰহণ কৰতেন এবং শ্ৰদ্ধাৰ্ভ কৰতেন, তাঁদেৰ ভিন্ন বকম মনোভাৱেৰ উদয় হত। যুক্তবিধৰ্ম স্বাধীন বাংলাদেশেৰ অভাৱ, দুৰ্ভিক্ষ, প্ৰবলেৰ উৎপীড়ন—সবকিছুৰ জন্যাই জনগণেৰ মুখ্য অংশ ভাৰতকে দোষাবোগ কৰতে থাকল। ভাৰত হিন্দুপ্ৰধান দেশ, অনেক সাম্প্ৰদায়িক দল এই সুযোগে হিন্দুত্ব এবং ভাৰতীয়তাকে একবাৰে প্ৰকাশ্যে জনগণেৰ সামনে তুলে ধৰল।

বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো সমানে আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগেৰ দুই সহযোগী মক্ষোপস্থী ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টিৰ প্ৰতি এবং তাঁৰা যে শক্তিৰ সাহায্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে সেই ভাৰত এবং সোভিয়েত রাশিয়াৰ বিৰুক্তে প্ৰচাৰণা

চালিয়ে যেতে থাকে। সেভিয়েত রাশিয়া অনেক দূরের দেশ, সুতরাং বিদেষটা একা ভারতের উপরই পড়ল। মাঝেপছী দল দুটোতে এবং আওয়ামী লীগে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব অধিক। কিন্তু ধর্মীয়-রাজনৈতিক সংগঠনসমূহের প্রকাশ্য রাজনৈতিক কাজকর্মের অধিকার ছিল না। তাই তারা গোপনে বৃদ্ধি অশিক্ষিত জনগণকে এক রকম বিশ্বাসই করিয়ে ফেলল যে শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার সহকারী দল দুটো সাম্প্রদায়িকতার অঙ্গুহাতে দিন দিন ধর্মের সর্বনাশের পথটি প্রশংস্ক করে চলেছে।

এই ধরনের পরিহিতিতে যে কোন ভাল পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও জনমনে তার খারাপ প্রতিক্রিয়া হয়। বামপছী রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ সে সময় একটা কঠিন নৈতিক সংকটে নিপত্তি হয়েছিল। যেহেতু বাংলাদেশের জন্মপ্রক্রিয়ার সঙ্গে তাদের বেশির ভাগই কোন ফলপথ অংশগ্রহণ করতে পারেনি এবং জনগণকে তাদের পেছনে সংগঠিত হওয়ার ডাক দিয়ে আওয়ামী লীগকে চ্যালেঞ্জ করার মানসিক নিষ্ঠতা অনেকেরই ছিল না, তাই বেশ কঠি উপদলই কৌশল হিসেবে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা উসকে ভারত এবং ভারতমুখী রাজনৈতিক দল তিনটিকে অধিয় করার চেষ্টায় মেঠে রাইল। মণ্ডলান আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রকাশিত হক কথা এবং অন্যান্য পত্রপত্রিকা জনগণের ভারত-বিরোধিতা এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবেরই পরিপোষণ করেছে।

আওয়ামী লীগ এবং অন্য দল দুটোর এর বিরক্তে করাব কিছুই ছিল না। ইংরেজি 'স্কেল্টনরিজন' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ যদি 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ধরে নেওয়া হয়, আওয়ামী লীগ দলটি অথবাথেকেই ধর্মীয় ভাববাস্পের অত্তরাল থেকে জনগণের মন মানসিকতাকে পরিচ্ছয় করার উদ্দেশ্যে কোন কর্মসূচি গ্রহণ করেনি। ফলে আওয়ামী লীগের যৌথিক কর্মকাণ্ড অসাম্প্রদায়িক হলেও তাকে চিক সাম্প্রদায়িকতামূলক রাজনৈতিক সংগঠন বলার উপায় নেই কিছুতেই। বরং বলা যায় সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগের গর্ভ থেকেই আওয়ামী লীগের উত্তর। আর আওয়ামী লীগের সহযোগী দল দুটিতে সংখ্যালঘু জনগণের প্রতিনিধি অধিক ছিল এবং তারাও ছিল ভারত-রাশিয়ার খণ্ডের খাঁ। আওয়ামী লীগের যাবতীয় অপকর্মের সমালোচকদের 'চিন-পাকিস্তানের এজেন্ট' বলে তারা গলা ঢেকিয়ে বেড়াত। প্রকৃত সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির গোড়ায় আধাত দেওয়ার মত কোন কর্মসূচি তাদের পক্ষেও গ্রহণ করা একরকম অসম্ভব ছিল।

তাদের সে উপায়ও ছিল না। সাধারণ মুসলিম জনগণের চোখে এই দল দুটি বিশেষ কোন আস্তা কেন্দ্রিত অর্জন করতে পারেনি। ফল হয়েছে এই—আওয়ামী লীগসহ দল দুটো অসাম্প্রদায়িকতা প্রচার করতে দিয়ে সাম্প্রদায়িকতাকে জাগিয়ে তুলেছে, নিয়ন্ত্রণ ধর্মীয় দলগুলো সরাসরি সাম্প্রদায়িকতার উসকানি দিয়েছে এবং কোন কোন বামপছী উপদল ভারতের আগ্রাসী মনোভাব টেকানো আর ক্ষয়তাসীল শক্তিকে অধিয় করার জন্য ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রতাপ বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। তদুপরি অনেক মুসলিম-লীগের এবং সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি যুক্তের পর

নিজেদের ধনপ্রাপ এবং সামাজিক নিরাপত্তার জন্য টাকা-পয়সা দিয়ে আওয়ামী লীগে চুকে পড়ে। এই কারণে অযোগ্যতাবে আওয়ামী-লীগারদেরও সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ডে অল্পবিত্তন জড়িত হতে হয়েছে।

যুদ্ধের পর নানা সম্প্রদায় মিলেমিশে এখানে একটি ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তার বেসু বিকাশক্ষেত্র রচিত হওয়ার কথা ছিল, তার সঠিক সৃচনাটিও হতে পারেনি। আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিদ্বে এবং বিনেদরেখা না করে আরো স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি সর্বস্বাত্ত। তারা আশা করেছিল যে স্বাধীনতার পর তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের হাতে নিঃস্থান হবে না। সব ব্যাপারে সমান সমান সুযোগ সুবিধা লাভ করবে।

কিন্তু স্বাধীনতার পর দেখা গেল, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনোভাব অনেক বেশি বিধিয়ে গেছে। তারা তাদের দিকে অধিকতর সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাতে আরম্ভ করেছে। যুদ্ধের সময় তারা ভারতে চলে গিয়েছিল, তাদের ঘরবাড়ি সবকিছু সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকদের হাতে পড়েছে। সেগুলো দাবি করাতে অধিকতর তিক্ততার সূষ্টি হল। ভারত ছিল। তারা প্রাণ বাঁচাতে পেরেছে, ভারত সরকার নয় মাস তাদের খাইয়ে পড়িয়ে রেখেছিল, ভারতীয় সেনাবাহিনীর সরাসরি হস্তক্ষেপে তারা দেশে ফিরে আসতে পেরেছে এবং এত কষ্ট ভোগ করেও তাদের দশা গুর্বের চাইতে ভাল নয়, বরং অনেক গুণে খারাপ। এই অবস্থায় তাদের একটি মুখ্য অংশের ভারতমুখী হয়ে পড়া খুবই স্বাভাবিক। যে সমস্ত রাজনৈতিক দল ভারতকে সমর্থন করত তাদের প্রতি অঙ্গ-সমর্থন দিয়ে চিকিরে রাখাকেই তারা মনে করত নিরাপত্তার সর্বোত্তম গ্যারান্টি।

৯

আওয়ামী লীগ শাসনভাব হাতে নিয়েই ধর্মীয় রাজনৈতিক দল নিয়ন্ত্রণ যোগায় করেছিল। পেছনে জনসমর্থনও ছিল তাদের। ধর্মীয় দল এবং আরো কঠি রাজনৈতিক দল যুক্ত চলাকালীন দখলদার পাকিস্তানি সৈন্যের সহায়তা করেছিল। আরো গোড়া থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিরক্তিতাই ছিল তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য। যুদ্ধের অব্যবহিত পর মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার কোন উপায় বইল না তাদের। মন-মানসের সেই নৈতিক পরিচ্ছন্নতা থাকলে অঞ্চ হয়েও প্রবল শক্তির বিরক্তে নিজের অতিভু প্রমাণ করা যায়—এই দলগুলোর তা থাকার কথা নয়।

ধর্মীয় রাজনৈতিক দলের মত অনেক বামপছী রাজনৈতিক সংগঠনসমূহকেও আওয়ামী লীগ নিয়ন্ত্রণ করে দেখেছিল। এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগকে খুব একটা বেগ পেতে হয়েনি। কেননা বামপছী সংগঠনসমূহ নানা ক্ষুদ্র দল-উপদলে যুদ্ধের পূর্ব থেকেই বিভক্ত ছিল। তাদের মধ্যে ঐক্য, সংহতি কিংবা তার কোন রকম প্রয়াসও ছিল না। অথবা তারা চিন, রাশিয়া, আমেরিকা, ভারত, আওয়ামী লীগ, কংগ্রেস ইতাদির

ভূমিকাৰ পথে এতদূর দিশেহাবা হয়ে পড়েছিল যে কোন সঠিক কৰ্মপথা উন্নিবন কৰা তাদেৱ পক্ষে একৰকম অসম্ভব ছিল। অঞ্চলবহিৰ্ভূত রাজনৈতিক আনুগত্যেৱ কাৰণে অনেক পূৰ্বে আইমুৰ খানেৱ আমলে যে ভুল তাৰা কৰেছিল, তাৰ ফলে তাদেৱ একাংশকে সাম্প্ৰদায়িক শক্তিৰ সঙ্গে আঁতাত কৰতে হয়েছে এবং অন্যান্য অংশকে রাজনীতিৰ নামে খুন জৰামেৰ কাজে লিপু হতে হয়েছে।

আসলে শফিয়ান উদ্ভৃত শক্তিকে চালেঞ্জ কৰে ‘আপাতত তাদেৱ পক্ষে নয়’ এমন জনগণেৱ মধ্যে টিকে থাকাৰ অনমনীয় মনোভাৱ থেকেই এই ধৰণেৱ কাৰ্যকলাপেৱ উন্নৰ। তাৰ পেছনে কোন সুস্পষ্ট সমাজদৰ্শনেৱ প্ৰভাৱ লক্ষ্যগোচৰ নয়। দৰ্শনেৱ দাবিদ্বাই বামপঢ়াদেৱ একাংশকে দিয়ে এই ধৰণেৱ কৰ্মকলাপেৱ অনুষ্ঠান কৰিয়েছে। খুবই দুঃখেৱ কথা সিৱাজ শিকদাৱেৱ মত প্ৰাপণৰ তৰুণ, দক্ষ সংগঠক এবং প্ৰথাৰ দেশপ্ৰেমিক, ধৰ্মৰ কৰ্মধাৱাৰ মধ্যে একটি সন্দৰ্ভপ্ৰসাৰী দৃষ্টিভঙ্গও ছিল, আৱ ভাৱতেৰ কমিউনিস্ট পাৰ্টি থেকে ভেদে ভেদে যে সম্ভত কমিউনিস্ট চক্ৰ উপচক্ৰ এখনে সৃষ্টি হয়েছিল, তাদেৱ সংগঠনেৱ শৰীৰে মূল কমিউনিস্ট পাৰ্টিৰ দৃষ্টিত জীৱাণু প্ৰাপ্তিৰ হয়ে আসছিল, তাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰভাৱমুক্ত একটি সংগঠন ছাড়া কৰে তিনি কিছু কৰতে পাৱলোন না। নিজেৰ কৰ্মচক্ৰে নিজে আটকা পড়ে অকালে শেখ মুজিবেৱ হাতে নিহত হলেন।

বামপঢ়া প্ৰসঙ্গে আৱেকটি সংগঠনেৱ উপৰ নিশ্চিত আলোকপাত কৰা প্ৰয়োজন। যুদ্ধেৱ পূৰ্ব থেকেই আওয়ামী লীগকে আদোলনে বেগ আৱেগ সঞ্চারেৱ জন্য যান্দেৱ উপৰ নিৰ্ভৱ কৰতে হয়েছে এবং যান্দেৱ প্ৰবল চাপেৱ মুখে শেখ মুজিবুৱ রহমানকে স্বাধীনতাৰ কথা বলতে হয়েছে, তাঁৰা ছিলেন তৰুণত এবং দেশেৱ শোষিতশ্ৰেণী থেকে আগত। আওয়ামী লীগকে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বেৱ সঙ্গে তাঁদেৱ জীৱনদৃষ্টিগত ফাৰাক ছিল, সে কথা পূৰ্বে উল্লেখ কৰা হয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বেৱ নিৰ্দেশ মেনে চলেও তাঁদেৱ বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য এবং লক্ষ্যগোচৰ ছিল। জাতীয় ও আন্তৰ্জাতিক এই বিদ্যুতে পৰিস্থিতিতে শেখ মুজিবুৱ রহমানেৱ নেতৃত্ব মেনে নেওয়া ছাড়া তাঁদেৱ গত্যন্তৰ ছিল না। তাৰা মুক্তিযুদ্ধে প্ৰত্যক্ষভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰেছেন। তাঁৰা প্ৰায় নিশ্চিত ছিলেন যে এই ভূখণ্ডে শেখ মুজিবুৱ রহমানেৱ সঙ্গে থাকলে কাগজমে একটি সমাজতাত্ত্বিক রাষ্ট্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা সম্ভৱ হবে। বিচাৰ বিশেষ ছাড়া অনেকটা সহজাত প্ৰবণতাৰ তাগিদেই স্বাধীনতা সমাজতন্ত্ৰেৱ ধৰনি তাঁৰা তুলেছিলেন।

মূল আওয়ামী লীগ দলেৱ সিন্ধানতপ্ৰণেতাদেৱ মধ্যে তাঁৰা ছিলেন না। এঁৰা পাৱতেন আওয়ামী লীগকে নিজেদেৱ উপৰ নিৰ্ভৰশীল কৰে তুলে প্ৰভাৱিত কৰতে। কিছু দূৰ কৰেছিলেন। আৱ পাৱতেন বাইৱে থেকে চাপ প্ৰয়োগ কৰতে। তাৰ কৰেছিলেন। এই উভয়বিধ চাপ প্ৰয়োগ কৰে তাঁৰা আওয়ামী লীগকে ছয়দফা থেকে স্বাধীনতা অবধি ধাৰিত কৰে নিয়েছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক, সামাজিক, আৰ্থিক, সাংস্কৃতিক মুক্তিসমূহ বালিয়ে তুলে তাঁৰা পূৰ্বাহুৰে কোন কৰ্মসূচি তৈৰি কৰতে পাৱেন নি।

এই অবস্থায় পঞ্চিশে মার্চেৱ পৰ অন্যদেৱ সঙ্গে তাঁদেৱও তাৰতে ঘোতে হয়। আওয়ামী লীগেৱ অন্যান্য অংশেৱ তুলনায় এই তাৰতে মুক্তিযুদ্ধে অধিক প্ৰত্যক্ষভাৱে

অংশগ্ৰহণ কৰেন। যুদ্ধেৱ পৰে বাংলাদেশে ফিৰে এসে আওয়ামী লীগেৱ সঙ্গে তাঁদেৱ গৱামিল বাড়তে থাকে এবং একটা সময় আসে যখন তাঁদেৱকে সম্পূৰ্ণ নতুন একটি কাৰ্যক্রম রচনা কৰে ‘জাতীয় সমাজতাত্ত্বিক দল’ নামে আলাদা সংগঠন দাঁড় কৰিয়ে বেৰিয়ে আসতে হয়। আদৰ্শগত গভীৰতা এবং স্বচ্ছতাৰ চাইতে অংশহীনতাৰ এবং ভাৰপ্ৰবণতাৰ আধিক্য তাঁদেৱ মধ্যে প্ৰবল ছিল। তথাপি তাঁদেৱ সদৰে একটি কথা সত্য যে মুসলিম লীগেৱ ভেতৰ থেকে আওয়ামী লীগ যেমন বেৰিয়েছিল, তেমনি আওয়ামী লীগেৱ ভেতৰ থেকে নতুন সামাজিক শক্তি হিসেবে তাঁদেৱ আত্মৰক্ষণ। সমাজেৱ একেবাৱে ভেতৰ থেকে জেগে ওঠা এবং বাংলাদেশেৱ সাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধেৱ সঙ্গে অঙ্গীকাৰাবদ্ধ এই প্ৰতিষ্ঠানটিৰ দিকে অনেকেই আশাৰিত দৃষ্টিতে তাৰিয়েছিল।

কিন্তু তাঁৰা অনেকগুলো সমস্যাৰ সমুদ্ধীন হলেন। প্ৰথমত আওয়ামী লীগকে চালেঞ্জ কৰে তাঁদেৱ জন্য। দ্বিতীয়ত বামপঢ়াৰী নানা উপদল এই নতুন দলটিৰ আৰ্বিভাৱকে কিছুটা দৰ্যা এবং সন্দেহেৱ চোখে দেখতে বাধ্য হয়েছে। তৃতীয়ত নানামূলী ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ কাৰণে দেশে তথন সাম্প্ৰদায়িক ভেদবুদ্ধি প্ৰবলভাৱে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। নতুনভাৱে জেগে ওঠা সামাজিক রঘূঘৰীলতা দেশেৱ মাটিতে তাঁদেৱ গভীৰ শিকড় প্ৰৱিষ্ট কৰতে বাধা দিয়েছে। চতুৰ্থত ভাৰতবিৰোধী বজৰ্যাৰ রাখাৱ জন্য সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ও এই দলটিৰ অসাম্প্ৰদায়িক বজৰ্যে পুৱোপুৰি বিশ্বাস কৰতে পাৱেনি। কেননা ভাৰত-বিৱোধিতা ও সাম্প্ৰদায়িকতা সেই সময় তাঁদেৱ কাছে, অবস্থাৰ পৱিত্ৰেক্ষিতে, প্ৰায় সমাৰ্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পঞ্চমত মুক্তিসংগ্ৰামেৱ সাথে প্ৰত্যক্ষ সংযোগবিহীন তথাকথিত প্ৰগতিশীল বুদ্ধিজীবীবন—যান্দেৱ মুখ্য অংশ মধ্যশ্ৰেণীভূক্ত এবং দেদুল্যমান—তাঁদেৱ প্ৰতি সমৰ্থন দান কৰতে পাৱেন নি। সমাজতাত্ত্বিক দিক দিয়ে বিচাৰ কৰলে সিৱাজ শিকদাৱেৱ দলটিৰ সঙ্গে এদেৱ অন্তৰাবেগেৱ দিকে কিছুটা মিল ছিল। দুটোই ছিল বৈদেশিক প্ৰভাৱমুক্ত সামাজিক প্ৰয়োজনে উন্নৰ, বিশ্বাস এবং কৰ্মপদ্ধতিতে নবীন বামপঢ়াৰী সংগঠন। দেশেৱ বামপঢ়াৰী আদোলন যদি পূৰ্ব থেকে সঠিকভাৱে পৰিচালিত হত, খুব সম্ভবত এই দুই প্ৰতিষ্ঠানেৱ লোকেৱা এক পতাকাৰ তলে সমৰ্বেত হতে পাৱতেন।

সদস্য সংখ্যায় এবং সাংগঠনিকভাৱে বেশ খানিকটা শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও এই দলটি শেখ মুজিবুৱ রহমানেৱ রংপুৰোৱ সহ্য কৰতে বার্য হয়েছে। এজন্য তাঁদেৱ ভুলজৰিৰেকে কম দায়ী কৰা যায় না। সে যাহোক, শেখ মুজিবুৱ রহমান সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠন বৰ্দ্ধ কৰে দিলেন। আওয়ামী লীগ, মঙ্কোপঢ়াৰী ন্যাপ এবং বাংলাদেশেৱ কমিউনিস্ট পাৰ্টি—এই তিনি দলকে ভোগে একদলে পৰিষণত কৰে দেশেৱ তাৰৎ শাসনব্যবস্থা চেলে নতুনভাৱে সৰ্বময় কৰ্তৃত্ব নিজেৱ হাতে এইণ কৰতে প্ৰয়াসী হলেন তিনি। তাৰপৰ সপৰিবাৱে নিহত হলেন।

সত্য আশ্চৰ্যেৱ বিষয় দেশেৱ ডান-বাম প্ৰৌণ-নবীন কোন গোতা, কোন লেখক, কোন শিল্পী প্ৰকাশ্যে এগিয়ে একটি কথা উচ্চাবণ কৰেন নি। শেখ মুজিবেৱ জন্য নয়, এই জাতিৰ জন্য। কাৰণ একটি ঐতিহাসিক পৰ্যায়ে ডান-বাম সমস্ত শক্তি যখন নানা

যাত্র প্রতিষ্ঠাতে পর্যন্ত হয়ে পড়েছে, সেই সময় তিনি একটা নেতৃত্ব চলনা করেছিলেন। অন্য অনেকের কথা বাদ দিলেও অন্তত বর্ষায়ান জননেতা মণ্ডলী আবদুল হামিদ খান ভাসানী এই কাজটা করতে পারতেন। কারণ তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে নানা ব্যাপারে সহযোগিতা করতে কসুর করেন নি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ইতিহাস এ নিয়ে একদিন প্রশ্ন উত্থাপন করবে এবং পরবর্তী বৎসর সকলকে সমানভাবে অপরাধী সাব্যস্ত করবে।

১০

শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হওয়ার পর দুবার ক্ষমতার পরিবর্তন হয়। সামরিক সরকার সামাজিক নৈরাজ্য বেশ প্রশংসিত করতে পেরেছে এবং আর্থিক জীবনও অনেকদূর সুগঠিত করতে পেরেছে। কিন্তু বাংলাদেশ যে আত্মপরিচয়ের অভাবের যত্নগায় ভুঁগছে এবং একটি রাষ্ট্রাদর্শের সক্ষান্ত করছে, সেক্ষেত্রে সামরিক সরকার কিছুই করতে পারেন।

ইতোমধ্যে শেখ মুজিব সমর্থক কিছু লোক সীমান্তের অপর পারে চলে গিয়ে ভারত সরকারের সাহায্যে ক্ষমতা দখল করার পাঁয়াতারা করছে। অন্যদিকে বিন্দুমাত্র নৈতিক মনোবলহীন আওয়ারী লীগও কোন রাজনৈতিক বক্তব্য দাঢ় করাতে অসমর্থ হয়েছে। আর বামপন্থী দলসমূহ পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেই ব্যস্ত। তাদের বেশির ভাগই মুক্তিযুদ্ধের প্রশ়িটি পাশ কাটিয়ে কোন প্রকারে কনসেশন আদায় করে রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সুনিচিত করার মধ্যে ব্যগ্ন। আইনুর খানের আমলে যে সুস্থ সুবিধাবাদ বামপন্থীদের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল, এ ভাব সেই মনোভাবেরই পুনরাবৃত্তি। বাংলাদেশের জন্মের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত না থাকার জন্য তাঁদের মধ্যে যে প্লান এবং লজাবোধ আশ্রয় করেছে, তা ঢাকতে গিয়েই এ দুর্দশ। তাঁদের রাজনৈতিক দর্শনের এ দীনতা শিগগিরই কাটিয়ে উঠতে পারবে, তেমন মনে হয় না। ন্যাপের জন্মপন্থো যেমন অন্যান্য পাকিস্তানপন্থী রাজনৈতিক সংগঠন তাকে ‘ভারতের চৰ’ বলে অভিহিত করত, তেমনি ভারতের প্রকাশ্য এজেন্টের বাইরে প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মসূচির মধ্যেও ভারতীয় এজেন্ট আবিষ্কার করা অনেকেই একটা প্রিয় অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আমাদের দৃঢ় ধারণা এজন্য অচিরেই তাঁদের অনুশোচনা করতে হবে। সকলে কোন নেতৃত্ব ভিত্তি প্রতিষ্ঠান না করেই নানা রকম ফন্দিফিকিরের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করার রূপরেখা থ্রেণ্যন করছেন। এ ধরনের ক্রিয়াকলাপ কিছুতেই দেশের এবং জনগণের জন্য মঙ্গল বয়ে আনতে পারে না।

এই স্থোগে দেশের সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহ নতুনভাবে জেগে উঠেছে। যেহেতু তাদের বেশির ভাগই বাংলাদেশ চাহানি এবং বাংলাদেশের জন্মপন্থের যে সকল অঙ্গীকার ছিল, মানসিকভাবে তার সঙ্গে তারা সংশ্লিষ্ট নয়, তাই অঙ্গীকার করার একটা প্রবণতা তাদের মধ্যে সততই বর্তমান। তাদের মনের মধ্যে পাকিস্তান রাষ্ট্রটির

অতিক্রম এমনভাবে গেঁথে আছে যে সে পাকিস্তানটি ভেঙে গিয়ে বাংলাদেশের অন্তর্দেশ ঘটনেও অবচেতনেও তাদের স্থীকার করতে বাধে। তাই নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের রাষ্ট্রীকরণের প্রসঙ্গে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ফেন্টে পাকিস্তানটিকেই তারা জীবিত করতে চায়। তাই পাকিস্তান রাষ্ট্রের অতি পরিচিত জিকিবগুলোও তাদের মুখে নতুন করে প্রাপ পেয়ে ওঠে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিরূপণের ফেন্টে তার স্পষ্ট প্রভাব পড়তেও আরম্ভ করেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং যুক্তের অঙ্গীকারসমূহ ইচ্ছায় হোক, মানস-প্রবণতাবশতই হোক, পায়ের তলায় দলতে আবণ্ণ করেছে।

আবার আরেকটি দল মুক্তিযুদ্ধের নাম ভঙিয়ে নিজেদের হত ক্ষমতা বৈদেশিক শক্তির যোগসাজসে দখল করতে তৎপর। বাংলাদেশের মাটিতে যদি সত্যিকার একটা দীর্ঘস্থায়ী মুক্তিযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হতে পারত, বাংলাদেশের জনগণমাত্রকেই সে যুক্তে অংশগ্রহণ করতে হত। নানা মতের, নানা ভাবাদর্শের মানুষের খণ্ডিত জীবনদৃষ্টি যুক্তের আঙ্গনে গঙ্গিত হয়ে একটি উদার এককুণ্ডী রূপ এহাগ করত। সেটা হয়নি বলেই এ সঞ্চারের উৎপত্তি ঘটেছে। এ হচ্ছে শুরু থেকেই জাতিসঙ্গ চিনতে না পারার মারাত্মক পরিণতি। এই জন্মই বাংলাদেশের যুক্ত ভারতের শাসকক্ষেপীর যুক্তে পরিণত হয়েছিল। এই অংশগ্রহণের ভারতম্যের জন্য, অভিজ্ঞতার বৈপরীত্যের জন্মাই প্রতিটি গ্রন্থ ও ধর্মাবলম্বী দল একে অন্যকে সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং ঘৃণার চোখে দেখেছে। সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং ঘৃণা ভূতান্ত দাসত্ত ছাড়া কিছুই জন্ম দিতে পারে না।

বাংলাদেশের জনজীবনে এখনো কোন আর্থিক সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের যুক্তি ব্যাপ্তিরেকেই অপারের অধিকার ছিনিয়ে নিজের দখল প্রতিষ্ঠা করার একটা প্রবল প্রতিশেধাত্মক মনোভাব ত্রিয়া করে যাচ্ছে। যারা ভারতে গেছেন তাঁদের মধ্যে এবং যারা বাংলাদেশে পাকিস্তানটি জীবন্ত করতে চাইছেন তাঁদের মধ্যে এই মনোভাব সমান সত্যিয়। একদল ভারতের উপর নির্ভর করে ক্ষমতা হস্তগত করতে চাইছেন, আরেক দল ভারতবিরোধিত করে ক্ষমতা হস্তগত করতে চাইছেন। দু রকমের মনোভাবই বাংলাদেশের জন্য সমূহ অমঙ্গল বয়ে আনবে।

অক ভারতবিহেষকে কিছুতেই একটা সুস্থ রাজনীতি বলা চলে না। এক জাতের হাতড়ে আছে, যারা চিকিৎসা করতে গিয়ে রোগী মেরে ফেলে। সাম্প্রদায়িকতার যে প্রকোপ বাংলাদেশে প্রবল ফুৎকারে জাগিয়ে তোলা হয়েছে, তা একদিন বাংলাদেশকে মারাত্মক পরিণতির দিকে ঠেলে দিতে পারে।

এক সবৰ বাংলাদেশে এবং পাকিস্তান মিলে একটি দেশ ছিল। চৌদ কোটি জনসংখ্যা অধ্যাধিত এই দেশটিকে আন্তর্জাতিক শক্তিবর্গ অর্থ সাহায্য করে, অন্ত দিয়ে ভারতের প্রতিস্পর্দ্ধী শক্তি হিসেবে অবস্থান করতে সাহায্য করত। এখন পাকিস্তানটি ভেঙে গেছে। যতই কষ্টকল্পনা করা হোক না কেন, বাংলাদেশের আর সেই গুরুত্ব নেই। যদি বাংলাদেশে মুসলমানির জিকির তুলে সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহকে চাপা করে তোলা হয়, তা দেখে ভারতীয় সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহ ঠিক প্রেম-নিবেদন করবে না। যদি সন্তুর কোটি সশস্ত্র হিন্দু সাত কোটি মুসলমানের উপর ঝাপিয়ে পড়ে, তাহলে

আত্মরক্ষাই দায় হয়ে দাঁড়াবে। বিশেষ করে বাংলাদেশের সামাজিক শক্তিসমূহের মধ্যে ভারত-সমর্থক তো রয়েছেই। পৃথিবীর কোন দেশটি সাহায্য করতে আসবে তখন? অস্তর্জাতিক রাজনৈতিক সম্পর্কের ফুলবুরি রচনা করে আত্মসান্দ অনুভব করা যায়, কাজের বেপায় কিছুই হয় না। আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বর্তমানে যারা বাংলাদেশের বন্ধু, তারা পাকিস্তানেরও বন্ধু ছিল। পাকিস্তানটি ভাঙ্গার সময় তারা কেউ সাহায্য করেনি। বাংলাদেশকেও করবে না। বরং বৃহৎ দেশ ভারতের সঙ্গে লাভজনক সম্পর্ক রচনা করা সম্ভব হলে তা-ই করবে।

বাংলাদেশকে একটা রাষ্ট্রদর্শণত ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের মূল দৃন্দ যেখানে সেটিকেই শাণিয়ে তুলতে হবে।

বাংলাদেশে এমন একটি সমাজব্যবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব যেখানে সকলে ভাগজোক করে পরিশ্রম করে বেঁচে থাকতে পারবে। সে রকম একটি গ্লাষ্ট্র পরিকল্পনা এখানে এখনো সুন্দর পরাহত হয়ে ওঠেনি। বাংলাদেশের অস্তিত্বের তাপিদেই ব্যাপকতম একটা সামাজিক বদ্বাদল প্রয়োজন। যদি তা সম্ভব না হয়, এখানে কোনদিন শান্তি আসতে পারে না।

ধর্মীয় আবেগোচ্ছাস দিয়ে হিন্দু-মুসলমান প্রশ়িটিকে বড় করে তুলে সেটি করা যাবে না। এই বকম একটি প্রক্রিয়া সূচনা করার সম্ভাব্য বাধা কিন্তু প্রথম ভারত থেকেই আসবে। কারণ আরেকবার বলা যাক। ভারত জনসংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীর বৃহত্তম পুঁজিরানী দেশ এবং পুঁজির পরিমাণের দিক দিয়ে এশিয়াতে জাপানের পরই তার ছান। তাহাড়া মার্কিন পুঁজিপতি থেকে আস্তস্ত করে দুনিয়ার তাৰৎ পুঁজিপতিমহল ভারতের সঙ্গে গাঁটছড়ায় আবদ্ধ। তাঁরাও ভারতের মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি সমাজতাত্ত্বিক রাষ্ট্র গড়ার বিরোধিতা করবেন।

সুতরাং বাংলাদেশকে এমন একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার দিকে ধাবিত হতে হবে, যা অনিবার্যভাবেই ভারতীয় বৃহৎ ধনিকশ্রেণীর শোষণ থেকে ভারতের শোষিত এবং নির্যাতিত জনগোষ্ঠীসমূহকে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি এবং আর্থিক দাবির প্রতি সজাগ করে তুলবে। সংগ্রামে উদ্বৃক্ষ করে ভারতের নির্যাতিত জাতিসন্তাসমূহের সামনে বাংলাদেশকেই সর্বথম প্রেরণার দৃষ্টান্ত সরবরাহ করতে হবে। এটা বাংলাদেশের নিয়ন্ত।

হয়তো বাংলাদেশকে শোষিত ভারতীয় জাতিসন্তাসমূহের শোষণের অবসান ঘটিনোর একটা প্রক্রিয়া করতে হবে, নয়তো বাংলাদেশের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা একবকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। এই দুয়োর একটিকে বেছে নিতে হবে। আত্মরক্ষার তৃতীয় কোন পথ নেই।

সমগ্র ভারত পাকিস্তান এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে একটি সমাজবিপ্লবের বাড় আসছে। কেউ তার গতিরোধ করতে পারবে না। বাংলাদেশই সেই আসন্ন ঘটিকার প্রাণকেন্দ্র।

এই মুহূর্তে বাংলাদেশের প্রয়োজন দুটি জিনিস— একটি জাতিগত আত্মপরিচয়, অন্যটি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আদর্শ। প্রথমটির মীমাংসা হয়ে গেছে। বাংলাদেশে জাতি

ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই বাঙালি; হিন্দু, মুসলমানিত্ব এবং উপজাতিত্ব এখানে প্রধান নয়। দ্বিতীয়টি মুভিয়ুদ্দের অঙ্গীকার সমাজতাত্ত্বিক রাষ্ট্রদর্শ। মুভিয়ুদ্দকে পাশ কাটিয়ে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নেই।

যে যেভাবেই বাখ্য করুন, বাংলাদেশে একটি মুভিয়ুদ্দ সংঘটিত হয়েছে। রাশিয়া চায়নি, আমেরিকা চায়নি, ভারত চায়নি, চিন চায়নি, পাকিস্তান চায়নি বাংলাদেশে বাঙালিদের একটি জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক। তথাপি বাঙালি জনগণের দাবি অনুসারে এখানে একটি যুদ্ধ হয়েছে, হতে পারে সে যুদ্ধের ফলাফল অপরে আত্মসার করেছে।

যাঁরা একটি নতুন জাতির জন্যের স্পুর্ণ দেখে রণধনি তুলেছিলেন, সংগীমে অংশগ্রহণ করেছিলেন—সমাজের কোনে বিকশিত সেই কেন্দ্রবিদ্যুটি থেকে আগমী দিনের নতুন নেতৃত্ব দেবিয়ে আসবেই আসবে।

ডাক দিয়ে যাও: ২৩ অক্টোবর ১৯৭১

নূর মোহাম্মদ

প্রথম ভাগ ॥ ভূমিকা

উনিশশ ঘাট দশকের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চিনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে যে মহাবিতর্ক শুরু হয় তার পরিণামে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিদ্বিত্তক হয়ে যায়। সর্বত্র মঙ্গোগঠী ও পিকিংগঠী—এ দু ভাগে বিভক্তি পরিচিতি লাভ করে। ১৯৬৭ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি। (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বা সংক্ষেপে এম.এল.) ‘জনগণতাত্ত্বিক পূর্ব পাকিস্তান’ এই নবগঠিত পার্টির রঞ্জনৈতিক আওয়াজ। জনগণতাত্ত্বিক পূর্ব পাকিস্তানের আর্থ দীর্ঘাত—পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তান আগন্তা হয়ে যাবে এবং নতুন যে রাষ্ট্র গঠিত হবে তা হবে মূলত সমাজতাত্ত্বিক। অর্থাৎ স্বাধীন ও সার্বভৌম একটি দেশের প্রত্যাশাই চিন্তা চেতনার কেন্দ্রে চলে আসতে থাকে। এখানে প্রথম ধাপে কায়েম হবে জনগণতত্ত্ব ও পরের ধাপে সমাজতত্ত্ব। এবং শাস্তিপূর্ণ পথের বিপরীতে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে এই রঞ্জনৈতিক বিজয় অর্জন করতে হবে।

তখন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের অন্য কোন রাজনৈতিক দল ইতিভাবে সরাসরি পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়ানি। স্বভাবতই পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনার কর্ম-কৌশলই কেন্দ্রীয় কাজ হিসাবে চিহ্নিত হয়। যদিও কিভাবে তা শুরু করা যেতে পারে তা খায় অধীরাংসিতই থাকে। পার্টি দ্রুতগতিতে বিকশিত হতে থাকে। কিন্তু অচিরেই পার্টি ভেঙ্গে পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (এম.এল.) গঠিত হয়। পার্টি একদিকে পূর্ব পাকিস্তানের পাকিস্তানের উপনিরেশ বলে ঘোষণা করল, অন্যদিকে কৃষিতে ধনতত্ত্ব প্রধান হিসাবে তত্ত্বাবলম্বন করল। এর আগ পর্যন্ত পূর্বের অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি ও পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম.এল.)

উৎপাদন-প্রগালীর আলোকে কৃষিতে আধা-সামন্তবাদী ব্যবস্থা বিরাজ করছে বলে মনে করত, পূর্ব পাকিস্তানের উৎপাদন-প্রগালী পুঁজিবাদী হয়ে গেছে বলে মনে করত না। পূর্ব পাকিস্তান আধা-গ্রুপনিরেশিক ও আধা-সামন্তবাদী—কমরেড আবদুল হকের এ রকম বক্তব্য মঙ্গোগঠীদের তেমন বিরোধিতায় পড়ে নাই।

তাছাড়া প্রধানত পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের বিকাশে এ অভিযোগও তোলা হয় যে সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বললেও পার্টি নেতৃত্ব সংশোধনবাদী হয়ে গেছেন। তারা আমের কৃষকদের সংগঠিত করে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে আম দিয়ে শহর ফেরাও (কৃষি বিপ্লব) করার কর্মসূচি বাস্তবায়নে দেমন অন্যথাই তেমনি অযোগ্যও বটে। আর এমন এক সময় ঘটে যায় ভারতের নকশালবাড়ীর সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থান। চিনের কমিউনিস্ট পার্টি এই অভ্যুত্থানকে অভিনন্দন জানিয়ে বেথে ‘বসন্তের বজ্র নির্ধোষ’ যা পিকিং রেতিও থেকে ইংরেজি ও বাংলায় প্রচারিত হত। চারক মজুমদার ও তাঁর শ্রেণীশক্তি খতমের লাইন এদেশের বিপ্লবী মহলে বেশ বড় রকমের প্রভাব ফেলে। উল্লেখ্য, পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের অযোগ্যতা নিয়ে যে অভিযোগগুলো করা হচ্ছিল তা খণ্ডের জন্য তাঁরা বাস্তবে নতুন কোন সশস্ত্র যুদ্ধের লাইন প্রণয়ন করতে এবং তা সাফল্যের সাথে কার্যকর করে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেন নি। তাঁরাও শেষ পর্যন্ত চারক মজুমদারের লাইনই ছহণ করেন।

পাকিস্তান কায়েমের আগে শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে দিজাতিতত্ত্বের পক্ষে অবস্থান নেওয়া যে গাঢ় মুসলিম উন্নয়ন তা ১৯৪৮-৫২ সালের মধ্যেই শিখিল হয়ে আসতে থাকে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ও পাঞ্জাবি নেতৃত্বে পাকিস্তানের শাসক ও শোক গোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর যে শাসন-শোষণ চাপিয়ে দেয়, তার বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান প্রতিবাদ-বিক্ষেপ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনী পরিসংখ্যানে প্রকটভাবে প্রকাশিত হয়।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী যখন আওয়ারী জীবের নেতা হিসাবে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সে সময় মার্কিন সম্রাজাবাদের সাথে সম্পাদিত সামরিক চুক্তি বাতিল, জেটিনিরপেক্ষ আন্দোলনে সামিল হওয়া ও পূর্ব পাকিস্তানসহ পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের স্বায়ত্ত্বাসরণের দাবি তুলে। কমিউনিস্টদের সহযোগিতায় মওলানা ভাসানী পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্ত্বাসরণের দাবিকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর আতীয় দাবিতে পরিণত করেন। ১৯৫৭ সালের কাগমারী সম্মেলনে মওলানা ভাসানী পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল, জেটিনিরপেক্ষ পরবর্ত্তনীতি ও পূর্ণ স্বায়ত্ত্বাসরণের প্রস্তাব করলে তার বিরোধিতা করেন প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দী, পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান, শেখ মুজিব ও অন্যান্য নেতা। প্রবর্তীতে

প্রস্তাবগুলো নাকচ হয়ে যায়। শহীদ সোহরাওয়ার্দি সাফ জানিয়ে দেন—পূর্ব পাকিস্তানকে ইতোমধ্যে পঁচামবই ভাগ স্বারাজ্যাসন দেওয়া হয়ে গেছে। তিনি সামরিক ট্রান্স বাতিলসহ জেটনিরপেক্ষ পরবর্ত্তীভূতি অসঙ্গে হাজির করেন তাখ বিখ্যাত জিরো+জিরো=জিরো তত্ত্ব। এবং আওয়ামী লীগ ভেঙে মণ্ডলানা ভাসানীয় নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' বা সংক্ষেপে 'ন্যাপ'। আওয়ামী লীগ নয়, কমিউনিস্টদের সহযোগিতায় ন্যাপই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলে পরিণত হতে থাকে। এমতাবস্থায় ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন শুরু হয়। পূর্ব পাকিস্তানের বিপুল সংখ্যক কমিউনিস্ট নেতা-কর্মী ও মণ্ডলানা ভাসানী তার বেশ কিছু সহকর্মীসহ প্রেরণ হন। বাদবাকির অধিকাংশই আত্মগোপন করেন।

পরবর্তী ধাপে আইয়ুব খানের অতি-নিয়ন্ত্রিত বোগাস মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে আমলা-সামরিক-বাবসায়ী ও মুঠিয়ে গণবিরোধী রাজনৈতিক নেতার সিডিকেট দেশ শাসন করতে থাকে। কেন্দ্রীয় শাসকদের আজ্ঞাবহ হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানে মোনায়েম খার নেতৃত্বে স্বৈরশাসকদের তাঊব সহের দীর্ঘ অতিক্রম করে যায়।

৩

সামরিক শাসনের মধ্যেই ১৯৬২ সালে যে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন শুরু হয় তা তুলে উঠে ১৯৬৯ সালে। ন্যাপ থেকে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির (এম.এল.) নেতা-কর্মীরা বের হয়ে আসেন। এর ফলে ন্যাপ যেমন দুর্বল হয়ে পড়ে তেমনি পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি ও পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি অনেকাংশেই পরিণত পর্যায়ে পৌছে যায়। দল দুটি পূর্ব পাকিস্তানের জাতিসমস্যা সমাধানের ব্যাপারে নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে খৰ্চ হওয়ায় আওয়ামী লীগের হাতেই এই নেতৃত্ব চলে যায়। পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি অত্যন্ত সঠিকভাবেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের শক্ত হিসাবে সাম্রাজ্যবাদী (গ্রানাত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী) ও সাম্রাজ্য-বুর্জোয়াদের (শক্তিশালী আমলা গোষ্ঠীসহ) সন্তুষ্ট করতে সমর্থ হয়। পাকিস্তানের অবাঙালি শোষক-শাসক গোষ্ঠী প্রায় সব সময় 'প্রাক্তন' শক্ত হিসাবে সামনে থাকায় আওয়ামী লীগ সহজেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের একমাত্র শক্ত হিসাবে তাদেরকেই লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করতে পারে। শ্রেণীসমস্যা সমাধানের জায়গায় সাম্রাজ্যবাদের ইস্যু বাদ রেখেই জাতিসমস্যা সমাধানের বিষয়টি অত্যন্ত দ্রুততার সাথে এমনভাবে বাজনৈতিক মূল স্তোত্তরারায় পরিণত হয় যে শ্রেণীসমস্যা ও জাতিসমস্যা সমাধানের যথাযথ বিকল্প বিপুর্বী কর্মসূচি প্রণয়নে এম.এল. কমিউনিস্টদের মধ্যে বিজ্ঞাপ্তি দেখা দেয়।

ঔপনিবেশিকতার ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭-পরবর্তী কালে সাম্রাজ্যবাদের সাথে পুরোপুরি গাঁটছড়া বাঁধা পাকিস্তানের মত কোন দেশে বা পূর্ব পাকিস্তানের মত কোন প্রদেশে জাতিসমস্যা সমাধান সাম্রাজ্যবাদের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিল (চূড়ান্ত

ফ্যাসলা) ব্যতিরেকে সম্ভব না বলেই কমিউনিস্টদের (এম.এল.) সঙ্গত ধারণা সত্ত্বিক থাকে। তাছাড়া আওয়ামী লীগকে মনে করা হত বাঙালি শোয়েকদের প্রতিনিধি—আওয়ামী লীগ আমূল কৃষিসংস্কার দূরের কথা, কোন মডারেট কৃষিসংস্কারও করবে না। উপরন্তু সাম্রাজ্যবাদের বাঙালি সহযোগী বা এজেন্ট হিসাবে কাজ করবে।

১৯৭০ সালের এপ্রিল মাসে ফরিদপুর প্লেনামে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি 'শ্রেণীশক্ত খতম'-এর লাইন গ্রহণ করে। দেখা গেল গ্রামাঞ্চলে প্রধানত মুসলিম লীগ নেতৃত্বাই শ্রেণীশক্ত হিসাবে নির্বাচিত হচ্ছে। গ্রামের জোতদার-মহাজনদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ দলগতভাবে মুসলিম লীগার হলেও ততদিনে আওয়ামী লীগের অনেকেই মুসলিম গীগারদের জয়গা দখল করে নিয়েছে। গ্রামাঞ্চলে অবশ্য জোতদার-মহাজনদের একটি হেট অংশ সম্প্রদায় বিবেচনায় হিন্দুও ছিল। দেশের প্রধান মোকাম ও গঞ্জে ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি ভাল অংশ তাদের হতে। এই সময় 'অ্যাকশন' বলতে যা বোঝায়, তা প্রায় শুরুই হয় নাই।

আইয়ুব খানের পতন ও ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসনের অধীনে ১৯৭০ সালের নির্বাচনী ফলাফলে অবস্থা আরো জটিল হয়ে দেল। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত, কিছুটা বিরতি ছাড়া, পুরো সময় সম্পূর্ণ অগ্রণ্যতাত্ত্বিক পদ্ধতায় পশ্চিম পাকিস্তানের নিপীড়িত জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন পাঞ্চাবি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানে তাদের একান্ত অনুগতদের সহযোগিতায় দেশ-শাসনে এতটাই অভাস হয়ে পড়ে যে তারা ভাবতেই পারছিল না—পূর্ব পাকিস্তানের কোন রাজনৈতিক দল, শ্রেণী-চরিত্র বিচারে তাদের কাছের হলেও, পুরো দেশ শাসন করবে। এ সময় রাজনৈতিক সংকট শুরুতর অবস্থায় পৌছে যায়। পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের জীবনের সমস্যা দূর করতে শ্রেণীসমস্যার সমাধানই যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা জখম রাজনৈতিক এজেন্ট হিসাবে দৃশ্যপট থেকে কার্যত পিছনে সরে যেতে থাকে। এক ধরনের উহু বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রাধান্য পেতে থাকে। ১৯৪৭ সালের বিজাতিতত্ত্ব তার জীবন্ত অস্তিত্ব নিয়ে যেন আত্মগোপনে চলে যায়। সব সমস্যা সমাধান হবে অবাঙালিদের হচ্ছিয়ে দিলে—এ রকম একটা স্পর্শকাতর ও বিশ্বক বাস্তবতা প্রধান রাজনৈতিক প্রাতে পরিণত হতে থাকে। এক সময় প্রিটিশ ও হিন্দুদের অধীনতা থেকে বের হওয়ার জন্য যারা গাঢ় মুসলমান হয়েছিলেন তাঁরা ও তাঁদের বংশধররা এখন প্রাগাঢ় বাঙালি হয়ে অবাঙালিদের কজা থেকে বের হওয়াকেই শ্রেণীজ্ঞান করলেন। হিন্দুদের জয়গায় অবাঙালি। শুধু শ্রেণীসমস্যা ও সাম্রাজ্যবাদের সমস্যাই, নয়—আসলে জাতিসমস্যা যা জাতিরস্ত গঠনের সাথে জড়িয়ে নিয়েছিল, তার সমাধানও গড়ে উঠতে থাকে নিতান্তই নড়বড়ে ভিত্তির উপর। শতাব্দীকাল ধরে চলে আসা যে শুরুতর সমস্যার পাহাড় বাঙালি জাতির মাথার উপর জমেছিল তা বোড়ে ফেলার প্রক্রিয়া ছিল জটিল ও বেশ দুর্জন—অন্তত আওয়ামী লীগ এই কাজ সম্পন্ন করার মত কোন দল ছিল না। এ আলোচনা অনেক বড়।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে আওয়ামী লীগের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক জাতু ও ভূট্টোর সমরোতার যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। ঢাকার বুকে ২৫ মার্চ রাতে

নেমে আসে পাকিস্তান বাহিনীর ভয়ঙ্কর আক্রমণ। আক্রমণ দ্রুতভাবে বিস্তার লাভ করে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে। ২৯ মার্চ যশোর ক্যাটলনমেটে বাঙালি সৈন্যদের সম্পূর্ণ নির্মূল করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সমগ্র যশোর।

যশোরে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির (এম.এল.) সংগঠন ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী। সারা দেশে ১৯৬৯ সালের অঙ্গুথানে কৃষকদের গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণের ফলে গ্রামাঞ্চলে পার্টির প্রভাব উল্টোখোম্বোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বের হওয়া তরুণ-যুবকদের পার্টিতে যোগ দেওয়ার যে চেষ্টা দেখা দিয়েছিল তা হচ্ছে মার্চের পর হাঁটাং অনেকগুলি বৃক্ষ পেল। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সর্বস্তরের মধ্যেও পার্টির আশ্বাসীভূত প্রভাব পড়ে। এমন ঘটনা এর আগে খুব অকটা দেখা যায়নি।

একটা বিশ্ব মনে রাখতে হবে— ১৯৬০ দশক হল সেই বিশ্বে সময় যখন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমান পরিবার থেকে অসংখ্য শিক্ষিত তরুণ-তরুণী কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক ইতিহাসে এ এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বলতে গেলে কমিউনিস্ট পার্টি এই অথবা মুসলিম মধ্যবিত্ত ও নিয়ন্ত্রিত পরিবারের মধ্যে অর্থাৎ তাদের সমাজের মধ্যে তাদেরই সম্প্রদায় থেকে তৈরি হওয়া, বিশেষ করে শিক্ষিত, বাম সংগঠিত শক্তি ও তাদের দ্বারা নির্মিত রাজনৈতিক সংকুতির পরিবেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

সন্ত্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রগতিশীল আন্দোলন গঠাত্বিতে অত্রপৰ্যন্ত করতে থাকে। ১৯৪৮-১৯৫২ সালে বাঙালি মুসলিম পরিবার থেকে, বিশেষ করে যারা ছাত্রছাত্রীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ও অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের থেকে, ৬০ দশকের মুসলমান পরিবারের চিত্র ছিল অনেকাংশেই ভিন্ন। যৌবন সম্প্রদায়গত বিবেচনায় সুনি-আত্মাফ বাঙালি মুসলমান পরিবার থেকে এই দশকেই প্রথম প্রজাত্বের শিক্ষিত তরুণ ও যুবকদের গুরু রাজনীতিতে নয়, বাম রাজনীতিতে অংশগ্রহণ অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এর ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্ববৃক্ষ তেমন হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

যাহোক, যশোর শহর থেকে যারা পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন তাদের বড় একটা অংশ আগেই আসে চলে যায়। মার্চের পর যারা শহরে থাকতে পারেননি তাঁরাও আরে গিয়ে শক্তি বৃদ্ধি করেন।

জেলার নেতৃস্থানীয় প্রাক্তন ছাত্রনেতাদের (যারা পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন) প্রায় সকলেই অত্যন্ত সত্ত্বিক হয়ে ওঠেন। কমরেড আবদুল মজিদ ও কমরেড নূর মোহাম্মদ জেলা কমিটির সাথে উদ্ভৃত পরিহিতিতে আও করীয়া প্রসঙ্গে আলোচনা চালাতে থাকেন।^১ জেলা কমিটি কেন্দ্রীয় নির্দেশ না পাওয়ায় দ্বিবিত থাকে।

শহরের প্রাক্তন ছাত্রনেতাদের অধিকাংশের ছাত্র রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয়েছিল ছাত্র ইউনিয়নের মাধ্যমে— ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলনের ধারাবাহিকভাবে। ফলে ‘আইযুব খান ধ্বংস হোক’, ‘শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যবীর্তি চলবে না’, ‘পাকিস্তানের ২৪ পরিবার ধ্বংস হোক’ সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু কর’, ‘এক ইউনিট বাতিল কর’, ‘পূর্ণ

স্বায়ত্ত্বশাসন দিতে হবে’, ‘হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিল কর’, ‘সন্ত্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক’ ইত্যাদি প্রোগ্রাম এমন একটি পরিবেশ ও মানসিকতা তৈরি করে যা তাদের অসাম্প্রদায়িক-ধর্মনিরপেক্ষ করে এবং সন্ত্রাজ্যবাদ ও পাকিস্তানের সামরিক-বৈরোত্ত্বের ঘোর বিরোধী করে তোলে। পাকিস্তানের সামরিক শক্তির মোকাবেলার প্রশ্নে কোন ধিক্কা-দন্ত তাই কাজ করেনি। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হওয়া কমরেডরা সন্ত্রাজ্যবাদ-সাম্রাজ্যবাদ উৎখাতের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। কিন্তু মার্চের আগে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে এমন কোন স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি, যার উপর ভিত্তি করে ভিন্ন কিছু ভাবা যেত। বিদ্যমান এসব দন্ত যুদ্ধের সময় প্রকাশিত হয় বটে, তবে সমাধানের তেমন কোন পথ বোধ হয় কেউ দেখাতে পারেন নি।

জেলা কমিটি কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছিল। তাঁরা জানতে পেরেছিলেন দেরি হওয়ার প্রধান কারণ ‘দলিল’ প্রণয়নে কেন্দ্রীয় কমিটির মতবিরোধ। যশোর জেলায় পার্টির নামে পরিচিত সেই সময়কার প্রধান নেতাদের মধ্যে ছিলেন তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা কমরেড অমল সেন, কমরেড হেমন্ত সরকার, কমরেড মুসি মোদাচের, কমরেড নূর জালাল ও কমরেড রাসিক লাল ঘোষ ও চান্দি দশকের প্রবাণ নেতা কমরেড সুধাশুণ দে প্রমুখ। জেলা কমিটির সম্পাদক ছিলেন পুরুষ হাইকুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক কমরেড শামসুর রহমান। মে মাসের শেষে কমরেড অমল সেন ভারতে চলে যান।

কেন্দ্র থেকে ‘দলিল’ এল না। অপেক্ষা করাও আর সন্দেহ ছিল না। কমরেড নূর মোহাম্মদ এগ্রিম মাসেই ‘করণীয়’ সম্পর্কে জেলা কমিটির কাছে একটি অপূর্ণাঙ্গ খসড়া দলিল পেশ করেন। জেলা কমিটির উপর চাপ বাড়তে থাকে। জেলা কমিটি কমরেড নূর মোহাম্মদকে একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল হাজির করতে বলে। তিনি জেলা কমিটির কাছে ‘বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের করণীয়’ নামে একটি দলিল পেশ করেন।^২ দলিলে অনতিবিলম্বে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ও তাদের স্থানীয় সশস্ত্র দলালদের বিরুদ্ধে গণযুদ্ধের সামরিক সংগঠনের নিয়ম অনুযায়ী সামরিক বাহিনী পড়ে তোলা ও যুদ্ধ করা যে অপরিহার্য তা যুক্তি সহকারে হাজির করা হয়। একই সাথে শ্রেণীশক্তি উৎখাতের মাধ্যমে কৃষি-বিজ্ঞাবের ক্ষেত্রে প্রস্তুত করা ও সীমিত শর্তে হলেও যুক্তক্রস্ট গঠন করে মুক্ত এলাকা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা পেশ করা হয়। দলিল এশিয়ায় ভারতের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার নীতি ও এই পরিপ্রেক্ষিতে তার সম্মতাবা গতি-প্রকৃতি সম্পর্কেও বক্তব্য রাখা হয় এতে। বলা হয়, কোন অবস্থাতেই ভারতে গিয়ে যুদ্ধ নয়— দেশের মাটিতেই যুদ্ধ করে প্রয়োজনে জীবন দিতে প্রস্তুত হতে হবে। জেলা কমিটি সর্বসম্মতভাবে এই দলিল গৃহণ করে ও এর ভিত্তিতে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনার নির্দেশ দেয়। আসলে আধীনতার উন্নয়ন সশস্ত্র প্রতিরোধের মাধ্যমে পাকবাহিনীকে ধ্বংস করাই কেন্দ্রীয় কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।^৩

জ্বাই মাসের কোন এক সময় কেন্দ্রীয় কমিটির ‘দলিল’ এল। তবে একটি নয়, দুটি: এক পক্ষের প্রধান নেতা কমরেড আবদুল হক ও কমরেড অজয় ভট্টাচার্য এবং

অন্য পক্ষের প্রধান নেতা কমরেড সুখেন্দু দস্তিদার ও কমরেড মোহাম্মদ তোয়াহ। জেলাতে দলিল দুটি নিয়ে আলোচনা শুরু হল। ইতোমধ্যে জেলার যাবতীয় কাজকর্ম কমরেড নূর মোহাম্মদের পেশ করা দলিলের ভিত্তিতেই এগিয়ে চলছিল।

এরপর মূলত শহরের পার্টি নেতা-কর্মীদের প্রধান অংশ কমরেড মহিউদ্দিন আলী আকতার ও কমরেড আব্দুল মতিনের নেতৃত্বে যায় মনিরামপুরের দিকে এবং কমরেড নূর মোহাম্মদ ও কমরেড আবু বকর জাফরবাদীলা দীপু পার্টি হেডকোয়ার্টার পুনৰ্ম প্রামাণ থেকে যান।¹ মনিরামপুরের দিকে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁরা শেষ পর্যন্ত খুলনার ডুমুরিয়াতে চলে যেতে বাধ্য হন ও খুলনা জেলা কমিটির সাথে যোগ দিয়ে কাজ করতে থাকেন। সেখানে থাকা তাঁদের পক্ষে বেশিদিন সম্ভব হয়নি। যশোর শহর অথবা কাছাকাছি জায়গায় ফিরে আসতে তাঁরা চেষ্টা করতে থাকেন। ফিরে আসার পথে ২৩ অক্টোবর তারিখে কয়েকজন কমরেড নির্মমভাবে শহীদ হন। তাঁদের কথা নিয়েই এ লেখার প্রবর্তী অংশ।

বিত্তীয় ভাগ ॥ ২৩ অক্টোবর ১৯৭১

৪

চবিশ বছর আগে, ১৯৭১ সালের ২৩ অক্টোবর, যশোর শহর থেকে বারতের মাইল দূরে মনিরামপুর থানার অস্তর্গত চিনেটোলায় কমরেড মাশুকুর রহমান তোজো, কমরেড সিরাজুল ইসলাম শান্তি, কমরেড আহসান উদ্দিন থান মানিক ও কমরেড আসাদুজ্জামানকে পাকিস্তানি ঘূঁঘু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সশস্ত্র প্রতিনিধিরা হিস্তে বর্বরতায় নির্মমভাবে হত্যা করে। বেয়লেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এবং একাধিক জায়গায় গুলি করে চৰম নিষ্ঠুরতার সাথে এই হত্যাকাণ্ড ঘটালো হয়েছিল।

যারা এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটায় তারা জেনেশনেই এ কাজ করেছিল। তারা জানত, যাদের হত্যা করা হচ্ছে তারা কমিউনিস্ট—সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই তাদের জীবনের লক্ষ্য। এটা ঠিক যে হত্যাকারীরা অঙ্গ পাকিস্তান ও বিগম্ভ ইসলাম ধর্মকে রক্ষার অজুহাতে এই নৃশংস কর্মটি করেছিল। সংক্ষেপে বলতে গেলে হত্যাকারীরা ছিল ধর্মান্ধ—অঙ্গ পাকিস্তান ও চলমান সমাজব্যবস্থার পক্ষে। নিহতরা ছিলেন পাকিস্তান রক্ষি ও চলমান সমাজব্যবস্থা ব্যবস করে শোষণহীন অসাম্প্রদায়িক জনগণতাত্ত্বিক পূর্ব বাংলা কায়েমের পক্ষে, যার অভ্যন্তর ঘটবে মেহনতি মানুষের নেতৃত্বে প্রত্ব রাষ্ট্র হিসাবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে আজ ২৪ বছর পর দেখা যাচ্ছে সেই সময়কার হত্যাকারীরা ডিন নামে ও ডিন আদলে সমাজের সর্বত্র দোর্দও প্রতাপে তাদের নৃশংসতা ও সহিংসতা বজায় রাখতে পেরেছে এবং সমাজতন্ত্রের পক্ষের শক্তি সাময়িকভাবে

হলেও—শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশ্বব্যাপী—অনেকাংশেই দুর্বল হয়ে পড়েছে। ফলে এই শহীদদের সম্পর্কে নিজেদের মত করে বিরূপ ও অন্যায় মন্তব্য করার বেদনাদায়ক একটি অতিরিক্ত সুযোগ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো পেয়ে যাচ্ছে—যা আদৌ সত্ত্বের কাছাকাছি নয়।

জীবন্ত গাধারা স্পর্ধার সাথে মৃত সিংহদের পদাঘাত করছে এবং আমাদের সমস্ত মাঝ প্রচণ্ড আক্রমণে পিয়ে দিয়ে নারুকীয় উল্লাস প্রকাশের সাহস দেখাচ্ছে। বিষয়টা অধিকতর দুর্বিষ্য ও বিষাক্ত হয়ে উঠেছে এ কারণে যে সেই সময় উপরোক্ত শহীদ বিপুলবিদের পক্ষে যাঁরা ছিলেন তাঁদের অধিকাংশই শক্রিয়বিবে ভিড়েছেন এবং ঘাতকদের হাত শক্রিয়ালী করতে করতে নিজেরাই ঘাতকে পরিণত হয়েছেন। কেউ কেউ সমজিতভূতের কথা বলছেন বটে। তবে একে এতটাই ধনবাদী গণতন্ত্রসম্বত্ত সজ্জন, নির্বাচন ভৱল ও নির্বাচী আকারে হাজির করছেন যে তাতে প্রকারান্তরে ২৩ অক্টোবরের শহীদদেরই আসামীর কাঠগড়ায় দাঢ় করানো হচ্ছে। তাঁরা বলেন, আসলে বিশ্বব্যাপী ধনবাদী সংসদীয় গণতন্ত্র কথনে ছিল না এবং আজো নেই।

আর এই দেশে ১৯৪৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত নাকি গণতন্ত্র নাবালকই রয়ে গেছে। অর্থাৎ গণতন্ত্রে প্রজনন ফ্রম্যান্সপ্লান করার জন্য এখনো সংগোষ্ঠী চলছে। অথচ এই গণতন্ত্রের নামে বাবুর যেসব রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছে তাতে জনগণের দুর্দশাই কেবল বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলি পরস্পরকে গণতন্ত্র হত্যাকারী বলে অভিযুক্ত করেছে। অবশ্য সংস্কৰণ গণতন্ত্রের প্রশংসন সকল মতের ও সকল পক্ষের একটি জায়গায় প্রায় অভিন্ন রূপ দেখা যায়—তাঁরা বলেন, গণতন্ত্র মহান রাজনৈতিক ভাবাদৰ্শ; তুচ্ছ অভাব-অন্টনের বিষয়কে এর সাথে মুক্ত করা কেন? ফলে তাঁদের মতে আগে চাই নির্বাচনের মাধ্যমে একথানা সংসদ। সেই সংসদের মাধ্যমে গণতন্ত্রের প্রাচীষ্ঠানিক রূপদান প্রক্রিয়া চলবে আরো বহুবিধ। তারপর ভাত-কাপড়ের বিষয়টা দেখা যাবে। এসব গুরুগম্ভীর দেশপ্রেমের কথা হাস্যকরভাবে লেজে-গোবরে হয়ে পড়ে নির্বাচনের আবির্ভাব ঘটলো।

অধিকাংশ ভোটারের জীবনের মূল সমস্যা যেহেতু ভাত, কাপড়, চিকিৎসা, মাথা গুঁজার টাইই ও কাজের নিষ্যতা, সেজন্য নির্বাচনের প্রার্থীরা সেই সময় সংসদীয় গণতন্ত্রের মাহাত্ম্য কীর্তন না করে উল্লেখ ভাত, মাছ, মাংস, দুধ, মাখন থেকে কোরমা-পোলাও পর্যন্ত প্রতিশ্রুতির সোনার থালায় ভোটারদের খাওয়াতে মহাব্যস্ত হয়ে পড়েন। কোন দলের সরকার ফ্রম্যান্স থাকার সময় তাদের বাপ-দাদার জমিদারি থেকে জনগণকে কতটা দিয়েছে—যুক্ত হয়ে যায় তার দানবীয়া বর্ণন। পরস্পরকে আক্রমণের যে ভাবে তাঁর ব্যবহার করেন, তাতে পরিবেশ পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায়। শুরু হয় শশস্ত্র উপায়ে ‘শান্তিপূর্ণ’ নির্বাচনের পর্ব। এসব প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দল যখন তাদের সৃষ্টি রাজনৈতিক সঙ্কটকে (যা তাদের রাজনীতিরই ফলাফল) দেশের জন্য মহারিপর্য বলে অভিহিত করে তখন বিদেশি দূতাবাস, বিদেশি প্রচার-মাধ্যম ও ক্যাট্লনমেটের দিকে মানুষের চোখ-কান খুলে রাখার পরামর্শ দেয়। এদেশের জনগণ এখন এতে অভ্যন্ত। দেশের শাসক রাজনৈতিক দলগুলির নেতারা যে বিদেশিদের কত

বড় দালাল তা বারবার উলসভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এখন আর কেউ বোধ হয় একে জাতীয় অপমান বলে গণ্য করে না।

অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে সমাজতন্ত্রের কথা কেউ কেউ বা কোন কোন ফ্রিপ ব্যক্তিগত সম্ভাস সৃষ্টির মাধ্যমে বলতে চায়। বিপ্লব যেন জনগণের ব্যাপার নয়—বিপ্লবকে চাপিয়ে দাও! অনেক ক্ষেত্রেই বিপ্লব কেন কেন এলাকার জনগণের কাছে ভয়েরই একটা ব্যাপার—যুন-খারাবি ও শস্ত্র যুদ্ধের সম্পর্কায়ে এনে ফেলাতে সমাজ-বিপ্লবের ধারণা পাল্টাতে থাকে। প্রায়ই অভিযোগ শোনা যায়, প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলগুলি নৌত্তিগতভাবে যারা নির্বাচন বর্জনকারী তাঁদেরই নির্বাচনের কাজে লাগাচ্ছে। এঁরা তখন শার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী একেক জন মহান বিপ্লবী নন—এক একজন অস্ত্রধারী মাত্র। শুরু হয় হয়তো সদিচ্ছা দিয়ে। কিন্তু যে পদ্ধতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, তাতে জনগণও শুন্যে ঘিলিয়ে যায়। থাকে শুধু বন্দুক ও ব্যক্তি—এন্দের অনেকেই আত্মাগের গরিমায় উজ্জ্বল হয়ে কাজ করে কিন্তু একটা গোলকধারার মধ্যে আটকে গিয়ে আর বেরতে পারেন না। কিন্তু আমাকে শীকার করতেই হবে—এন্দের সম্পর্কে আমার জনাশোনা খুবই কম। দীর্ঘদিনের অনেক ত্যাগী কমিউনিস্ট এখানেও আছেন। হয়তো তাঁরাও সঠিক পথ খুঁজে পাবার চেষ্টা চালাচ্ছেন।

৫

২৩ অক্টোবর স্মরণ করতে গেলে মনে পড়ে—এই অক্টোবর মাসেই মানবেত্তিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মহান লেনিনের নেতৃত্বে কৃশ কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষমতাদাত্ব করেন। এই বিপ্লবের প্রশংস্ত লেনিন বলেন, বিপ্লবটা হওয়া দরকার সশস্ত্র উপায়ে, কেননা শোষণ ও নিষ্পত্তিপ্রতিক চলমান সমাজব্যবস্থার প্রভুরা তাঁদের প্রভুত্ব টিকিয়ে রাখেন অর্থবলে ও অঙ্গবলে—তাঁরাই যুগ যুগ ধরে সাধারণ মানুষকে শোষণ ও শাসন করতে পারছেন বলপ্রয়োগের মাধ্যমে—তাঁরাই সহিংসতা চাপিয়ে দেন একটি সমাজ টিকিয়ে রাখার মূল উপাদান নিন্দবর্গের মানুষের উপর। সুতরাং তাঁরা শাস্তিপূর্ণভাবে তাঁদের যুগ যুদ্ধের সুবিধা মেহনতি মানুষের অনুকূলে ছেড়ে দেবেন—এটা ভাবা অস্বৃলক। ২৩ অক্টোবরের শহীদরা লেনিনের এই বজ্রব পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন। আজ যখন তাঁদের কথা বলতে হবে তখন অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে তাঁদের ভাষাতেই তা বলার জন্য।

আফ্রিকাতে একটি প্রবাদ আছে: যতদিন সিংহ-শিকারীরা শিকারের ইতিহাস রচনা করবে ততদিন সেই রচনায় শিকারীর শ্রেষ্ঠত্ব দেখানো হবে আর সিংহরা হেয় প্রতিপন্থ হবে। আজ বাংলাদেশের অর্থবল, অস্ত্রবল, প্রচার-মাধ্যম, শিক্ষিত সম্প্রদায় তথা ক্ষমতার প্রতিপন্থ ক্ষেত্র প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি জবরদস্থলে রেখেছে। আর তাই সমাজতন্ত্র

প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের পৌরবগাথা জনসমক্ষে তুলে ধরতে হলে হতে হবে ঐ সব শহীদের সঠিক উত্তরসূরী—বর্তমানে কোণঠাসা অবস্থায় থাকা সন্ত্রেও—আত্মাগে উদ্বৃদ্ধ হয়ে গভীর আত্মবিশ্বাসের সাথে প্রচণ্ড সাহস নিয়ে এবং সংগঠিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

আমি সমাজতন্ত্রের পক্ষে নিতান্তই শুন্দি এক ব্যক্তি—অক্ষম সমর্থক মাত্র। বীরগাথা রচনার দুঃসাহস আমার নেই। তবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে একযুগ সাধানুযায়ী সংক্রিয় থাকার সুবাদে শহীদ সৈনিকদের সকলকেই যনিষ্ঠভাবে জানার দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারীদের একজন আমি। অদ্যাবধি নিঞ্চিয় বাকি হয়েও তাঁদের কর্মকাণ্ডের নীরব প্রতাক্তাবাহী হিসাবে তাঁদের সম্পর্কে আরো কিছু কথা বলতে পারি বৈকি। সুবিধা একটা আছে অবশ্য: তাঁদেরকে তাঁদের মত করে তুলে ধরার চেষ্টাকালে প্রতারণার আশ্রয় নেবার কোন রাজনৈতিক, আদর্শিক বা বৈষম্যিক প্রয়োজন আমার নেই—তাঁদের মতাদর্শগত অবস্থানকে কোন গোষ্ঠীগত স্বার্থে ঘবেমেজে খণ্টিকরণে তুলে ধরার অ্যাচিত দায় যেমন আমার নেই, তেমনি ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতা-প্রত্যাশীদের হয়ে তাঁদেরকে বিকৃতভাবে হাজির করে অত্যাচারী প্রভুদের সন্তুষ্টিবিধানের কোন সারমেয় তাগিদও নেই আমার।

কমরেড মাশুকুর রহমান তোজো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন ছাত্র ইউনিয়ন করেছেন এবং কারাবরণ করেছেন। এই জেলার শ্রেষ্ঠ মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। পদার্থবিদ্যা ও গণিতশাস্ত্রে ভাবল অনার্দ নিয়ে কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন এবং গণিতশাস্ত্রে মাস্টার্স পর্যাক্রান্ত প্রথম শ্রেণীতে উল্লেখ্য হয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যান। ১৯৬৯ সালে দেশে ফিরে তিনি গাড়ি-বাড়িসহ ভাল বেতনের চাকরি পান। দেশে ফেরার পরই আমার সাথে তাঁর সাম্ভাব্য পরিচয় এবং কয়েক দফা আলাপ হয়। বিশ্ব কমিউনিস্ট আদোলনে মহাবিতর্ক এবং এদেশের কমিউনিস্ট আদোলনে এসবের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। এখানে তখন পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম.এল.) থেকে একাঙ্ক বের হয়ে পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেছে। যশোরে এই অংশের প্রতিনিধিত্ব করতেন জনাব আমজাদ হোসেন। তাঁর সাথে কমরেড তোজোর আগেই পরিচয় ছিল, তাঁর সাথেও কমরেড তোজোর অনেক আলাপ আলোচনা হয়। হয়তো আরো অনেকের সাথে তিনি আলোচনা করে থাকতে পারেন, তবে তা আমার জন্ম নেই। শুধু এটুকু জানি, আমার সাথে আলোচনায় তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। আমাকে ও আমার বজ্রবের অনেক বিষয় তাঁর ভাল লেগেছে বললেন ঠিকই, কিন্তু আমাদের সাথে তিনি থাকবেন না তাও বলে দিলেন। তিনি আমাকে বললেন, আমজাদ হোসেন বিপ্লব শুরু করে দেবার প্রশ্নে অনেক বেশি উত্তেজিত ও তপ্ত কথা বলেন।

আমাদের বজ্রবের তো বটেই, সেই সাথে আমাকেও যথেষ্ট অংগুষ্ঠী মনে হয়নি তাঁর। বরং আমজাদ হোসেনকেই বিপ্লবের প্রশ্নে তিনি বেশি অংগুষ্ঠী মনে করতেন—আমাকে তাও জানিয়ে দিলেন তিনি। এসব ব্যাপারে তিনি বিন্দুমাত্র লুকোচুরি করতেন না—যা বলার সামনাসামনি বলে দিলেন।

একে তো আমার নিজের পার্টিতে আমার অবস্থা ভাল ছিল না, সেই সাথে ঢাকান পিকিংপাহী উচ্চদরের কড়া সব বিপ্লবীদের কাছে এর বেশ আগেই আমি খুব ছোটখাটি বিপ্লবী হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিলাম। কেননা যশোর থেকে ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদিবরোধী মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য আবশ্যিক সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে আনেওয়ার জাহিদ সাহেবদের জন্তা পত্রিকায় আমজাদ হোসেন রচিত যে বিবৃতি ছাপা হয়েছিল তাতে আমি স্বাক্ষর করতে রাজি হইনি। তরিকুল ইসলাম ও খালেদুর রহমান টিচোসহ বেশ কয়েকজন এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন। আমার থেকে অনেক উচ্চদরের বিপ্লবী হিসাবে ঢাকার উত্তেজিত বিপ্লবী মহলে এঁদের নিয়ে বেশ একটা 'মারহাবা! মারহাবা!' ভাব দেখা গেল।

৬

সময় দ্রুত কেটে যেতে লাগল। এরপর মাত্র দুএকবার তোজো ভাইয়ের সাথে দেখা, সামান্য সৌজন্যমূলক কথাবার্তা। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে পাক সেনাবাহিনীর সোকেরা তোজো ভাইকে যশোর সেনানিবাসে ধরে নিয়ে যায় এবং অকথ্য দৈহিক নির্যাতন করে। এরপর শর্তসাপেক্ষে শঙ্খ সময়ের জন্য ছাড়া পান এবং কর্মসূল থেকে পাওয়া গাড়িতে করে আভীয়দের কাউকে কাউকে নিয়ে ভারতে চলে যান তিনি। আমার সাথে আবার দেখা হল সম্ভবত ১৯৭১ সালের ৮ এপ্রিল বনগাঁয়। একটা বিশেষ কাজে তিনি চার দিনের জন্য আমি বনগাঁয় গিয়েছিলাম। আবার কথা হল। তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে আমার সব কথা শুনলেন। আমি দেশে ফিরে যাব শুনে দু তিন দিন অপেক্ষা করতে বললেন। দু দিন পর তোজো ভাই এসে হাজির। পায়ে কাপড়ের জুতা, লুঙ্গি ও হাফশার্ট পরা, কাঁধে একটা ছেট ব্যাগ। বললেন তাঁর নতুন মাজদ গাড়ি। তিনি আওয়ামী লীগের তাজউদ্দীন সাহেবকে দিয়ে এসেছেন এবং তিনি আর ভারতে থাকবেন না। পুরো বিষয়টা তেবে দেখেছেন তিনি—আমার সাথে দেশে ফিরে দেশের মাটিতেই যুদ্ধ করবেন।

দেশে ফিরে ইছালী গ্রামে তিনি আমজাদ হোসেনকে ডেকে পাঠালেন এবং যেভাবে আমাকে বলেছিলেন থায় একই ভাষাতে তাকেও জানিয়ে দিলেন— তিনি আর তাঁর দলের সাথে থাকবেন না— পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির সাথে কাজ করবেন। সোজাসাপটা ভাষায় তিনি পুরো বাপারটা অন্ন কিছু সময়েই শেষ করে ফেললেন। বিপ্লবের প্রথমে প্যাচ দিয়ে কথা বলাকে তিনি দারণ অপছন্দ করতেন। এটা ছিল তাঁর চরিত্রের এক শক্তিশালী দিক। বিদেশ থেকে আসার পর বেশ কয়েকবার আলোচনার ফলে আমার কাছে খুবই পরিকল্পনা হয়ে যায়, তিনি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইতে অতি অবশ্যই সামিল হবেন। তিনি ছিলেন বিশাল হৃদয়ের মানুষ। কখনো কখনো তিনি লুঙ্গি পরে গাড়ি চালাতেন আর ড্রাইভার পাশে বা পিছনে বসে থাকত প্যান্ট-শার্ট পরে। কৌশলী প্রচারের অংশ হিসাবে এটা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব

ছিল না। তাঁর চরিত্রের গড়নটা এতটাই অসাধারণ মানবিক ছিল যে তার বহিঃপ্রকাশটা অনেক সময় অন্তর্ভুক্ত মনে হত।

এই মানুষটি যখন গ্রামে ক্যকদের মাঝে কাজ করতেন, তখন মনে হত সত্তিই তিনি একেবারে গ্রামের অতি সাধারণএকজন কৃষক-কর্মী। সামাজিক কৃতিমত্তা তাঁর আচরণে কখনোই প্রকাশ পায়নি। এসব যত সহজে লেখা হচ্ছে বাস্তবে তা কার্যকর করা ভ্যানক কঠিন। জনগণ ও বিপ্লবের প্রতি অবিশ্বাস্য রকমের আনুগত্য ও নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি সুগভীর ভালবাসাই কেবল এই ধরনের সুকৃতিন কাজ সহজেই সম্পন্ন করার ব্যাপারে কাউকে অমিত শক্তি জোগাতে পারে। আজ তিনি নেই—আমি বেঁচে আছি—আরো যাঁরা শহীদ হয়েছেন, আমার উপর তাদের প্রভাব অত্যন্ত গভীর ঠিকই, কিন্তু তোজো ভাই আমাকে সুতীব দহনের এক বিশাল ভূমি যোভাবে বিদ্ধ করে রেখেছেন তেমন আর কেউ নন। আমি মাঝে মাঝে নিয়ন্ত্রি-তাত্ত্বিক হয়ে পড়ি। শুধু মনে হয়—আমার বনগাঁ যাওয়া ঠিক হয়নি। সেখানে না গেলে তো তাঁর সাথে আমার আর দেখা হয় না। আর দেখা না হলে তিনি বেঁচে থেকে অনেক বেশি কিছু করতে পারতেন।

২৩ অক্টোবরের অন্যান্য শহীদের মধ্যে কমরেড শাস্তিকে আমি ১৯৬২ সাল থেকে চিনি। কমরেড শাস্তি মাধ্যমিক পর্যাক্রম পাশ করেন নি। কিন্তু বই পড়াকে কেন্দ্র করেই তাঁর সাথে প্রথম পরিচয়। বইগুলো, অবশ্যই, ছিল সমাজতন্ত্র সম্পর্কিত। এর আগেই সেই চিত্তাধারার সাথে কিছুটা পরিচিতি ছিল। শাস্তি ছিলেন আর এক মেরুর এক অন্তর্ভুক্ত বিশ্বয়কর চরিত্র। খাস শহরেই তাঁর জন্ম ও বিকাশ। আমার সাথে পরিচয়ের সময় লক্ষ্য করি নানা ধরনের মানুষের সাথে রয়েছে তাঁর বিচিত্র সম্পর্ক। ঠিকমত লেখাপড়া না করতে পারা ও কোন কাজের সাথে সম্পর্কিত না থাকায় এক ধরনের মানসিক অস্থিরতা তাকে ঘিরে রাখত। আমাদের আদেোলনের সাথে তাঁর সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর তিনি ধীরে ধীরে একজন সার্বক্ষণিক কর্মী হিসাবে বিপ্লবে যোগ দেবেন বলে নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকেন। অধিকাংশ সময় লুঙ্গি পরে ও কাঁধে একটা জামা ফেলে তিনি যষ্টীলো পাড়া অঞ্চলে ঘোরাফেরা করতেন। এর বাইরে বের হলে বড় অনিচ্ছায় জামাটা গায়ে দিতেন। নিজের জন্য চাহিদা বলতে তাঁর যেন কিছুই ছিল না। শিক্ষিত ও অবস্থাপনা ঘরের অনেক বন্ধু ছিল তাঁর—কেউ কিছু উপহার দিলে বাস্তুবন্দি করতেন, ব্যবহার করতে বড় একটা দেখিনি। ১৯৭০ সালে শাস্তি পার্টি সভ্যপদ লাভ করেন এবং ঐ সালের শেষদিকে আত্মগোপন করেন। আত্মগোপনে থাকার সময় তিনি জেলা কৃষক সমিতির ভারপূর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬৯-৭০ সালে তিনি কৃষক আদেোলনের সাথে গভীরভাবে মিশে যান।

কমরেড আসাদ, কমরেড মানিক ও কমরেড নজরুল ইসলাম— এরা সবাই ছিলেন ছাত্র আদেোলনের দিকপাল, এক একটি মহীরুহ। সকলেই ছিলেন উচ্চাপের জনপ্রিয় ছাত্রনেতা। এরা তিনজনই ১৯৬৪ সালে যশোর এম.এম. কলেজে ভর্তি হন। ১৯৬৫ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত যশোর জেলা ছাত্র ইউনিয়ন আনুষ্ঠানিকভাবে মঙ্গোপস্থী রা

পিকিংপছী কোন পক্ষে যোগ না দিয়ে নিরপেক্ষ থাকে। কিন্তু আমাদের জেলার আগের ছাত্রনেতৃত্বের প্রায় সকলেই পিকিং-ধারা অনুসরণ করায় এই প্রশ্নে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমরা আমাদের পরের ছাত্রনেতৃত্বনের প্রধান অংশকে পিকিং-ধারার মতাদর্শগত শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গবন্ধ করে ফেলি। আর এ কথাও ঠিক, বিশ্বব্যাপী এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট আন্দোলনে এই বিরোধের প্রভাব এতটাই প্রবল ছিল যে তা ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না এবং উচিতও ছিল না। এ ব্যাপারে আমি বেশ অভিযুক্ত হই দু পক্ষের কাছ থেকেই। কড়া পিকিংপছীরা মনে করতেন ছাত্র ইউনিয়নকে নিরপেক্ষ রেখে বিপ্লব বেশ কয়েক ঘোজন পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর মক্ষেপছীরা মনে করতেন নিরপেক্ষতার কৌশলী আচরণে পুরো ছাত্র ইউনিয়নকেই পিকিং-ধারায় গড়ে নেওয়া হচ্ছে।

আজ যখন এই লেখা লিখছি তখন দেখছি, সেই সময়ের কড়া পিকিং ও মক্ষেপছীদের প্রায় সকলেই তাদের স্ব স্ব অবস্থান পরিত্যাগ করেছেন। তবুও আমি বলব, কিছু বিষয় যেমন এড়ানো গেল না তেমনি তা খুবই সংক্ষিপ্ত হওয়ায় ভুল বোঝাবুঝির কিছু অবকাশ থাকতে পারে। বিস্তারিতভাবে লিখলে এবং তখনকার নেতৃত্বের যাঁরা আজো বেঁচে আছেন, তাঁদের কেউ আরো লিখলে সরটা মিলিয়ে অধিকতর পরিকার চিত্র পাওয়া সম্ভব হবে।

যাহোক, ১৯৬৮ সালে জেল থেকে বের হওয়ার পর সঙ্গত কারণেই আমাদের প্রজন্মের ছাত্রনেতৃত্ব আর ছাত্র আন্দোলনে থাকলেন না। সেই সময়ের আগেই আসাদ, নজরুল, মানিক ও তাঁদের অন্য বন্ধুরা ছাত্র সংগঠন ও ছাত্র আন্দোলনের প্রশ্নে একেবারে সামনের সারিতে চলে এসেছিলেন। তখন তাঁরাই সারা জেলার মূল ছাত্রনেতা হিসাবে নিজেদের অসামান্য যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হন। দেশব্যাপী তাঁদের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৬৯ সালের ছাত্র গণ-অভ্যুত্থানে জেলার বিগাট ছাত্র সমাজের সার্বক নেতৃত্ব দিয়ে ইতিহাসে তাঁরা অমর হয়ে আছেন ও থাকবেন। কমরেড আসাদ তো কিংবদন্তির জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তখন অবশ্য আসাদ কলেজ ছাত্র সংসদের ডি.পি. ও ১১ দফা আন্দোলনের সর্বদলীয় জেলা ছাত্র সংগ্রাম পরিয়েদের আহ্বায়ক ছিলেন। কমরেড নজরুল ১৯৬৭ সালেই কলেজ সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। কমরেড মানিক ছিলেন যশোর জেলা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি। এঁরা সকলেই ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দিয়ে ছাত্র আন্দোলন শুরু করার কিছুদিনের মধ্যেই কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রপ্রভুক্ত হন। ১৯৭০ সালের শেষ দিকে এঁরা সবাই পার্টির সভ্যপদ লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে কমরেড নজরুলই প্রথম ঐ পদ পান। ১৯৭১ সালে এঁরা সবাই পার্টির সার্বক্ষণিক কর্মী হিসাবে বিপ্লবের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

৭

তখনকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোচনা না করলে আমাদের কার্যক্রম ভালভাবে বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু এই নিরবেদের স্বল্প পরিসরে সেই কাজটি করা গেল না—আমি শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি পরবর্তী সময়ের জন্য। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাপরিষ্ঠতা অর্জন করা সত্ত্বেও ইয়াহিয়া-ভুট্টো চৰক ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজি হল না। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ও সামন্ত-বুর্জোয়ারা পূর্ব পাকিস্তানের তো বটেই, কেৱল প্রদেশেরই স্বায়ত্ত্বাসন দিতে কথনো রাজি হয়নি। আর কিনা পূর্ব পাকিস্তান নেতাদের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত করা! দৃদ্ধ চরমে উঠতে লাগল। আবার পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম.এল.) ও পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (এম.এল.) সহ মাও জেদংয়ের চিত্তাধারার সমর্থক কমিউনিস্ট পার্টি ও ফ্রপগুলো নির্বাচন বর্জন করে সশস্ত্র যুদ্ধের ডাক দিয়েছেন ও ছাত্র-গণসংগঠনগুলোর বিলুপ্তি ঘটিয়েছেন এবং এই প্রশ্নে ভারতের নকশালবাড়ী আন্দোলন ও সশস্ত্রযুদ্ধের ব্যাপারে কমরেড চারক মজুমদারের বক্তব্য বেশ গভীর একটা প্রভাব ফেলেছে।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে পাকবাহিনীর বৰ্বর আক্রমণের মুখে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বে ভারতে গমন করেন এবং ইন্দিরা সরকার ও তাঁর সেনাবাহিনীর সহায়তায় ক্ষমতাসীন হওয়ার চেষ্টার মূলতে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের ঘোষণা দেন। মক্ষেপছী কমিউনিস্ট পার্টি প্রায় শতাধিনভাবে আওয়ামী লীগের সাথে লেগে থাকে। মওলানা ভাসানী ও কাজী জাফর ফ্রসেসহ অনেকেই তখন ভারত প্রবাসী। এই সময়ের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিচার করলে বোঝা যাবে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে দেশের অভাসের সশস্ত্র যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া কী অসম্ভব রকমের কঠিন কাজ ছিল। ১৯৭০ সালের আগে থেকেই পার্টি-কর্মীরা নব উদোগে গ্রামে যেতে থাকেন ও ক্ষমকদের মধ্যে কাজ শুরু করেন। বাস্তবে সশস্ত্র যুদ্ধ কিভাবে শুরু করা যায় তা যাচাই করা ও তার ক্ষেত্র হিসাবে গ্রামকেই চিহ্নিত করা হয়। তখন মাও জেদংয়ের ‘গ্রাম দিয়ে শহর ঘোরাও’ করার গণকোশল—বুবো হোক না বুবো হোক—ব্যাপকভাবে গৃহীত। ছাত্র-যুবকদের মধ্যে মার্কিসবাদ-লেনিনবাদ ও মাওয়ের চিত্তাধারার দারুণ প্রভাব পড়েছে। তাঁদের মধ্যে ‘গ্রামে চল’ আওয়াজ বড় রকমের আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

কিন্তু লড়াইটা কার বিরুদ্ধে? লড়াইটা হচ্ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্র ও তার স্থানীয় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভিত্তির বিরুদ্ধে। স্বভাবতই স্থানীয় মুসলিম লীগ, জামায়াতসহ অন্যান্য ধর্মান্ধ মৌলবাদী গোষ্ঠী ও পাকিস্তানের সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম.এল.) সংগ্রাম করছিল। উপরোক্তদের বাদ দিলে দেশে আওয়ামী লীগ, মক্ষেপছী কমিউনিস্ট পার্টি, ভাসানী ন্যাপ, মোজাফফর ন্যাপ

সহ অন্যান্য অনেক বাজনৈতিক শক্তির বিরাট অনুপস্থিতি ছিল। ফলে প্রথম কয়েক মাস প্রতিভ্রিয়াশীল শক্তি দেশের অভ্যন্তরে লড়াইতে কমিউনিস্ট পার্টি (এম.এল.) সহ অন্যান্য কমিউনিস্ট গ্রুপকেই তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য রাখত হিসাবে বেছে নেয়। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের বিচারে এ রকম ঢালাও বক্তব্য ঠিক নয়—কেননা যাঁরা ভারতে চলে গিয়েছিলেন তাঁরা ও যেমন দ্রুত দেশের অভ্যন্তরে যোগাযোগ স্থাপন করেন তেমনি আওয়ামী লীগসহ সব দলেরই অনেক কর্মী দেশের ভিতর পাকবাহিনী ও তার দালালদের বিরক্তে বীরতুপূর্ণ লড়াই চালিয়ে যান। তবে এটা ঠিক, কমিউনিস্টরা পাকবাহিনীর বিরাট চাপের সম্মুখীন ছিলেন। ১৯৭১ সালের মার্চে পর প্রথম কয়েক মাস—অস্তত আমাদের জেলার বিশ্বীর্ণ অধ্যন জুড়ে—পাকবাহিনী ও তার দোসরদের বিরক্তে মুরগণ লড়াই করেছেন পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম.এল.) নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা।

এর পরের অধ্যায় আরো কঠিন। ভারতে ট্রেনিংপ্রাণ মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশ ও মুজিব বাহিনীকে দেশে চুকে কমিউনিস্ট দমন করার নির্দেশ দেওয়া হল। ভাবটা এমন—ভারত সরকার ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে যুদ্ধ না করলে সে যুদ্ধ দেশেরে বিবর্জিত হবে! যখন জনগণ অসহায়, যখন দানে তাদের পাশে দাঁড়ানোর প্রায় কেউ নেই, ঠিক সেই সময় যাঁরা এই বাংলার মেহনতি মানুষের জন্য অকাতরে প্রাপ বিসর্জন দিলেন, তাদের আত্মায় কতখানি ন্যায় তার প্রমাণ কি ভারত সরকার ও ভারতপ্রবাসী আওয়ামী লীগের কাছে দিতে হবে?

যাহোক, প্রথমে কমরেড নজরুল ইসলামকে পাকবাহিনী মনিরামপুর এলাকা থেকে প্রেঙ্গুর করে যশোর সেনানিবাসে নিয়ে যায় এবং হত্যা করে। কমরেড হাফিজ নিহত হন সাতক্ষীরায়। তিনি আওয়ামী লীগ পাঞ্চাদের হাতে নিহত হয়েছেন বলে শোনা যায়। কমরেড মাসুকুর রহমান তোজো, কমরেড আসাদুজ্জামান, কমরেড সিরাজুল ইসলাম শাস্তি, কমরেড মহিউদ্দিন আলী আকতার ও কমরেড আবদুল মতিনসহ আমাদের পার্টির একটা বড় অংশ মনিরামপুর ও কেশবপুর হয়ে খুলনার ডুমুরিয়ায় সরে যেতে বাধ্য হন। অঙ্গোব মাসে সারা জেলায় সংগ্রামরত কমিউনিস্টদের উপর চারদিক দিয়ে বিপর্যয় নেওয়ে আসে। ডুমুরিয়া থেকে আবার স্থান পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন উপরোক্ত কমরেড। কমরেড আকতার ভিন্নপথে সীমান্ত অতিক্রম করেন—তাঁর জন্মস্থান পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায়। বাদুরাকিরা যশোর শহরের আশেপাশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাদের সাথে ধোপাদীর কমরেড সিরাজুল ইসলামও ছিলেন। গোপনে তাঁরা চিনেটোলায় এক বাড়িতে অবস্থান নেবার পর কমরেড মতিনকে যশোর শহর ও আশেপাশের এলাকার খোঝখবর নিতে পাঠানো হয়, যাতে করে একটি সুবিধামত ভাল জয়গায় সকলে সরে যেতে পারেন। আবদুল মতিন চলে যান, কিন্তু অন্য কোথাও সরে যাওয়ার আগেই সশস্ত্র রাজাকারদের হাতে ধরা পড়েন কমরেড তোজো, শাস্তি, মানিক, আসাদ ও সিরাজুল ইসলাম।^{১০} পাকিস্তানের এইসব ধর্মান্ধ দালাল অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতায় এঁদের হত্যা করে। সৌভাগ্যক্রমে ধোপাদীর সিরাজুল ইসলাম কোনক্রমে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

যাঁদের সম্পর্কে স্থল পরিসরে আমাকে কিছু লিখতে বলা হয়েছে তাঁদের সম্পর্কে এত স্থল পরিসরে কিছু না লেখাই ভাল। তাঁরা তো কারো প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে কখনো নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না। অথবা আমাদের কাছে দাবি জানাতেও আসবেন না তাঁদের জন্য কোন স্মৃতিস্তম্ভ গড়তে বা দিবসটি উদযাপন করতে। এই জেলার সমাজপতিদের কাছে তাঁরা যেমন স্মৃতির 'আপদ', বৈষয়িক হিসাবে তত্ত্বিক 'নিরাপদ'ও বটে। কিন্তু এদেশের মেহনতি মানুষের মুক্তির জন্য তাঁদের মহান আত্মাগ কখনোই মিল হবার নয়। স্বীকার করতেই হবে, তাঁদের যাঁরা উত্তরসূরী তারা দুঃখজনকভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠ। তাতে কিছু যায় আসে না। তাঁদের উচিত বারবার উচ্চকচ্ছে এইসব শহীদদের প্রতি সম্মান জানানো। তাঁদের কাছে একটাই অনুরোধ—যখন জালিমের বেয়েনেট আমাদের প্রিয় বন্ধুদের খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করছিল তখন তাঁরা নিশ্চিতভাবেই বিশ্ববীর মৃত্যু বরণ করেছেন এই প্রশংসিতে যে এই হত্যার বদলা একদিন অবশ্যই নেওয়া হবে।

সুতরাং তাঁদের স্মরণ করা তখনই অর্থবহ হবে যখন তাঁদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করতে যথাযথ প্রস্তুতি ও প্রতিজ্ঞা নিয়ে কাজ আরম্ভ করা যাবে। তাঁদের হত্যার প্রতিশোধ মানে কয়েকজন হত্যাকারীকে খুঁজে হত্যা করে ফেলা মাত্র নয়। বরং জনগণকে সংগঠিত করে, জনগণের উপর ভিত্তি করে এবং জনগণের দ্বারা সহিংসতাভিত্তিক এই চলমান সমাজব্যবস্থাটাকে সম্মুলে উচ্ছেদ করাই—জনগণতাত্ত্বিক বাংলাদেশ কায়েম করাই—হবে যথার্থ প্রতিশোধ।

প্রথম ভাগ: কার্তিক-অঝহায়গ ১৪১৩ ॥ নভেম্বর ২০০৬
দ্বিতীয় ভাগ: শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪০২ ॥ আগস্ট ১৯৯৫

মন্তব্য

১. কমরেড আবদুল মতিন আন্যানিক ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত কমরেড আবদুল হকের নেতৃত্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম.এল.) সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। উল্লেখ্য কমরেড আবদুল হকের নেতৃত্বাধীন পার্টি ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত 'পূর্ব পাকিস্তান' নাম ব্যবহার করত। কমরেড মতিন ১০ জানুয়ারি ২০০২ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট লীগের পলিট্র্যুরোর সদস্য ছিলেন।

বর্তমান প্রবেক্ষে কমরেড নূর মোহাম্মদ। ১৯৭১ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম.এল.) সামরিক কমিশনের আহ্বায়ক ছিলেন। ১৯৭৩ সালের জানুয়ারিতে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি থেকে তিনি পদত্যাগ করেন। —সম্পাদক।

২. দলিলটি লেখা হয় পার্টির হেডকোর্টার পুলুমে। পুলুম গ্রামটি বর্তমান মাঙ্গাজ জেলার শালিখা থানার অধীন। ঐ সময় কমরেড বিমল বিশ্বাস তৎকালীন নড়াইল মহকুমার গোবরা থেকে পুলুম আসেন। জেলা কমিটির বৈঠকে দলিলটি পেশ ন করা পর্যন্ত তিনি কমরেড নূর মোহাম্মদের সঙ্গে অবস্থান করেন। কমরেড বিমল বিশ্বাস বর্তমানে বাংলাদেশের ওয়াকার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক। তিনি ১৩ মে ১৯৭৪ থেকে ২০ নভেম্বর ১৯৭৯ পর্যন্ত বিনাবিচারে কারাবন্দি ছিলেন। প্রেক্ষারের পর বাকীবাহিনীর হাতে তিনি অচির নির্বাচন ভোগ করেন।
৩. এটি একটি সংশ্লিষ্ট ভূমিকা বিধায় ঐ সময়ের সর্ব বর্ষনা দেওয়া গেল না।
৪. কমরেড আবু বকর জাফরগাঁও ওরকে শীপ ১৯৭৪ সালের ৪ নভেম্বর যশোরের কোটাইদপুরে নির্বাচিত ও জাতীয় বঙ্গীবাহিনীর হাতে নিহত হন।
৫. 'কমরেড ফজল' ছিলেন কাছেরই এক গ্রামের। তিনি উপরোক্ত শহীদদের সাথে শহীদ হন। তাঁর মৃতদেহ পরিবারের লোকজন নিয়ে যায়। খুবই দুর্বিজ্ঞক ব্যাপার, যথাযথ তথ্যের অভাবে তাঁর সম্পর্কে কিছু লিখতে পারিনি। অনেকেই তাঁদের উপর আরো বিস্তারিত লেখার দাবি করেছেন। এই লেখা পুনঃপ্রকাশের সুযোগ পেলে সকলের সম্পর্কে বিস্তারিত লেখার চেষ্টা অবশ্যই করব। (এ মন্তব্য আগস্ট ১৯৯৫ সংস্করণের)

৫

বাঙালি জাতি, বাঙালি মুসলমান, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশ

আবু জাফর শামসুন্দীন স্মৃতি বক্তৃতা ২০০৩

সৈয়দ আবুল মুক্তু

The element behind patriotism is nationality.

—Ibn Khaldun, *The Muqaddimah*.

Nationalism is a doctrine invented in Europe at the beginning of the nineteenth century. ... Briefly, the doctrine holds that humanity is naturally divided into nations, that nations are known by certain characteristics which can be ascertained, and that the only legitimate type of government is national self-government.

—Elie Kedourie, *Nationalism*, 1994, p. I.

১

আবু জাফর শামসুন্দীন ছিলেন একজন বাঙালি মুসলমান লেখক ও বুদ্ধিজীবী। তিনি ছিলেন প্রথমত বাঙালি, দ্বিতীয়ত মুসলমান এবং দ্বৃয়ের সমন্বয়ে বাঙালি মুসলমান। বাঙালি মুসলমান তাঁর স্বতন্ত্র পরিচয় এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়। এই পরিচয় দ্বারা তিনি যে সন্তা অর্জন করেন তা হল তিনি বাঙালি হয়েও যে কোন বাঙালি হিন্দু বা বাঙালি বৌদ্ধ থেকে স্বতন্ত্র। অন্যদিকে এই পরিচয় দ্বারা তিনি যে মানবিটিতে পরিণত হন তা হল মুসলমান হলেও যে কোন বাঙালি হিন্দু বা বাঙালি বৌদ্ধ কিংবা বাঙালি খ্রিস্টানের মতই তিনিও বাঙালি: ধর্ম-বর্গ নির্বিশেষে সকল বাঙালির সমন্বয়ে গঠিত বাঙালি জাতির একজন। সেই বাঙালিত্ব অর্জনে মুসলমানিত্ব কোন বাধা নয়—হিন্দু বাঙালির সঙ্গে তাঁর কোন কোন বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু কিছুমাত্র বিরোধ নেই। সে কারণেই নিজেকে মুসলমান পরিচয় দিতে তাঁর একটুও হীনস্মরণ্যতা ছিল না। বাঙালিত্বের জন্য ছিল তাঁর অসামান্য অহক্ষার।

এই বাংলাদেশে যার জন্ম কুড়ি শতকের দ্বিতীয় দশকের শুরুতে তার আত্মপরিচয় নিয়ে নানারকম প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। বিষয়টি আবু জাফর শামসুদ্দীনকে ভাবিত করেছে এবং তা নিয়ে তিনি লেখালেখিও করেছেন। তাঁর মন জানবার জন্য আমরা তাঁর আত্মজীবনী আগ্রহ্যতি পাঠ করতে পারি। তাতে শাঙ্গালির প্রথম আট দশকের পূর্ব বাংলার একজন বাঙ্গালি মুসলমানকে পাওয়া যায়। ১৯২০ দশক থেকে ১৯৭০ দশক পর্যন্ত সময়ে একজন গড়গড়তা বাঙ্গালি মুসলমানের পক্ষে যতটা মুক্তমনের অধিকারী হওয়া সম্ভব, আবু জাফর শামসুদ্দীন ততটা হওয়ার সাধ্যমত ছেষ্টা করেছেন। সাধ্যমত বঙ্গাম এ কারণে যে বিভিন্ন হওয়ার মত পরিপন্থিক পরিস্থিতি ও চাপ ছিল প্রবল। সেই চাপের মুখে কোন বাঙ্গালি মুসলমানের পক্ষে অবিচলিত থাকা প্রায় অসম্ভব ছিল। এ সময় মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য এশিয়া ও স্পেনের মুসলিম সভ্যতা বাঙালি মুসলমানের কাছে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ও আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে যে তার পক্ষে বাংলাদেশ ও উপমহাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতি কর্মই গুরুত্ব পেতে থাকে।

১৯৫০ দশক পর্যন্ত যে কোন শিক্ষিত বাঙ্গালি মুসলমানের পোশাক-পরিচ্ছন্নের সাথে তার পোশাকের তুলনা করলেই বোঝা যায় যে সে আর সকল বাঙালির মত নয়। বাঙালিজুর অভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বাইরেও তার একটি আলাদা আভিক ও বাহ্যিক পরিচয় রয়েছে, তাকে সামগ্রিকভাবে বিচারের জন্য যার শুরুত্ব মোটেও কম নয়। পরিত্যাজ্ঞাও নয়। ওটা ছাড়া তার চলে না বলে সে মনে করে। তাই বাঙালি মুসলমানের শুধু একটিমাত্র ভাষা—তার মাত্তভাষা—বাংলাতেও ত্বক্ষা মেটে না তার। দ্বিতীয় ভাষা বা সরকারি ভাষা ইংরেজিতেও তার মন ভরে না, তাকে সে আপন মনে করতে পারে না। সে মনে করে বিদেশ ইংরেজি নয়, 'মুসলমানদের ভাষা' আরবি, ফারসি বা উর্দু জবানও তার কিছু আয়তে থাকা অতি আবশ্যিক। সেগুলোর চাচা ছাড়া সে অসম্পূর্ণ।

ঠাকুরমার কুলি'র চেয়ে আলেক্ষ লায়ল'র কাহিনী তাকে বেশি মুঝ করে। অতীশ দীপঙ্করের চেয়ে ইবনে সিনা বা আল গাঙ্গালি তার নিকটতর। বাংলাসেনের চেয়ে বৈরাম থাকে তার আপনতর মনে হয়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুণের চেয়ে খলিফা হারুন-উর-রশিদ তার নিকটতর। পাজামা-পাঞ্জাবিতে কিংবা প্যাট-শার্টে অবস্থাপন্ন মধ্যবিষ্ণু বাঙালি মুসলমানের পরিচয়টি যেন অসম্পূর্ণ হেকে যায়। একটি শেরোয়ানি বা আচকান তার চাই। গরিব যে মুসলমান কৃষকটি, যার জামা-জুতা কিছু থাক বা না থাক কোনোরকমে একটি লুঙ্গি ও পিরহান থাকলে হয়, একটি কিস্তি টুপি ছাড়া তার মাথাও ঠাণ্ডা হয় না, বৃক্ষও শীতল হয় না। স্নো-পাউডার প্রভৃতি সুগন্ধির সঙ্গে একটুখানি আতর না হলে বাঙালি মুসলমানের মন ভরে না। যার অবস্থা ভাল এবং ভদ্রলোক বলে পরিচিত, ওডিকোলনের চেয়ে মেশাকে আম্বর তার বেশি হিম। একটা তুকি টুপিতে যে তার খোলতাই হয় তা নয়, ওটা ছাড়া মেন তার মাথা থালি খালি টেকে।

বেশি বইপত্র পড়ার প্রয়োজন নেই, আমাদের দেশের ১৯২০, '৩০, '৪০ এবং '৫০ দশকের মুসলমান রাজনৈতিক নেতাদের আনুষ্ঠানিক পোশাকের দিকে তাকালে বিষয়টি অনুধাবন করা সহজ হবে। বিভিন্ন সমাবেশ-সম্মেলন উপলক্ষে তোলা তাদের

গ্রন্থ পোর্টেটগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তারা যে পোশাকে সজ্জিত তা যে কোন হিন্দু বা বৌদ্ধের পোশাকের চেয়ে আলাদা। পোশাক আলাদা হয় মন আলাদা হলে। মন অর্থাৎ একজন মানুষের চিন্তা চেতনার বিষয়টিই অসেল। কারণ সে যেভাবে চিন্তা করে আচরণে ও কাজে তারই প্রতিফলন ঘটে।

২

একটি বিশ্বার্থ সমতল ও উর্বর ভূঁতু, একটি বিরাট জনগোষ্ঠী, একটি অতি সমৃদ্ধ ভাষা ও সংস্কৃতি, একটি প্রাচীন সভ্যতা, সুনীর্ধ ইতিহাস ও অভিন্ন জীবনধারা ইত্যাদি থাকার ফলে বাঙালির জাতিরাষ্ট্র গঠনের সকল সম্ভাবনা অনেক আগে থেকেই ছিল। হেসেন শাহী শাসকদের সময় (১৪৯৪-১৫৩৮) বলে একটি জাতিরাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল।

একটি বাস্তীয় ভূঁতু বাঙালির জাতিগঠনের সব রকম বলিষ্ঠ উপাদান থাকা সত্ত্বেও ইংরেজ ঔপনিবেশিক আমল থেকেই দিনির অবাঙালিদের দ্বারা শাসিত হওয়ায় স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে তার অভ্যন্তর অসম্ভব হয়ে পড়ে। কি ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসক, কি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ, কি মুসলিম লীগ নেতা—কেউই চাননি বাঙালি একটি সুসংহত জাতি হয়ে উঠুক। তাঁরা বাঙালির জাতীয় সংহতি নষ্ট করতে ধর্মীয় সম্প্রদায়িকভাব অন্তর্ভুক্ত সুকোশলে প্রয়োগ করে সফল হন। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বাঙালির একটি জাতিরাষ্ট্র গঠিত হলে তা হবে দক্ষিণ এশিয়ার একটি জনবহুল শক্তিশালী রাষ্ট্র। বাঙালির দেমন প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে তেমনি রয়েছে তার মেধা। এ জাতির জ্ঞানচর্চার প্রতিহ্য দীর্ঘকালে।

অবাঙালি পশ্চিম শাসকশ্রেণী জানতেন বাঙালির জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে মাড়োয়ারি, বোম্বেওয়ালা আর ইসমাইলি খোজাদের সর্বভারতীয় ব্যবসায়ী স্বার্থ বিপন্ন হবে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে বিভেদের বীজ আগেই রোপিত হয়েছিল তাই ব্যবহার করা হল বাংলাবিভাগের জন্য। একভাগ গেল পাকিস্তানে, আরভাগ ভারতে। ইংরেজের সৃষ্টি ও অনুগত হিন্দু ও মুসলমান মধ্যশ্রেণীর নেতৃবৃন্দ বাংলাবিভাগে চূড়ান্ত সাফল্যের পরিচয় দিলেন। কংগ্রেসের হিন্দু নেতাদের মৌখিক বিরোধিতা ও পরোক্ষ প্রতিপোষকভাব মুসলিম লীগের জিজ্ঞাতিত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করল।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই বাঙালি মুসলমানের মধ্যে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটে তা পশ্চিম পাকিস্তানিদের, বিশেষ করে পাঞ্জাবিদের, নিষ্ঠুর শাসন-শোষণের প্রতিক্রিয়ায়, অন্য কোন কারণে নয়। এর তাৎক্ষণিক কারণ বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর শাসকদের নির্লজ্জ আঘাত। পূর্ব পাকিস্তানের বা পূর্ববঙ্গের মানুষের—হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ নির্বিশেষে সকলের—জাতীয়তাবাদী চেতনায় পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের, না হিন্দু না মুসলমান, কেউই সমর্থন দিয়ে সংহতি প্রকাশ করে এগিয়ে আসেন। তাঁরা—বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি

হিন্দু বৃদ্ধিজীবীরা—দূর থেকে সর্বাত্মক সমর্থন দিয়েছে, উৎসাহ দিয়েছে, কিন্তু এ কথা কদাচ বলেছে যে আমরাও বাঙালি জাতীয়, আমরাও আপনাদের সঙ্গে একত্র হয়ে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করব। দিঘির নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসার অগ্রহ-অভিপ্রায় আকাঞ্চকা-মনোরূপ তাদের মধ্যে কিছুমাত্র লক্ষ্য করা যায়নি। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি-অবাঙালি সকল মুসলমানই বাঙালি 'জাতীয়তাবাদী' চেতনার মধ্যে পাকিস্তান ধ্বনি করার ও মুসলমানদের ক্ষতিগ্রস্ত করার মডেলের আভাস পেয়ে শক্তিত হয়েছে। সুতরাং ১৯৪৭-উত্তর বাঙালি 'জাতীয়তাবাদী' চেতনা পূর্ব বাংলার মানুষের নিজস্ব ব্যাপার, সকল বাঙালির সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত তা এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদের এক খণ্ডিত রূপ, অখণ্ড রূপ নয়। তা অনেকটাই ব্রিটিশ যুগের মুসলিম জাতীয়তাবাদেরই এক উন্নত সংস্করণ। ব্রিটিশ অবস্থায় পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির জনগণ দুই পরাশক্তির প্রভাবে ছিল বটে কিন্তু তাদের জার্মান জাতীয়তা দ্বিখণ্ডিত হয়নি—তাদের একটি হওয়ার আকাঞ্চকা অঙ্গুল ছিল। তবে তাদের জাতীয়তা ছিল অভিন্ন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ঘৃত্যন্তে দুই কোরিয়া দুই ধরনের শাসনব্যবস্থা রয়েছে কিন্তু কোরিয় জাতীয়তার প্রশংসন কোন দিমত নেই দুই দেশের কোরিয়দের।

দুই বাংলার বাঙালিদের অবস্থা তেমন নয়। এই না থাকার একটিমাত্র কারণ ধর্ম: হিন্দুত্ব ও মুসলমানিত্ব। পশ্চিম বাংলার অধিকাংশ বাঙালি হিন্দু; তারা ধর্মীয় কারণে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের ছায়ার নিচে থাকতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। বাংলাদেশের অধিকাংশ বাঙালি ইসলাম ধর্মবলী; তারা কষ্টে-সৃষ্টে যেভাবেই হোক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রকাঠামোতেই থাকতে চায়। সেই স্বাধীন স্বতন্ত্র থাকার আকাঞ্চকা তাদের জাতীয়তাবাদ এবং এই জাতীয়তাবাদের নামই ছিল 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'। তা যে সত্য সত্য আধুনিক সেকুলার জাতীয়তাবাদ নয়, এক ধরনের 'মুসলিম বাঙালি জাতীয়তাবাদ', তার প্রকাশ ১৯৭৫ সালের পর থেকে তো প্রকটভাবেই ঘটেছে। ১৯৭২-৭৫ পর্বেও সে উপাদান অনুপস্থিত ছিল না। তবে তখন যা ছিল প্রচন্ড তা আজ প্রকট।

মুসলিম জাতীয়তাবাদ থেকে মুসলিম মৌলবাদের উত্থান ঘটেছে। পাকিস্তানে যেমন ঘোষিত ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা, তারাতে হিন্দুত্ব, তেমনি বাংলাদেশে আজ মুসলমানিত্বের জয়জয়কার। আধুনিক জাতীয়তাবাদের প্রধান স্তুতি যে সেকুলারিজম তার নাম-নিশানা উপমহাদেশের দেশগুলো থেকে উৎপাদ হয়েছে—বাংলাদেশ থেকেও।

অধীকার করা যাবে না, ইসলামের ভিত্তিতেই মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সেই আন্দোলন হয় মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে। সেই জাতীয়তাবাদের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না। তবে অনেকগুলো ঐতিহাসিক বাস্তবতা সেই আন্দোলনে তীব্র গতিবেগ সঞ্চার করে। তারাতের মত অত বড় না হলেও পাকিস্তান ছিল একটি সাম্রাজ্যরাষ্ট্র (Empire State),

জাতিরাষ্ট্র (Nation State) নয়। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসকদের কাছ থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার পর দেখা গেল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের আচরণ ও শোষণ-নিপীড়ন ইংরেজ শাসকদের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। নতুন শাসকদের শোষণ-অভ্যাচের, বিশেষ করে তাদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের, প্রতিবাদে এই সাম্রাজ্যরাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয় বাংলাদেশ। ১৯৭১ সালে সশস্ত্র সংগ্রামের ভিত্তি দিয়ে গঠিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম নতুন একটি জাতিরাষ্ট্র। এবার তার আদর্শ হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা। মনে রাখতে হবে ১৯৪৭ সালের চেয়ে ১৯৭১ সালে এই ভূখণ্ডে মুসলমানের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। আর অমুসলমানের সংখ্যা ২৩ বছর আগের তুলনায় অনেক কমে গিয়েছিল।

বাংলাদেশের যে ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ ঘোষিত হল তা ইসলামহীন সেকুলারিজম নয়। কাবণ মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ইসলাম-সংক্রান্ত অনুষ্ঠান একটি বেশিই যেন প্রচারিত হত। হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্ম নিয়ে বিশেষ কিছুই হত না। কিন্তু কেন তা হত? তা হত এই জন্য যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান শ্রেতার কাছে ইসলামি অনুষ্ঠানের বিশেষ আবেদন থাকে তার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। বাংলাদেশ কি সেন্দিন 'ধর্মনিরপেক্ষ' হতে চেয়েছিল নাকি অসাম্প্রদায়িক হতে চেয়েছিল? সেন্দিন বাংলাদেশের ধর্মবলী নির্বিশেষে বাঙালি জনগণ চেয়েছিল অতীতের সাম্প্রদায়িকতার বিষ ধূয়ে-ধূছে একটি সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতিপূর্ণ, অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে—সেকুলার হতে নয়।

সন্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সেকুলারিজমের কোন এজেন্ট ছিল না। সেকুলারিজম ও নন-কমিউনালিজমের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ, কিন্তু দুটি এক জিনিস নয়। অনেকেই এদের এক করে গুলিয়ে ফেলেন এবং ভুল করেন সেখানেই। পৃথিবীতে নন-কমিউনাল রাষ্ট্র আছে অনেক কিন্তু সেকুলার রাষ্ট্রের সংখ্যা খুব কম। শুধু কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলোই সত্যিকারের সেকুলার রাষ্ট্র। অনেক সময় শব্দের অপ্রয়োগ বড় বিঅস্তির জন্য দেয়। ভুল বোকাবুকির সৃষ্টি করে। পরিণামে ঘটে নানান বিপন্নি।

৩

জাতিরাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ কী প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হল তা বিচার-বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সেই বিচার বাদ দিয়ে ভাসা-ভাসা আবেগের বশে দেশপ্রেমের পরিচয় দিলে দেশের কোন লাভই হবে না, করা হবে আত্মপ্রবৃত্তি। একান্তের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বেশিরভাগের বয়স ছিল ত্রিশ-বৃত্তির বছরের নিচে। অধিকাংশ সেষ্টের কমান্ডারের বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ বছরের কম। তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের কোন ভারতবিদ্রে বা হিন্দু-বিক্রমপতা ছিল না বললেই চলে, কারণ তারা কখনো উচ্চশ্রেণীর হিন্দু জমিদার-মহাজনের শোষণ-নিপীড়ন, দুর্ব্বাহার-তাচিল্য-অবহেলার শিকার হননি। পাকিস্তানি শাসকদের প্রচারণা সত্ত্বেও পূর্ব বাংলার নতুন প্রজন্মের মুসলমান

তরণেরা সাম্প্রদায়িক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে একান্তের পূর্ব বাংলার মেট জনগোষ্ঠীর অর্ধেকের বেশির বয়সই ছিল চল্লিশ বছরের বেশি। তারা অবিভক্ত বাংলার বহু বেদনার স্মৃতি তখনো বহন করছিল। তারা একদা নির্মল সাম্প্রদায়িক রাজনীতির শিকার হয়েছিল। কিছু ব্যক্তিক্রম বাদে তাদের প্রায় সকলেই ছিল মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনার ধারক-বাহক, মনে মনে তারা ছিল ভারতের প্রতি সন্দেহপ্রণালী, হিন্দুদের প্রতি সহানুভূতিহীন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানি মিলিটারি জান্তার কারণেই যখন মুক্তিযুদ্ধে ভারত সর্বাত্মকভাবে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয় তখন তা দেশের প্রায় পক্ষের শতাংশ বয়স্ক মানুষের মনে নতুন কোন আশাবাদের জন্ম দেয়নি। আশঙ্কার জন্মাই দিয়ে থাকবে। কারণ সেদিন জনগণ ‘স্বাধীনতা’ চেয়েছিল—ইসলামাবাদের পরিবর্তে দিল্লির ‘আধিপত্য’ প্রত্যাশা করেনি। এর মধ্যেই কর্টের পাকিস্তানবাদীরা স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে এবং ভারতের বিরুদ্ধেও প্রকশ্যে ও গোপনে তৎপর হয়। তারা স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য জীবন উৎসর্গ করে। হত্যা করতে থাকে প্রগতিশীলদের। কিন্তু স্বাধীনতার পক্ষের মানুষের সংখ্যা পাঁচাশব্দী শতাংশের বেশি হওয়ায় তাদের নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হয়নি। তা না হলেও অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে কল্পিত ও হত্যা করতে তারা ভালমতই সফল হয়। আজকে বাংলাদেশে ইসলামপুর্বীদের উত্থানের কারণও তা-ই।

অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বা মুজিবনগর সরকারের অন্যান্য নেতা সাংবিধানিক রাজনীতি ও সংস্কুলীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন, তাদের কারোই গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি ও প্রশংসন ছিল না। সুতরাং তাঁরা কোন বড় শক্তির সাহায্য ছাড়া কিভাবে একটি হিস্ত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করবেন? সম্মতিযুদ্ধের তো নয়ই, গেরিলা যুদ্ধেরও মানসিক প্রস্তুতি ছিল না দেশবাসীর ও নেতাদের। পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক বিতাড়িত মানুষদের আশ্রয়, খাদ্য, প্রয়োজনীয় অর্থ, অন্তর্শস্ত্র, প্রশিক্ষণ, বণকোশল সবই মুক্তিকামী বাংলাদেশকে ভারত সরকার এবং ভারতীয় জনগণ উপহার দেয় এবং প্রয়োজনের তাগিদেই সেগুলো গ্রহণ করতে বাধ্য হয় বাংলাদেশ। সেদিন বাংলাদেশের শুধু ছিল তার মুক্তিকামী মানুষের অটুট মনোবল ও অবিচল দেশপ্রেম। কিন্তু সেই সকল পূর্ণ মুহূর্তে অর্থ, আশ্রয় ও সামরিক প্রশিক্ষণ ছাড়া শুধু মনোবল ও দেশপ্রেম দিয়ে অন্ত সময়ে বড় অর্জন সম্ভবপ্রয় ছিল না। তাই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার সমস্ত ব্যাপারটি অনিবার্যভাবে ভারতের হাতে ঢেলে যায়।

ইরনে খালদুরের যে উদ্ভৃতি উপরে দেওয়া হয়েছে তাতে বলা হচ্ছে জাতীয়তাবোধের মধ্যেই দেশপ্রেম নিহিত। ২৩ বছরের বৈষম্যময় ও বৈমাত্রেয় আচরণে এ দেশের সংখ্যালঘু হিন্দুরা ভেবেছিল সকলের মিলিত সংগ্রামের মাধ্যমে যে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সেখানে তারা পাবে সমানাধিকার ও অবৈষম্যমূলক আচরণ। তারা উপলক্ষ করার প্রয়োজন বোধ করেনি, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে অবৈষম্যমূলক আচরণ আশা করা দুরাশাই বটে। তাদের সেই ভুল ভাঙ্গে স্বাধীনতার অব্যাহতিপ্রয়োগ পরই। একটি উদাহরণ দেই: পাকিস্তানিরা রমনা কালীমন্দির ঘুঁড়িয়ে দেয়। হিন্দুমন্দির হলো

সেটি বাংলালি জাতির হেরিটেজ স্থাপত্য, দেশের সকল মানুষের সম্পত্তি। কালীমন্দিরের পরিবর্তে পাকিস্তানিরা যদি একটি মসজিদ ভাঙ্গত সেটি স্বাধীনতার ছয় মাসের মধ্যে পুনর্নির্মিত হত। স্বাধীনতার পর রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট পুনর্নির্মাণ হতে লাগল, রমনা কালীমন্দিরের কথা ভুলে গেল সরকার ও জনগণ। বাংলাদেশের ধর্মীয়-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিষয়টি তাংপর্যপূর্ণ নয় কি?

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সমগ্র জনগোষ্ঠী সর্বান্তকরণে সমর্থন করে। কিন্তু স্বার্থপর শিক্ষিত বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্ব ও প্রাধান্য থাকায় ঐ আন্দোলন থেকে যে বিজয় অর্জিত হয় তাতে গোটা জনগোষ্ঠী সর্বদা উপকৃত হয়নি। বামপন্থী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বুর্জোয়া ও পাতিবুর্জোয়াদের সংগ্রাম। পক্ষান্তরে কমিউনিস্টদের সংগ্রাম হল শ্রেণীসংগ্রাম; যেখানে সকীর্ণ জাতীয়তাবোধ ও সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিউনিস্ট বা বামপন্থীদের নেতৃত্বে হয়নি। তবে এতে তাদের পূর্ণ সমর্থন ও সর্বাত্মক সহযোগিতা ছিল।

রাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার উপাদান অনুপস্থিত—তা নয়। কারণ সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু হিন্দু-মুসলমানের কথা বাদ দিলেও এই বাংলাদেশ—কি অবিভক্ত কি বিভক্ত—আরো বহু ক্ষুদ্র জাতির বাসভূমি। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলায় কথা বলতে জানে। তবে তাদের নিজেদের আলাদা ভাষা-সংস্কৃতি রয়েছে। বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের ধাক্কায় তাদের জীবনে বিকল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। যে আন্দোলনের প্রবণতা ও পরিচালক মধ্যবিত্ত সুবিধাবাদী বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবী এবং সাম্রাজ্যবাদীদের মদদপূর্ণ নানা গোষ্ঠী, তার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার উপাদান থাকবেই। তাতে সংখ্যাগুরুরাই সবকিছু—সংখ্যালঘুরা কৃপার পাত্র মাত্র। একই সঙ্গে কেউ জাতীয়তাবাদী ও আন্তর্জাতিকতাবাদী বা বিশ্বাসান্বতাবাদী হতে পারে না। জাতীয়তাবাদপ্রসূত দেশপ্রেম অনেক সময় ট্রাইবেলিজনেও পরিগত হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—‘সমষ্টিগত স্বর্থপরতায় পর্যবেক্ষণ হয়।

একালের ইরানি চিন্তাবিদ ড. আলি মোহাম্মদ নাকাভি তাঁর ইসলাম অ্যান্ড ন্যাশনালিজম গ্রন্থে বলেছেন, ইসলামের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের সংঘর্ষ অনিবার্য।^১ যেহেতু ইসলাম একটি স্থতজ্ঞ আধ্যাত্মিক, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনব্যবস্থা, কতগুলো বিশেষ বিশ্বাসের সমষ্টি, তার সাথে জাতীয়তাবাদী মতবাদের বিরোধ ঘটা স্বাভাবিক।^২ কোন মুসলমান যখন ‘জাতীয়তাবাদী’ হয় তখন প্রধানত সে তার নিজ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থের কথাই চিন্তা করে, ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের নয়। এ কথা অবশ্য সকল ধর্মবলিমূলীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালি মুসলমানও একান্তরে নিজেদের স্বার্থের কথাই ভেবেছে, সংখ্যালঘু হিন্দু বৌদ্ধ আদিবাসীর কথা ভাবার অবকাশ তার হয়নি। তারপরও সংখ্যালঘুদের সঙ্গে সম্প্রীতির কথা যেটুকু ধর্মিত হয়েছে তা ভারতের অকৃষ্ণ সাহায্য-সহযোগিতার জন্য—নির্মল পর্যাধারণা-প্রোগ্রাম থেকে নয়। তার প্রমাণ স্বাধীন বাংলাদেশের গত একত্রিশ বছরের রাজনীতি।

মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করার পর যে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল তার শাসকরা বাঙালি জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতাকে অন্যতম মূলনীতি বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু তা ছিল বাস্তবে 'ইসলামিক-সেকুলার' রাষ্ট্র। কথাটা 'সোনার পাথরবাটি'র মত শোনালেও খুবই কঠিন সত্য। সত্য এ জন্য যে উপমহাদেশের কোথাও এ মুহূর্তে একটি সেকুলার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মত অনুকূল সামাজিক অবস্থা নেই। কেনন জনগোষ্ঠীর উপর জোর করে কেন আদর্শ চাপিয়ে দেওয়া যায় না। সমাজ স্থায়ী ও চিরস্তন, রাষ্ট্র অস্থায়ী। রাষ্ট্র ভাস্তা যায় এক ধারায়, সমাজ ভাস্তে না শত-সহস্র বছরেও। রাতারাতি সমাজ গঠিত হয় না, রাতারাতি রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের আগে কেন 'পাকিস্তান' বা 'পূর্ব পাকিস্তান' ছিল না। এই ভূখণ্ডে একটি শক্ত সমাজ ছিল। সেকুলার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে সীর্ষ পূর্ব-পন্থতি, শক্ত আদর্শ ও রাজনৈতিক দর্শন, সেকুলার শিক্ষাব্যবস্থা, সনাতন মন-মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন তা শুধু বাংলাদেশে নয়, গোটা দক্ষিণ এশিয়াতেই অনুপস্থিত। যে এলাকার বাসিন্দারা হিন্দু ও মুসলমানভুক্তের বাইরে কিছু ভাবতেই পারে না সেখানে ঘোষণা দিয়েই রাতারাতি সেকুলার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

সমাজতাত্ত্বিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার একজন নগণ্য কর্মী হিসাবে গোটা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে আমার মনে হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতারা সেদিন চেয়েছিলেন অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে। ধর্মের কারণে সেখানে থাকবে না কোন বিরোধ ও ভেদাভেদ, সকল ধর্মাবলম্বীই সেখানে ভোগ করবে সমান অধিকার। তবে সেখানে ইসলামি সংস্কৃতির থাকবে প্রাথম্য, যেমন ধর্মনিরপেক্ষ বলে পরিচিত ভাবতে হিন্দুধর্মের আবির্পত্য। পাকিস্তান তো ঘোষণা দিয়েই ইসলামি রাষ্ট্র। তাকে প্রজাতন্ত্র বলা যাবে না—যেখানে গণতন্ত্র অনুপস্থিত এবং যে দেশ অব্যাহতভাবে ফিলিটারিতে শাসন করে সে দেশ প্রজাতন্ত্র হয় কী করে? পাকিস্তান সৈরেতাত্ত্বিক ইসলামপন্থী ব্যর্থ রাষ্ট্র। অবশ্য এই দেশও কোন এক প্রাচীন সভ্যতার অর্থে। প্রাচীন এক সভ্যদেশকে ইসলামপন্থী শাসকরা মধ্যাশুলীয় রাষ্ট্রে পরিণত করেছেন। শুধু নিজেদের দেশকেই করেন নি, নিজেদের মধ্যাশুলীয় ধ্যান-ধারণা দোসরদের মাধ্যমে পাচার করেছেন তিনি সংস্কৃতির দেশ বাংলাদেশেও। মুসলমান-প্রধান হওয়ায় বাংলাদেশের এখন তা থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন হয়ে পড়েছে।

গ্রন্থেক ধর্মেরই আছে দুটি দিক: একটি শাশ্বত—ধর্মগ্রহে যেমনটি নির্দেশ করা হয়েছে; অপরটি প্রচলিত বিশ্বাস—যা ধর্ম ও ধর্ম-বহির্ভূত নানা উপাদানে গঠিত। যারা প্রগতিবিরোধী কর্তৃর তারা ধর্মের শাশ্বত বিষয়গুলো ধরে রাখতে চায়। তারা পান থেকে চুন খসতে দেয় না। বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমানের পূর্বপুরুষ নিম্নবর্ণের হিন্দু বা

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল। ইসলাম তুলনামূলকভাবে একটুখানি উদার বলে নতুন ধর্মান্তরিতরা আগের ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তবে তারা তাদের পুরাণো লৌকিক বিশ্বাস ও আচার-প্রথা পরিত্যাগ করেন। সেভাবেই স্থানীয় লোকজ নীতিনীতি ও নতুন ধর্মের শিক্ষা প্রভৃতির সমবয়ে বাংলায়, শ একটি সমর্বয়ধর্মী সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। সে সংস্কৃতিতে বৌদ্ধ সহজিয়া উপাদান আছে, ইসলাম আছে, হিন্দু আছে এবং এগুলোর বাইরে আছে ধর্মনিরপেক্ষ উপাদানও। এ সরকিছুর সমবয়েই বৃহত্তর বাঙালি সংস্কৃতি।

আঠার শতকের শেষ ও উনিশ শতকের শুরুতে ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকভায় হিন্দু বিভাইভালিজম এবং ইংরেজ-শাসনবিরোধী মুসলিম 'মৌলবাদী' ওয়াহাবি ও ফরারেজি আদোলন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অনৈক্য ও ব্যবধান সৃষ্টি করে। সে ব্যবধান করিয়ে আমার চেষ্টা হয়েছে কমই। বরং ধীরে ধীরে বাড়ানো হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান বৃদ্ধিজীবীদের প্রায় কেউই এ ব্যাপারে ঠিক ভূমিকা পালন করেন নি। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের উন্নতি ও ভালমন্দ নিয়ে ভেবেছেন, সকলের দিকে একসঙ্গে তাকানোর ফুরসত হয়নি করো। তাতে উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতা ক্রমাগত বেড়েছে।

তারপরও টিকে আছে বাঙালির মূলধারার সহমৌল মানবতাবাদী সমর্থয়ী-সংস্কৃতি। এর একটিই কারণ, তা হল হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল বাঙালি ধর্মভীক কিন্তু ধর্মাক্ষ নয়। পূর্ব বাংলার বাঙালি ও নয়, পশ্চিম বাংলার বাঙালি ও নয়। নিজের ধর্মের প্রতি পক্ষপাত তার খুব বেশি কিন্তু হিন্দু সাম্প্রদায়িক হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে স্বার্থাবেষী রাজনীতিকদের উসকানিতে বাঙালির স্ফুর্দ্ধ স্ফুর্দ্ধ গোষ্ঠী ভারসাম্য হারিয়ে কখনো কখনো হিস্ত হয়ে ওঠে। সে দ্রষ্টান্ত যেমন বহু তেমনি তাদের প্রতিরোধ করার মানুষও এ সমাজে সংখ্যায় লম্ব নয়।

ইসলামি ঐতিহ্যের পরিপন্থী কোন কর্মকাণ্ড এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগণ মেনে নেবে না। হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্ম তো এ মাটিই জিনিস। দূর থেকে দেরিতে আসা ইসলামের শিকড়ও এ দেশের মাটির অনেক গভীরে প্রোথিত। অবশ্য বাংলায় ইসলাম এসেছে বখতিয়ার খিলজির আগমনের অনেক আগেই। আরব বণিকরা ব্যবসা করতে প্রথম আসে উপকূলবর্তী এলাকায়। তাদের অনেকে এখানে বংশানুজয়ে থেকে যায়। বাঙালিদের সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এভাবে আট থেকে এগার শতক নাগাদ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান ব্যবসায়ীরা দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। তাদের মাধ্যমেই ইসলামের উদার মতবাদ ও সাময়ের বাণী দ্বারা শুধু যে ধর্মীয় ও অথনেতিক বৈষম্যের শিকার এবং জাতিভেদ ও ত্রাঙ্কণ্যবাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ আকৃষ্ট হয় তা-ই নয়; স্থানীয় অমুসলমান বাজারাও আরব মুসলমানদের নির্মল চারিত্বক গুণাবলিতে মুক্ত হন এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতা দেন। কারণ চিরকাল বাংলাদেশের অমুসলমানরা—হিন্দু-বৌদ্ধ প্রভৃতি—ধর্মগ্রহণ বা ধর্মভীক ছিল না। নিজের ধর্মের প্রতি অবিচল অনুরাগ থাকলেও অন্য ধর্মের প্রতি তারা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন।

সম্প্রতি বাঙালি জাতি সম্পর্কে একটি ভাল বই প্রকাশিত হয়েছে লঙ্ঘন ক্ষুল অব ওরিয়েটাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টডিজ থেকে। বইটি ড. নীতিশ সেনগুপ্তের ইতিহ্য অব দ্বা বেঙ্গল-শিক্ষিং পিপল। প্রাচীনকাল থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত বাংলাভাষী জনগণের ইতিহাস এর উপজীব্য। তিনি গভীর গবেষণা করে প্রাচীনমান করতে চেষ্টা করেছেন যে উভয় বাংলার সংস্কৃত এক ও অভিন্ন এবং তা গড়ে উঠেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমানের বহু শাতান্ত্রীর মিলিত চেষ্টায়। তিনি দেখিয়েছেন, ইংরেজ উপনিবেশবাদীরা এ দেশ দখলের আগে হিন্দু-মুসলমানে সাম্প্রদায়িক সংযৰ্থের দ্রৃষ্টান্ত নেই।

অবশ্য মুসলমানদের নিজেদের মধ্যেই নামারকম বিভেদ আছে: মৌলবাদী ইসলামের সঙ্গে উদার ইসলামের, এক মজহাব বা উপ-সম্প্রদায়ের সঙ্গে আরেক উপ-সম্প্রদায়ের, রক্ষণশীলদের সঙ্গে প্রগতিশীল আধুনিকদের। উনিশ শতকের শেষ থেকে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বিজ্ঞানমনক্ষেত্রে সঙ্গে প্রচীনপন্থী গোড়াদের সংযৰ্থ শুরু হয়েছে। তাদের সেই সংযৰ্থ হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকভাবে চেয়ে কম বিপদজনক নয়। তবে লোকজ ইসলামপন্থীর সংখ্যাই গ্রামপ্রধান বাংলাদেশে বেশি।

গত দুই দশকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন এনজিওগুলোর সামাজিক-অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পন্থীতে প্রসারিত হওয়ার ফলে গ্রাম ও শহরের দারিদ্র্য-পীড়িত ভূতলবাসী মানুষের চেতনায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। তাদের বহুকালের অক্ষু অনেকটাই ঘূচেছে। প্রশিক্ষারও প্রসার ঘটেছে। কিছুটা হলেও 'আধুনিকায়ন' হয়েছে। তাতে অক্ষবিশ্বাস ও ধর্মীয় গোড়ামি অনেকটা দূর হয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে মাদ্রাসাশিক্ষা সঙ্কুচিত হয়নি, বরং সরকারি পৃষ্ঠাপোষকভায় আনুভূমিকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। এতে একশ্রেণীর দারিদ্র্য মানুষের অক্ষু ও গোড়ামি দূর না হয়ে বরং পাকাপোক্ত হচ্ছে। দেশ মাদ্রাসাশিক্ষার ভিতর দিয়েই 'মৌলবাদী' ইসলাম বাংলাদেশে ঢিকে আছে এবং আরো বহুদিন ঢিকে থাকবে। এরা প্রগতিশীল বাঙালি জাতীয়তাবাদের ঘোরতর প্রতিপক্ষ। দেশে এক ও অভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা থাকলে পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে। মাদ্রাসা থেকে অনিবার্যভাবে তৈরি হয় 'ধর্মাদ' মানুষ ও 'মৌলবাদী' দলের কর্মী। সাধারণ ক্ষুল-কলেজ থেকেও তা হতে পারে। কারণ 'মৌলবাদী' নেতারা অনেকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। মসজিদের ইমাম, জিহাদী জন্ম সংগঠনের সদস্য, ইসলাম প্রচারসংখের নেতাকর্মীরা অবধারিতভাবে মাদ্রাসা থেকেই আসে। অন্তর্শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানুষরা এদের দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হয় এবং সমাজে সাম্প্রদায়িক চেতনা চাঙ্গা হয়।

৫

আমাদের চিন্তায় ও জীবনে অঞ্চলিত আনন্দে চাইলে আমাদের তর্ক করতে হবে। নিজের দলভুক্ত অথবা নিজের মতান্তরের সমর্থক অর্থাৎ একই মতান্তর ও চিন্তায় বিশ্বাসী মানুষের মধ্যে তর্ক হয় না, হলেও তা প্রাণহীন ও অর্থহীন। তর্ক করতে হয়

তিনি মতাবলম্বী মানুষের সঙ্গে যুক্তির নিকি হাতে নিয়ে। সমাজের পরস্পরবিরোধী শক্তির মধ্যে দলের পরিগামে যে সংশ্লেষণ হয় তাতে সমাজ উপকৃত হয়। আমাদের সমাজে দ্বান্তিকভাবে (Dialectically) চিন্তার প্রবণতা হ্রাস পাচ্ছে। এটা শক্তিকর। সমাজে সব সময়ই কম হোক বেশি হোক পরস্পরবিরোধী শক্তি কাজ করে। কিন্তু ঠিক পথে চলা প্রগতিশীল ধারাটির বিজয়ের উপরই সমাজের অঞ্চলিত নির্ভর করে।

আজ (আগেও এমনটি হয়েছে) বাংলাদেশে একদল ধর্মপন্থী গোড়া মুসলমান বর্বরোচিত পদ্ধায় আধুনিকভাবে অব্যাহতভাবে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছে। একটু স্পষ্টভাবী যুক্তিবাদী চিন্তার মানুষকে 'মুরতাদ', 'নান্তিক' বলে গালাগাল দিচ্ছে, তাদের ফাঁসি চাইছে, তাদের বিরক্তে ডাক দিচ্ছে 'জিহাদ'-এর, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যন্ত বিপর্যস্ত করছে। অন্যদিকে ধর্মাদ মৌলবাদীদের বিরক্তে শক্ত প্রতিরোধ আন্দোলনও হচ্ছে। বাধা সত্ত্বেও প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বলিষ্ঠভাবেই পরিচালিত হচ্ছে। প্রগতিশীলদের শক্তিই প্রবল, বাধা-বিপত্তির মধ্যেও তাদের বিজয় নিশ্চিত।

হিন্দু হোক, বৌদ্ধ হোক, মুসলমান হোক, অস্তিক হোক, নিরীক্ষণবাদী হোক, সাম্প্রদায়িক হোক, ধর্মনিরপেক্ষ হোক—এই ভূখণের বাংলাভাষী মানুষের এমনই নিয়ন্ত যে অনিবার্যভাবে তাদের—পূর্বপুরুষদের মত ভবিষ্যাতেও—বংশানুত্বে রাজনৈতিক উত্থান-পতন, বিজয় ও বিপর্যয়ের মধ্যেই বসবাস করতে হবে। এর কোন বিকল নেই। কোন তত্ত্ব দিয়ে জাতীয়তার গুরুত্ব বিচার-বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন নেই। এ মাটির হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ সকলের রক্ত এক পদ্মা মেধনা যমুনা বৃক্ষপুত্র সুগন্ধির পানি কোন কারণে দৃষ্টিত হয়ে পড়তে পারে, তাদের কেটে ভাগ করা যাবে না। বাঙালি জাতি আজ নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তবে বাঙালির মধ্যে যতই বিভেদ সৃষ্টি করার ঘড়যন্ত হোক তাদের শেষ পর্যন্ত ভাগ করা যাবে না।

১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের সম্মেলনে যোগ দিতে চাকা এসেছিলেন প্রখ্যাত ভারত-বিশেষজ্ঞ ইতিহাসবিদ এ. এল. বাশাম। তিনি বলেছিলেন, 'বাঙালিরা নিজেদের ঐতিহ্য সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে নিজেদের এককভাবে গড়ে তুলবে। বাঙালি বাঙালি হবে, বাংলাদেশ বাংলাদেশ হবে।'

আমিও প্রফেসর বাশামের কথারই প্রতিধ্বনি করতে চাই।

ভাদ্র ১৪১০ ॥ আগস্ট ২০০৩

বোধিনী

1. Conflict between Islam and nationalism is inevitable.
2. Islam, too, being a school having its own independent, spiritual, practical, political and social system and comprising a particular set of beliefs, it naturally comes into conflict with the school of nationalism.

রাষ্ট্র ও বাসনা: আহমদ ছফার 'বিষাদ-সিঙ্গু'

সলিমুল্লাহ খান

অলাইত চক্র মধ্যে প্রেমের অকৃত
রূপ রস বাক্য যোগে সৃজিল প্রচুর।

—সৈয়দ আলাউল, পদ্মাৰ্থী

বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেছে অথচ এই সংগ্রামের অভিভূত তিরিশ বছরেও কোন মহৎ সাহিত্যের জন্ম দেয় নাই। এই ধরনের নালিশ সৌরূর ভিত্তিইন এমন কথা বলার সাহস আমার নাই। সাহিত্যের উন্নতি এবং সমাজের নৈতিক প্রগতি সমর্থক নয়। অস্তত দার্শনিক রূপে তা মনে করতেন। (রূপো ১৯৯২) তবু সরিনয়ে বলব, এমন নালিশ যাঁরা করেন তাঁরা খুব সম্ভব আহমদ ছফার উপন্যাস অল্পতচক্র পড়ে দেখার অবকাশ পান নাই। আকারে ছেট এই উপন্যাস—আমার ধারণা—প্রকারে বড় সাহিত্যের লক্ষণাক্রম। এই প্রস্তাবের সমর্থনে কিছু আলামত এই নিবন্ধে পেশ করব।

১

অল্পতচক্র উপন্যাসের মূল ব্যানিকার দানিয়েল একস্থলে স্ফুরণ করেন:

বড় ভাগাহীন এই বাঙালি মুসলমান জাতটা। আবহান কাল থেকে তারা ভয়করভাবে নির্যাতিত এবং নিষ্পেষিত। সেই হিন্দু আমল, বৌদ্ধ আমল, এমনকি মুসলিম আমলেও তারা ছিল একেবারে ইতিহাসের তলায়। এই সংখ্যাগুরু মানবমণ্ডলি কখনো প্রাণশক্তির তোড়ে সামনের দিকের নির্মোক ফাটিয়ে এগিয়ে আসতে পারেনি। যুগের পর যুগ গেছে, তাদের বুকের উপর দিয়ে ইতিহাসের ঢাকা ঘৰমৰ শব্দ তুলে চলে গেছে। কিন্তু তাদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। (ছফা ২০০০: ৮৭-৮৮)

অল্পতচক্র উপন্যাসের মূল সমস্যা—আমার বিবেচনায়—মানুষের বাসনার বিয়োগ। মানুষ কী চায়? ফরাসি দার্শনিক জাক লাক্কা বলেছেন: মানুষ জানে না সে কী চায়। প্রথমে অপরের বাসনাকেই সে নিজের বাসনা মনে করে। মাঝের বাসনাই শিশুর বাসনা। এই ক্রমে নিজের বাসনা বিয়োগ করে পরের বাসনাকেই মানুষ নিজের বাসনা জ্ঞান করে। এখানে আমরা 'অপর' ও 'পর' ভেদ করছি। অপরের জায়গায় যদি 'মা' শব্দটি এবং পরের জায়গায় 'বাবা' লবজাটি বসাই কোন অন্যায় নাই। মা ও বাবার বাসনার জালে ধরা পড়ে শিশু। দানিয়েল বলেন:

বাঙালি মুসলমানরাই প্রথম পাকিস্তান চেয়েছিল। পাঞ্জাব, সিঙ্গু, বেলুচিস্তান সীমান্ত প্রদেশ কোথায়। লোকে পাকিস্তানের কথা বলত। জিনাহ সাহেবের বাংলার সমর্থন এবং আবেগের উপর নির্ভর করেই তো অপর প্রদেশগুলোকে নিজের কজায় এনেছিলেন। যে বাঙালি মুসলমানদের অরুণ্ঠ আত্মাদানে পাকিস্তান সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল, সেই পাকিস্তানই তিরিশ বছর তাদের বুকের উপর বসে তাদের ধর্ষণ করেছে। একটা জাতি এতড় একটা ভুল করতে পারে? কোথায় জানি একটা গড়বড়, একটা পৌজামিল আছে। আমরা সকলে সেই পৌজামিলই ব্যক্তিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে অদ্যাবধি বহন করে চলেছি। (ছফা ২০০০: ৮৮)

দানিয়েলের যুক্তি:

পাকিস্তানের গণপরিষদে তো পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যরাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাংলা ভাষার দাবিটি তো তাঁরা সমর্থন করতে পারতেন। হলেনই বা মুসলিম লীগের। তবু তাঁরা কি এদেশের মানুষ ছিলেন না? তাঁদের সাতপুরুষ বাংলার জল হাওয়াতে জীবন ধারণ করেন নি? তবু বেন বাংলাভাষার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের জাতু তরণদের প্রাণ দিতে হল? পূর্বপুরুষদের ভুল এবং ইতিহাসের তামাদি শোধ করার জন্য কি এই জাতিটির জন্ম হয়েছে? (ছফা ২০০০: ৮৮)

দানিয়েলের কথামূলত অনুসারে বাঙালি মুসলমান একটা 'জাতি'। একালের রাষ্ট্র বিজ্ঞান যাকে 'জাতি' বলে বাঙালি মুসলমান কি সেই বস্তু? এতদিন সে মাঝের বাসনায় মুসলমান। এখন সে কি বাবার বাসনায় বাঙালি হবে? কী এই বাবার পরিচয়? এই বাবাও কি অভ্যাচারী এবং অজ্ঞাচারী? ইতিহাস ও বাসনার এই দুর্বোধ্য যোগাযোগ আহমদ ছফা তৈরি করার চেষ্টা করেছেন এই আধুনিক রূপকথার ভিত্তি।

ধরা যাক একটি ছেট ঘটনার কথা। দানিয়েল জানেছেন:

কিছুদিন আগে রেজোয়ানদের আড়চায় কুমিল্লা থেকে মজিদ বলে আরেকটি ছেলে আসে। রেজোয়ানদের থাকত বিপন স্ট্রাটে। মজিদ আর রেজোয়ান দুজনেই কুমিল্লার কাল্পনিকপাড় এলাকার একই পাড়ার ছেলে। মজিদ কলকাতা এসে সকলের কাছে রঁটিয়ে দেয় যে রেজোয়ানের যে বেনচি উম্যাস কলেজের প্রিসিপাল সে একজন পাকিস্তানি মেজরকে বিয়ে করে ফেলেছে। এই সংবেদটা পাওয়ার পর রেজোয়ান দু দিন ঘরের মধ্যে চৃপ্তাপ বসে থাকে। কারো সঙ্গে একদম কথাবার্তা বলেনি। অনেক চেষ্টা করেও কেউ তাকে কিছু খাওয়াতে পারেনি। অবশেষে রাত্রিবেলা যুবের ওষ্ঠে থেয়ে আত্মহত্যা করেছে। (ছফা ২০০০: ৮৫)

তার মাথার কাছে পাওয়া গেল একটি চিরকুট। তাতে লিখে রেখেছে, বড় আপা, যাকে আমি বিশ্বাস করতাম সবচেয়ে বেশি, সে একজন পাকিস্তানি মেজরের স্তু হিসাবে তারই সঙ্গে একই বিছানায় ঘুমাচ্ছে, এ কথা আমি তিন্তা করতে পারি না। দেশে থাকলে বড় আপা এবং মেজরকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিতাম। এখন আমি ভারতে। সুতরাং সে উপায় নেই। (ছফা ২০০০: ৮৫-৮৬)

দানিয়েল ধরে নিচেন: বাংলাদেশের যুদ্ধটা না লাগলে হয়তো ছেলেটাকে এমন অকালে মরতে হত না। ছেলেটা মরতে বাধ্য হয়েছে কী করণে তার বিশ্বেষণ দানিয়েলের কাজ নয়। ছেলেটার জগতে সাকার (Imaginary) ও আকার (Symbolic) একাকার হয়ে আছে, আলাদা হয় নাই। সাকার থেকে আকার আলাদা না করা হলে যে পরিস্থিতির উভ ঘটে একালের মনবিভাজন (Psychoanalysis) শাস্ত্রের ভাষায় তাকে সাইকোসিস বলে। আর আলাদা হলে যে পরিস্থিতি তার নাম নিউরোসিস। রেজোয়ানের বাসনা আকার পায় নাই কিন্তু দানিয়েলের বাসনা পেয়েছে। তাই আমরা দানিয়েলের বয়ানে রেজোয়ানের দাফন-কাফনের কাহিনী পড়ি।^১ অল্পতচক্র উপন্যাসের কাহিনী এই বাসনারই বিয়োগ কাহিনী।

২

ব্যাবিলনে নির্বাসিত এয়াহুদি জাতির মধ্যে দানিয়েল নামে একজন ধূরঢ়ন (Intellectual) ছিলেন। ১৯৭১ সালে কলকাতায় উপনীত বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে একজন বৃক্ষিজীবী আছেন যাঁর নাম দানিয়েল। তাঁর জবানিতেই অল্পতচক্র চলেছে। দানিয়েল বললেন:

অঙ্গীকার করার উপায় নেই, বাংলাদেশে একটি মুক্তিযুদ্ধ চলছে এবং এই যুদ্ধের কারণেই কলকাতা মহানগরীর নাভিখ্যান উঠছে। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধের জন্য সাজে সাজে রব উঠছে। আমি সেই বিরাট কর্মকাণ্ডের একটা ছিটকে পড়া অংশ। (ছফা ২০০০: ৬৭)

তাঁর কথা হচ্ছে পশ্চিমা বাঙালি ধূরঢ়ন সতত্বত্বাবৃত সঙ্গে। সতত্বত্ব করেছেন সত্য বলবেনই;

আমরা আশা করেছিলাম আপনারা অন্য রকম একটা ঘটনা ঘটাবেন। মার্চ মাসের প্রাথমিক দিনগুলোতে পশ্চিম বাংলার হাজার হাজার ছেলে খেছাসেবী হিসাবে বাংলাদেশে গিয়ে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। আপনারা যুদ্ধের সমষ্ট মাঠটা পাকিস্তানি সৈন্যদের হেড়ে এককেবারে চূড়ান্ত নাতুর অবস্থায় ইন্দিরা সরকারের অতিথি হয়ে ভারতে চলে এলেন। এটি আমরা আশা করিন। (ছফা ২০০০: ৬৭)

সতত্বত্ব বললেন:

আপনাদের দেশ জনগণের ভাগা এখন আন্তর্জাতিক চক্রান্তের মধ্যে আটকা পড়ে গেছে। দুর্নিয়ার সমস্ত দেশ চাইলে আপনাদের উপলক্ষ্য করে দাবায় নিজের চালটি দিতে। মারাখানে

আপনারা চিড়েচাপটা হয়ে যাবেন। আমার মনে হয় কী জানেন, আপনাদের এই শেখ মুজিব মানুষ। কী সুবর্ণ সুযোগই না আপনাদের হাতে ছিল। (ছফা ২০০০: ৬৮)

দানিয়েল শব্দটি হিকু। কিতাবুল মোকাদ্দস অনুসারে এর অর্থ 'আল্লাহ আমার বিচারক'। (বাইবেল সোসাইটি ২০০০: ১২৪৭) বাঙালি মুসলমানও ভাবে-দুঃখে কিছুটা এয়াহুদি লক্ষণাপন্ন। দানিয়েল কবুল করেন সতত্বত্বাবৃত কথাটা সবৈব মিথ্যা নয়:

উনিশশ আটচাহিশ থেকে সন্তু পর্যন্ত এই জাতি পাকিস্তানের বিবরকে সংখ্যাম করেছে। আর চূড়ান্ত মুহূর্ততে আমাদের সবাইকে দেশ ও ধার ছেড়ে ভারতে চলে আসতে হয়েছে। আমাদের হাতে সময় ছিল, সুযোগ ছিল। কোলাহল আর চিকিৎসা করেই আমরা সে সুযোগ এবং সময়ের অপব্যবহার করেছি। পাকিস্তানের কর্তাদের আমরা আমাদের বেকা বানাতে সুযোগ দিয়েছি। তারা সৈন্য এনে ক্যাটনমেটস্টলো ভরয়ে দেলেছে এবং সুযোগ বুঝে পাকিস্তানি সৈন্য আমাদের উপর বাঁপিয়ে পড়েছে। আমাদের প্রতিশোধ ব্যবস্থা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। আমরা আমাদের যুদ্ধটাকে কাঁধে বয়ে নিয়ে ভারতে চলে এসেছি। (ছফা ২০০০: ৮৮)

আখ্যানের একেবারে গোড়ায় দেখা যায় ধূরঢ়ন দানিয়েল হাসপাতাল যাচ্ছেন। কলকাতার পিজি হাসপাতালে বাংলাদেশের একজন তরুণী ভর্তি হয়েছেন। দানিয়েল যাচ্ছেন তাঁর খোঁজে। তরুণীর নাম তায়েবা। বয়স সাতাশ। তাঁর পরিবারের অস্ত্রপুর পর্যন্ত রৌদ্রসঙ্গীত ও কমিউনিস্ট পার্টির দৌড়। তাঁর হয়েছে কঠিন বিমার। ভাল হওয়ার আশা নাই। দানিয়েল কলকাতার ভাষায় কথা বলা রপ্ত করলেও রোগের নাম রপ্তানি করেন 'লিউক্যামিয়া'। 'লিউক্যামিয়া' বলতে পারেন না। তায়েবাকে হাসপাতালে তুলেছেন যিনি তিনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি—ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী সহিতপত্র পরিচয় সম্পাদক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। অসুস্থ তায়েবাকে খাওয়াবে বলে দানিয়েল যাঁর কাছে একটু ভাত আর ছেট মাছের আবদার করতে যাবেন কাল সকালে, ঘুম থেকে উঠে, সেই প্রাতঃস্মরণীয়ের নাম কাকাবাবু প্রকাশ করেছে মুজফ্ফর আহমদ। স্বত্বতই জিজ্ঞাসা জাগে কে এই তরুণী তায়েবা? দানিয়েলের ভাষ্য মোতাবেক:

তায়েবা ১৯৬৯ সালের গণ আন্দোলনের সময় আসাদ হত্যার দিনে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে পত্রপত্রিকায় আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। সবগুলো কাগজে পুরো পৃষ্ঠা ছবি ছাপা হয়েছিল। আজ সে কলকাতার পিজি হাসপাতালে নিঃশব্দে মৃত্যুর প্রহর গুণছে...। (ছফা ২০০০: ১৪৪)

তায়েবাকে বাংলাদেশের নিশান বানিয়েছেন আহমদ ছফা। তার পবিত্রতার তুলনা পরিষ্কার করার খতিরে ১৯৭১ সালে সৃষ্টি কল্পকন্যা রওশন আরার কথাও পেড়েছেন তিনি। দানিয়েলের ভাবনা:

আজ সে কলকাতার পিজি হাসপাতালে নিঃশব্দে মৃত্যুর প্রহর গুণছে। আর অলীক রওশন আরার ভাবনুর্ভূতি ভারতীয় জনমনের অফয় আসন দল করে আছে। হায়ারে তায়েবা, তোমার জন্য অশ্রু! হায়ারে বাংলাদেশ, তোমার জন্য বেদনা! কেন এ বকম ভাবদাম বলতে পারব

না। হয়তো আবলাম এ কারণে যে আর অস্তিত্ব কম্পিনকালেও ছিল না, সেই রওশন আরার ভাবমূর্তি আকাশ প্রমাণ উচু হয়ে উঠেছে। আর তায়েবা, এক সময়ে যে বাংলাদেশে সংগ্রামের উষ্ণ নিঃশ্঵াস হিনাবে চিহ্নিত হয়েছিল, আজ কলকাতার হাসপাতালে সকলের আগোচরে মারা যাচ্ছে। (ছফা ২০০০: ১৪৪)

দানিয়েলের দুঃখ কঁজুকন্যা রওশন আরার জন্য প্রক্রিয়ায় তার নিজেরও একটা ছেটখাটি ভূমিকা আছে। আগরতলার সাংবাদিক বিকচ চৌধুরীর বিপুল কঁজুনশক্তির ওরসে রওশনের জন্য। বিকচবাবু পয়লা খবরটার খসড়া এভাবে লিখেছিলেন: ফুলজান নামের এক যুবতী বুকে মাইন বেঁধে পাকিস্তানি সৈন্যের একটা আস্ত ট্যাঙ্ক উঠিয়ে দিয়েছে। দানিয়েল আপত্তি তুললেন:

এই নামটি একেবারেই চলতে পারে না। বাঙালি মুসলমানের নাম সম্পর্কে তোমার ধারণা নেই। তাই ফুলজান শব্দটি তোমার কলমের মুখে উঠে এসেছে। বাংলাদেশে ফুলজান যাদের নাম, তারা বড়জোর ইঁড়ি-পাতিল ঘষে, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ট্যাক্সের তলায় আত্মহতি দিতে পারে না। সুতরাং একটা যুৎসই নাম দাও, যা শুনলে মানুষের মনে একটা সম্মের ভাব জাগবে। রওশন আরা নামটি মন্দ কি! বকিম এই নামটি বেছে নিয়েছিলেন। নামের তো একটি মহাত্ম্য আছেই। রওশন আরা নাম যে মেয়ের, সে যেমন হৃদয়াবেগের আহ্বানে সাড়া দিয়ে জয়সিংহের ভালবাসতে পারে; তেমনি দেশজননীর প্রেমে উচুন্দ হয়ে ট্যাক্সের তলায় আত্মহতি দিতে পারে। (ছফা ২০০১: ১৪২-১৪৩)

নিজের সৃষ্টির জয়জয়কারে হতবাক দানিয়েল ও বিকচ। রওশন আরার বাড়ি মাটোর। তার বাবা পুলিশ অফিসার। সে ইডেনে পড়ত এবং শেখ মুজিবের আত্মীয়া। দানিয়েল জানেন না কী করতে কী হয়ে গেল। আক্ষেশবাণীর দেবদুলালবাবুর কল্যাণে রওশন আরার পরিচিতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। রওশন আরার আত্মীয়বজ্জন রেজিওতে সাজানো সাক্ষাত্কার দিতে আরম্ভ করেছে। দানিয়েলের দায়বোধ এই রকম:

যুদ্ধের প্রথম বলিই তো সত্য। কিন্তু আমি বা বিকচ ইচ্ছা করলেই রওশন আরাকে আবার নিরন্তর করতে পারি না। আমরা যদি হলপ করেও বলি, না ঘটনাটি সত্তা নয়, রওশন আরা বলতে কেউ নেই, সবটাই আমাদের কঁজনা, লোকজন আমাদের পাকিস্তানি স্পাই আখ্যা দিয়ে ফাসিতে মোলাবার জন্য ছুটে আসবে। (ছফা ২০০০: ১৪৩)

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিয়োগকাহিনী তায়েবার ভাগে আর এ যুদ্ধের তামাশার গল্পটি রওশন আরার। তায়েবা বাংলাদেশের নিশানা বা রূপান্তর। অস্তত দানিয়েল এ দৃষ্টিতে দেখছেন:

একটি নারী দিনে দিনে নীরবে নিভৃতে কলকাতার পিজি হাসপাতালে একটি কেবিনে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। আমার জানতাম সে মারা যাবেই। মারা যাবার জন্যই সে কলকাতা এসেছে। যুদ্ধ দ্রুত পারে এগিয়ে আসছে। আমি ধরে নিয়েছিলাম, বাংলাদেশের স্থানীন্তা আবশ্যিকী, আর তায়েবাকে এখানে রেখে যেতে হবে। তায়েবা অত্যন্ত শান্তভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছিল। (ছফা ২০০০: ১৪৪)

দেখা গেল, তায়েবা আর বাংলাদেশ একার্থবোধক নয়। তায়েবা বাংলাদেশের একাংশ মাত্র অথবা নামান্তর। দানিয়েল জানাচ্ছেন:

ডিসেম্বরের চার তারিখ ভারত পাকিস্তানের বিকান্দে যুদ্ধ থেঝগা করে। ঐ দিন সকান্দা থেকে সকল পর্যন্ত প্রোটা কলকাতা শহরে বিমান হামলার ভয়ে কেন আলো জ্বলেনি। সেই রাতেক আউটের রাতে তায়েবার কাছে কেন ডাঙুর আসতে পারেনি। কেন আত্মীয়বজ্জন পাশে ছিল না। ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধের কারণে যে অন্ধকার কলকাতা শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই অন্ধকারের মধ্যে তায়েবা আবিসর্জন করল। (ছফা ২০০০: ১৪৪)

৩

তায়েবার এই অসুখ ও মৃত্যুর জন্য কেউ কি দায়ী? অসুখ তো অসুখই। মৃত্যু তো মৃত্যুই। সকলেই একদিন জন্য নিয়েছে এবং সকলেরই একদিন মৃত্যু হবে। জন্ম ও মৃত্যু, ব্যাধি ও জরা নিরাকার বা শুধু ঘটনা। দানিয়েল এয়াহনি পয়গম্বর। তার কাউকে না কাউকে দায়ী করতেই হবে। এই দায় দুই বকমের হতে পারে—সাকার ও আকার হতে পারে এই দুই দায়ের দুই নাম। রেজোয়ানের আত্মহত্যার জন্য দানিয়েল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে দায়ী করেছিলেন। 'বাংলাদেশের যুদ্ধটা না লাগলে হয়তো ছেলেটাকে এমন অকালে মরতে হত না।' (ছফা ২০০০: ৮৭) এই ধরনের দায়কে আমি বলি দায়ের আকার বা নিশানা মাত্র। আর ধরনের দায়কে এর সঙ্গে তুলনা দিয়ে বলা যেতে পারে সাকার বা দায়ের মৃত্যি। তায়েবার মৃত্যুর জন্য দানিয়েল দায়ের এই দুই মৃত্যি হাজির করেন একই সঙ্গে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন পায়ে হেঁটে কলকাতা মহানগরীতে গিয়ে হাজির হতে হল এবং বাঙালি মুসলমানের জাতীয় যুদ্ধ কেন ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের একটা ছিটকে পড়া অংশ হয়ে উঠতে বাধ্য হল? দানিয়েলের এই দুই প্রশ্নের স্লুপক বটে তায়েবার অসুখ ও মৃত্যু। তায়েবার মত প্রাণবন্ত টগবগে তরঙ্গীকে কেন কলকাতার পিজি হাসপাতালে উঠতে হল? আর শেষ পর্যন্ত ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট অন্ধকারের মধ্যে আত্মীয়-বাক্ষবর্জিত রাতে তাকেও কেন আত্মবিসর্জন দিতে হল? এই দুই প্রশ্নকে এক দেহে লীন করেছেন আহমদ ছফা। এই ঘটনাকেই আমি শনাক্ত করি মহৎ সাহিত্যের আগামত হিসাবে। অতএব দানিয়েল উবাচ:

আমরা আমাদের যুদ্ধটাকে কাঁধে বয়ে নিয়ে ভারতে চলে এসেছি। হয়তো যদি একদিন শেষ হবে। তারপর কী হবে? আমাদের যুদ্ধটা ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার মন বলছে পাকিস্তান হারবে, হারতে বাধ্য। কিন্তু আমরা কী পাব? ইতিহাসের যে গোজামিল আমরা বংশপ্রসরণ করতার মধ্য দিয়ে বহন করে চলেছি তার কি কেন সমাধান হবে? (ছফা ২০০০: ৮৮)

ইতিহাসের এই গৌজামিল কী বস্তু? তায়েবার পরিবারের ইতিহাস থেকে উদাহরণ দেওয়া যাক। দানিয়েল শুনেছিলেন তাদের বাবার পরিবারের কেউ বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলেন না। বর্ধমান তাঁদের স্থানীয় নিবাস হলেও হাড়ে-মাংসে, অস্থিমজ্জায় তায়েবার বাবা-চাচারা মনে করেন তাঁরা পশ্চিমদেশীয়। বাংলামুলক তাঁদের পীরুমুরীনী ব্যবসার ঘাঁটি হলেও অত্যন্ত যত্নে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে তাঁদের ভেদ চিহ্নগুলো ঘষে মেজে তকতকে বাকরাকে করে রাখেন তাঁরা। এ ব্যাপারে উর্দু ভাষাটা তাঁদের সাহায্য করেছে সবচেয়ে বেশি। স্থানীয় মুসলিম জনগণ তাঁদের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতাকে অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন জ্ঞান করে নিয়েছে। (ছফা ২০০০: ৭৩-৭৪) তায়েবার মা চরিত্রিতে মতে, ওরা কেউ বাংলাভাষায় কথাবার্তা বলে না, এমনকি বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে আপন থেকে ঘৃণা করে। (ছফা ২০০১: ৭৩) দানিয়েল যখন বললেন ‘একদিন আমরা জিতব তখন তায়েবার চাচা চরিত্রা বললেন—জিতবেন তো বটে, তবে আপনারা নন, জিতবে হিন্দুস্থান এবং হিন্দুরা।’ (ছফা ২০০০: ৭৭)

ওদিকে তায়েবার মা এসেছেন ‘সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা পরিবেশ’ থেকে। তাঁদের বাড়ি ছিল বোলপুরের কাছাকাছি। রবীন্দ্রনাথের শাস্তি নিকেতনের একেবারে সন্নিকটে। তায়েবার মা বালিকা বয়সে পাঁচ ছ বছর শাস্তি নিকেতনে পড়ালেখা করেছেন। বিয়ে হওয়ার পর শুশ্রেণী এসে একটা প্রকাণ্ড সমস্যার মধ্যে পড়ে গেলেন। নতুন বৌ উর্দু ভাষায় কথা বলে না। (ছফা ২০০০: ৭৪) এই সময় ভাবতবর্ষ দুই টুকরা হয়ে হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হল। নতুন বউ স্বামীকে অনেকে করে বুঝিয়ে সুবিয়ে বর্ধমান এবং কলকাতার সমস্ত স্থাবর সম্পত্তির দাবি ছেড়ে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের দিনাজপুরে এসে নতুন সৎসার পেতে বসলেন।

ওদিকে উর্দুজবান যে বকম তায়েবার বাবার বাড়ির লোকজনকে স্থানবাসীদের সঙ্গে মিশতে দেয় নাই, তায়েবার মার গৌরিতির রবীন্দ্রনাথও তেমনি এই মোহাজের পরিবারকে পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দূরে থাকতে সমান সাহায্য করেন। দানিয়েল বলেন: ‘সমাজে বাস করতেন বটে, কিন্তু একটা দূরত্ব সব সময় বহফা করতেন।’ সে কারণে ছেলেবেয়েদের পড়াশোনার জন্য সব সময় হিন্দু শিক্ষক নিয়োগ করতেন। (ছফা ২০০০: ৭৪) দানিয়েল দেখতে পান:

‘এই ফাঁক দিয়ে প্রগতিশীল রাজনীতি, কমিউনিস্ট পার্টি এসব একেবারে বাড়ির অন্তর্গতে প্রবেশ করে। মেয়েদের লেখাপড়া ও গানবাজনা শেখাবার বাসনায় এই মোহাজের পরিবারের দ্বিতীয় হিজরত। এবার ঢাকা শহরের পুরনো বনেদী এলাকায়। বিনিময় করে দিনাজপুরে যে ভূসম্পত্তিকু পেয়েছিলেন; তার একাংশ বিক্রি করে ঢাকা শহরে বাড়ি কিনলেন।’

কিছুদিন পর নীল নির্মেয় আকাশ থেকে যে বাজ এই পরিবারের মাথায় পড়বে সেই বাজের দুই নাম জাহিদুল হক ও রাশেদা খাতুন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের দুই দিকপাল। দানিয়েল বলছেন:

তায়েবার মা তো জাহিদুলদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আঝাহকে ধন্যবাদ দিলেন। এতদিন তিনি মনে মনে এমন সুরক্ষিসম্পদ কাউকে স্বাক্ষর করছিলেন, যার উপর তাঁর অবর্তমানে মেয়েদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিতবোধ করতে পারবেন। (ছফা ২০০০: ৭৫)

এই সময় বাংলাদেশের লড়াই বেঁধে সব গোল পাকিয়ে দিল। দানিয়েল সূত্র আওড়ান: যুদ্ধ স্রোতে ভেসে যায় ধনমান জীবন যৌবন। নিয়তি অথবা যুদ্ধের বসিকতায় রাশেদা খাতুন আর তায়েবার কনিষ্ঠ ভগিনী ডোরা পরম্পরারের সতীন হয়ে দাঁড়িয়েছেন। জাহিদুল ডোরাকে বিয়ে করেছেন বলে রাশেদা খাতুন তাঁর মেয়ের টিউটর শশীকে নিয়ে শাস্তিনিকেতন গেছেন নাকি রাশেদা শশীকে ভানিটি-ব্যাগদাবা করেছেন বিধায় জাহিদুল ডোরাকে শাদি করেছেন আমরা নিশ্চিত হতে পারছি না। দানিয়েলের কথা একেব্রে খুবই সঙ্গতিহীন। (ছফা ২০০০: ২০, ৫২, ৭৫) একেক জায়গায় একেক রকম। ওর মনে একেক দিন একেক কাহিনী জাগে। তিনি প্রকৃতই সাকারের জীব এখানে। আমরা শুনি স্বামী-স্ত্রীর দ্বৈত সংগ্রামে ডোরাকে বলি হতে হয়েছে। আবার ডোরা একটি নষ্ঠ মেয়ে এমন কথাও শুনতে হয় আমাদের। দানিয়েল আবার জানাতে কসুর করেন না: ‘জাহিদুল এখানে সেখানে ডোরাকে নিয়ে যে অনুষ্ঠান করায়, তাতে যে টাকটা আসে, তার সবটা তায়েবার পেছনে থারচ করে।’ (ছফা ২০০০: ১১৭) সত্যি বিচ্ছিন্ন এই দেশ, ভারতবর্ষ!

৮

হজরত দানিয়েলের আপস্তিটা তাহলে ঠিক কোন জায়গায়? মুসা পয়গম্বরের বংশধরদের মতন আমাদের গল্পকথকও সভ্যতার প্রহরী। সভ্যতার নিয়ম—টোটেম ও ট্যারু গ্রাহে ফ্রয়েড দেখিয়েছেন—আবাকাকে হত্যা করা যাবে কিন্তু আবাকার নামীকে শান্তি করা যাবে না। জাহিদুল এই নিয়ম ভঙ্গ করেছেন। যুদ্ধেও দৃত অবধ্য। এই কথার তাৎপর্য কী? তাৎপর্য নিয়মনীতি অলঝনীয়। জাহিদুল তা লজ্জন করেছেন। ‘আপনা উদ্যান ফল’ তিনি ভঙ্গ করেছেন। যুদ্ধের ফলে—দানিয়েল দেখতে পাচ্ছেন—অনেক প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষের খোলস ফেটে খান খান হয়ে পড়েছে। তাঁর ভাষায়: আমরা এতকালের ব্যাট-চর্মাবৃত ছাগলদের চেহারা আপন স্বরপে দেখতে পাচ্ছি। (ছফা ২০০১: ৫২) খেরেন্তান কবি দাস্তের দোহাই—পাপের মধ্যে প্রেমে পড়া লম্বুতম—আওড়িয়ে রেহাই নাই।

দানিয়েলের ধারণা আঘাতটা সবচেয়ে বেশি সেগেছে তায়েবার। তিনি ছোট বোনটাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসতেন আর জাহিদুলকে বাবারও অধিক শুন্দা করতেন। এই অজাচারই—দানিয়েল কল্পনা করেন—তায়েবার সমস্ত বিশ্বাস সমস্ত মানসিক আশ্রয় ভেঙ্গে খান খান করে দিয়েছে। দানিয়েল মনে করেন: ওটাই ওর অসুখ গুরুত্বে হয়ে ওঠার মূল কারণ। (ছফা ২০০০: ২১)

এই অজাচারকে আহমদ ছফা শনাক্ত করেছেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মূল ব্যর্থতা হিসাবে। এই অজাচারই তাঁর চোখে হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে বেইমানি। এখানে অজাচার হয়েছে বাংলাদেশের শাসকশ্রেণীর জন্মের অনপনেয় কলক এবং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের সক্টের ভবিষ্যদ্বাণী। এক চরিত্রের জিহ্বা দিয়ে ছফা এই কথাটুকু বের করতে কসুর করেন নাই:

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যদি চলছে। শেখ পাকিস্তানের জেলে আর আমরা এখানে কলকাতায় পথে পথে ভেরেভা ভেজে চলছি। এই অবস্থার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী তোমার ঐ শেখ মুজিব এবং তাঁর দল আওয়ামী লীগ। শেখের মত...। (ছফা ২০০০: ৬২)

শেখ মুজিব আর জাহিদুল এই স্তুলে একদেহ হয়ে যান। দানিয়েলের খেদ:

এখানে কলকাতায় সাদা কাপড়-চোপড় পরা ভদ্রলোকদের মধ্যে ঝালন, পতন, যত রকমেই নৈতিক অধঃপতন হচ্ছে, তার সবগুলোর প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি। এখানে যত্নত ওনতে পাচ্ছি, বুঢ়ো আধুনিক মানুষারা যত্নত বিয়ে করে ভেড়াচ্ছে। পাকিস্তানি সৈন্যদের নিষ্ঠুরতার কথা আমাদের জানা আছে। মাঝে মাঝে এই ভদ্রলোকদের তার তুলনায় কম নিষ্ঠুর মনে হয় না। (ছফা ২০০০: ৫২)

দানিয়েলের ব্যাপক সিদ্ধান্ত: ‘তায়েবা যদি সত্যি মারা যায় সে জন্য এঁরাই দায়ী।’ এই দায় দানিয়েলের মনের মূর্তি। কিন্তু দুনিয়ার কোন আদালতে সে যামলার বিচার হবে না।’

বাসনার দায় একা জাহিদুলেরই নয়। বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, সকলের। বাংলাবাজারের ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ জয়সিংহ ব্যানার্জিও। জয়সিংহজী যজমানের মেঝে সবিতাকে নিয়ে কলকাতায় রেশন তুলছেন। বলছেন মেরেটির কোন অভিভাবক নাই। তাই তাকে পোষার দায়িত্ব তার ঘাড়ে এসে পড়েছে মাত্র। বাংলাবাজারের শ্রমিক রামুর জবানবন্দি কিন্তু অন্যরকম:

শালা বনমাইশ বউন, মা আর বুন দুইভা ক্যাপ্স কাইন্যা চোখ ফুলাইয়া ফেলাইছে। আর হারামজাদা মাইয়াডারে কইলকাতা টাউনে আইন্যা মজা মারবার লাগছে। (ছফা ২০০০: ৩৩)

এই বাসনার কাহিনী ঝাঁক্টের সকল পর্যায়ে এবং তা সকল রাষ্ট্রে জানে। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের একজন মন্ত্রীকে নিয়ে এই বাসনার ট্রাইজেডি একটা প্রহসন হয়ে গঠে। কলকাতা শহরে শ্রমিকশ্রেণীর বাসনাপুর বিখ্যাত সোনাগাছি। সেখানে পুলিশের হাতে পড়ে ভদ্রলোককে কবুল করতে হল তিনি প্রবাসী সরকারের একজন মন্ত্রী বটেন। খোজ-খবর করে নিচিন্ত হলেন অফিসার মহোদয়। বকাবাকা করলেন ভিআইপি মান্যবর মেহমানকে:

স্যার, কেন মিছিমিছি সোনাগাছির মত খারাপ জায়গায় গিয়ে না হক বুটি বামেলার মধ্যে পড়বেন আর ভারত সরকারের অতিথেয়তার নিন্দা করবেন। আগেভাগে আমাদের স্মরণ করবেই পারতেন, আমরা আগন্তকে ভিআইপির উপযুক্ত জয়গায় পাঠিয়ে দিতাম। (ছফা ২০০০: ১৬)

বাসনা কী কী ও কয় প্রকার— এই প্রশ্ন এখন আমাদের করতেই হয়। বাসনা মানে ‘বাস না’— যা বাস করে না, যা স্থির নয়। কামনা মানেও একই নিয়মে ‘কাম ন’। কামের সঙ্গে কামনার সম্পর্ক সামান্য (Universal) নয়, বিশেষ (Particular) মতো। অর্থাৎ দুনিয়াসূক্ষ্ম লোকের জানে বাসনা ও কামনা দুটি লিঙ্গ সংশ্লিষ্ট বিষয়। আমরা সে মতের পেষকতা করি না।^১ তায়েবার বাসনা কী? দানিয়েলের কামনা কী? এই দুটি সও্যাপ্তের জওয়াব জানার চেষ্টা করি তো এই সমস্যার একটা কিনারা হয় বলে আমরা মনে করি।

যে রাতে ডাক্তার মাইতি দানিয়েল ধূরকরকে বললেন তায়েবার বোগাটি সম্ভবত সারার মতন নয় এবং তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন সে কথা হলপ করে বলা যায় না, সে রাতে দানিয়েল এক স্থপু দেখেন। আমার বিবেচনায় অল্পতচ্ছ উপন্যাসের নাড়ি এই স্থপুটি। তার আগে বিবেচনা করা যাক তায়েবার বাসনা। দানিয়েল বলেন:

স্বাধীনতা অস্তঞ্চাপ ছিল তায়েবার। আলাপ আলোচনায় কথাবার্তায় দেখে থাকবেন, তার মনটি কী রকম কম্পাসের কঁটিয়া মত স্বাধীনতার দিকে হেনে থাকে। উনিশশ উন্নতরের আইন্যুবিয়োগী আলোচনে তায়েবা নিজে থেকে উদোগী হয়ে ১৪৪ ধরা ভস করেছিল। (ছফা ২০০০: ৫০)

অসুস্থতার দিনে তায়েবা জানাচ্ছেন:

সারা জীবন আবি আলোচনার পেছনে তুটেই কঁটিয়ে গেলাম। মা, ভাই-বোন, বন্ধু-বাকির সকলে সুখে হোক দুঃখে হোক একটা অবস্থান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু আবি তো হাত্তার উপর ভাসছি। তারা হয়তো সুখ পাবে শীর্ষে, ন্যাতো দুঃখ পাবে, তবু সকলে নিজের জীবনটি যাপন করবে। কিন্তু আমার কী হবে, আমি কী করলাম? আবি যেন স্টেশনের ওয়েটিং রুমেই গেটি জীবনটা কঁটিয়ে দিলাম। (ছফা ২০০০: ৪২)

দানিয়েলের স্থপুটা এই রকম:

আমার আরো এসেছেন। স্তুল হোস্টেলে থাকার সময় আমি যে বাড়িতে পেঁয়ি গেস্ট হিসাবে বেতাম, সে বাড়ির সামনের পথ আলো করে দাঁড়িয়ে আছেন। তার পরনে শাস্তিপূরণের চিকন পাতচের ধৃতি। গায়ে অদ্বিতীয় পাঞ্চাবী, গলায় খোলামে নক্ষা শরিফ থেকে আমা ফুলকাটা চান। আমা মাথায় কাল খোবামূক চকচকে লাল সুলতানি টুপি। আবি জিন্দেন করলাম, আবা! এত মুদ্রন কাপড়-চোপড় পরে আপনি কোথায় চলেছেন? আমার ধরে তিনি খবই অবকে হয়ে গেলেন। নেতা সুমি জান না দুরি, আজ তোমার নিয়ে। আমিও অবাক হলাম। করণ আবি সত্যি সত্যি জানি না। বাবা বললেন, কথনো কথনো এমন তাও ঘটে যায়। (ছফা ২০০০: ৫৪)

এই স্থপু একেবারে ফ্রয়েডের ব্যাকরণ অনুসারে ব্যাখ্যের। ছেলে জানে না তার বিয়ে আজ, বাবা জানেন। বাবার বাসনাই আজ ছেলের বাসনা। মানুষের বাসনা মাত্রেই অপরের বাসনা। এখানে বাবাই দেই অপর। আর পরকে বাংলায় আমরা কৃত সহজেই না বলি ‘পরি’। ‘উপরি’ শব্দের মত ‘অপরি’। তারপর ‘পরি’। এই কাও মাঝে মাঝে নয় হামেশাই ঘটে।

তায়েরাও কি বলছে না একই কথা?

ধরন কোন কারণে আরো একবার যদি আমি জন্মহণ করি, তাহলে নিতান্ত সাধারণ মেয়ে হয়েই জন্মাব। প্রথম নিষ্ঠা সহকারে নিজের জীবনটাই যাপন করব। সেলা জামা পরা অভিলেখের বড় বড় কথায় একটুও কান দেব না। আমি পেটুচের মত বাঁচব। খবে, পরব, সংসার করব—আমার ছেলেপুলে হবে, সংসার হবে, শ্বাসী থাকবে। সেই সংসারের গাঁজি মধোই আমি নিজেকে আটকে দাঢ়াব। কখনো বাইরে পা বাঢ়াব না। (ছফা ২০০০: ৪৩)

দানিয়েলের স্পন্দের পরের অংশ আরো স্বরব্যঙ্গনময়:

আমি বললাম, আবাজান আমার দৈদের চাপকান কই। অন্তত একখানা শাল এ উপরকে আপনি তো আমাকে দেবেন। আমাৰ সমেহে আমাৰ মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, বেটো শাদা শুভ পৰ। আমি বিয়েৰ সময় সাদা শুভ পৰেই বিয়ে কৱেছিলাম। তোমাৰ ভাইকেও শুভ পৰিয়ে বিয়ে দিয়েছি। তিনি আমাৰ হাতে একখানা শুভ সৰৱণ কৱলেন। আমি বললাম, আৰু আমি যে শুভ পৰতে জানি না। বেটো বেহুদা বকে না। পৰিয়ে দেওয়াৰ মানুষেৰ কি অভাৱ! যা ও আঞ্জামে গঠ। আমি বললাম, এ গুড় দিনে আপনি অন্তত একখানা ঘোড়াৰ গাঢ়ি ভাড়া কৰবেন না? আৰু বললেন, বেটো মূল্যবিদেৱ সঙ্গে বেয়াদবি কৰা তোমাৰ মজ্জাগত অভ্যাস হয়ে দাঢ়িয়েছে দেখছি। যাও, আঞ্জামে গঠ। তাৰপৰ তিনি অদৃশ্য হয়ে গোলেন। কোথাও তাঁকে দেবলাম না। (ছফা ২০০০: ৫৪)

এ কেমন আৰুৱা? নিৰাকাৰ (Real) জগতে শাদা মানে শাদাই। আকাৰ জগতে শাদা মানে হয় লালেৰ, নয় কালৱ বৰ্গৱৰীত। চিন দেশে শাদা শোক পালনেৰ চিহ্ন। মুসলমান সমাজে কাফিৰেৰ। যুদ্ধক্ষেত্ৰে শাদা শাস্তিৰ। সাকাৰ বা হৈতেৰ জগতে শাদা প্ৰেমেৰ ছবিও হতে পাৱে। দানিয়েলেৰ স্পন্দে শাদা বাসনাৰ নয়, আবাসনাৰ, ভাবসনোৰ, মৃত্যুৰ নিশাৰ্ব। বাবাৰ সুন্দৰ কাগড়-চোপড়েৰ সঙ্গে ছেলেৰ শাদা শুভতিৰ বৈপৰ্যীতাই জানিয়ে দেয়, এ জগৎ আকাৰ জগৎ, নিশানাৰ দুনিয়া। (ভান পেষ্ট ২০০০: ৪৪) এই বৈপৰ্যীত্য বাসনা ও আবাসনাৰ, রতি ও বিৰতিৰ—একই প্ৰাণেৰ দু বৰকম উৎসাৰণেৰ। কৃপেৰ ও কৃপাত্তিৰে। ফ্ৰয়েডেৰ ব্যাখ্যা অনুসৰে মানুষ বহু দেখে বাসনাৰ চাপ এবং বাসনাৰ পৰপাৱেৰ চাপ—উভয় কাৰণে।

দানিয়েল ব্যান কৰছেন:

কোথাও তাঁকে দেখলাম না। তাৰপৰ দেখলাম, চৰজন মানুষ আমাকেই একটা বাটিয়ায় কৰে আমাদেৱ গ্ৰামেৰ পথ দিয়ে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাৰেৰ কাউকে আমি চিনি না। লোকগুলো আমাৰ বাটিয়া বয়ে নিয়ে যাওয়াৰ সময় সুৱ কৰে বলছে, বল মোমিন, আল্লাহ বল। তাৰেৰ কষ্টেৰ সঙ্গে কষ্ট মিলিয়ে রাস্তাৰ লোকৰাও বলছে, আল্লাহ বল। আমি মনে মনে বললাম, এ কেমন ধাৰা বিয়ে গো। বাজি পোড় না, বাজনা বাজে না, অমনি পায়েৰ দিকে বহুকৰী দুজন লোক কপা কয়ে উঠল। এই লাখটা পাথৰেৰ মত ভাৱি। একে আমাৰ বয়ে নিয়ে মেতে পৰব না। মাথাৰ দিকেৰ বাহক দুজন বলল, না না চল। আৱ তো অংশ পথ। তোমৰা যাও, আমাৰা পাৰব না। তাৱা কৰ্ব থেকে কাতে কৰে আমাকে রাস্তাৰ উপৰ চেলে দিল। আমি ধৰ্মস কৰে মাটিতে পড়ে গেলাম। তন্ত্রা চুঁটে গেল। ইঁটুতে প্ৰচণ্ড চোট লেগেছে। চোখ মেলে চাইলাম, আমি হেঁজেৰে উপৰ শুয়ে আছি। আৱ শৰীৰেৰ সত্ত্ব সত্ত্ব বাথা পেয়েছি। (ছফা ২০০০: ৫৪-৫৫)

৫

ব্যাবিলনেৰ বাদশাহ বখতেনাসাৰ প্ৰকাশ নৰুখনিন্সেৱ (Nebuchandnezzar) একদিন স্পন্দে দেখলেন, একটা বিৱাট শুভি। মৃত্যুটা বিৱাট, অতিশয় তেজোবিশিষ্ট আৱ তাৰ চেহাৰা ভয়ঙ্কৰ। সেই শুভিৰ মাথাটা খাটি সোনাৰ, বুক ও হাত কপাৰ এবং পেট ও রান ব্ৰোঞ্জেৰ তৈৰি। তাৰ পা লোহুৰ এবং পায়েৰ পাতা কিছুটা লোহা ও কিছুটা মাটি দিয়ে তৈৰি ছিল। বাদশাহ যখন তাকিয়ে ছিলেন, তখন দেখলেন একটা পথৰ কেটে নেওয়া হল। কিন্তু তা মানুষেৰ হাতে কটা হয় নাই। সেই পথৰটা লোহা ও মাটি মেশানো পায়ে আঘাত কৰে পা চুৱমাৰ কৰে ফেলল। তখন লোহা, মাটি, ব্ৰোঞ্জ, কপা ও সোনা টুকৰা টুকৰা হয়ে ভেঙ্গে পড়ল এবং গৱমকালে খামারেৰ মেৰোতে পড়ে থাকা তুষ্যেৰ মত হয়ে গেল। বাতাস তা এমন কৰে উড়িয়ে নিয়ে দোল যে তাৰ আৱ কোন চিহ্নই রইল না। যে পাথৰটা শুভিৰে আঘাত কৱেছিল, সেটা বিৱাট পাহাড় হয়ে গিয়ে সমস্ত দুনিয়া দখল কৰে ফেলল। (বাইবেল সোসাইটি ২০০০: ১২৫০-১২৫১)

হজৱত দানিয়েল আলায়হেস সালাম এই স্পন্দেৰ অৰ্থ ব্যাখ্যা কৰলেন। তাৰ আগে ব্যাবিলনেৰ কোন শুণিন, ভূতেৰ ওষ্ঠা, জাদুকৰ কিংবা গণক এৱং অৰ্থ উকাৰ কৰতে পাৱেন নাই। দানিয়েল বললেন: হে মহারাজ, আপনি বাদশাহদেৱ বাদশাহ। বেহেশ্তেৰ আল্লাহ আপনাকে রাজ্য, শক্তি ও সম্মান দাল কৰেছেন। আপনাৰ হাতে তিনি মানুষ, পণ্ড আৱ পাখিদেৱ দিয়েছেন। তাৱা যেখানেই বাস কৰুক না কৈল, তিনি তাদেৱ সকলকে আপনাৰ অধীন কৱেছেন। আপনিই সেই সোনাৰ মাথা।

আপনাৰ রাজ্যেৰ পৰ যে রাজা উঠবে, সেটা আপনাৰ রাজ্যেৰ মত মহান হবে না। তাৰপৰ তৃতীয় আৱ একটা রাজ্য উঠবে, সেটা সেই ব্ৰোঞ্জেৰ পেট ও রান। আৱ গোটা দুনিয়া সেই রাজ্যেৰ অধীন হবে। শেষে লোহাৰ মত শক্ত চতুৰ্থ একটা রাজ্য উঠবে। লোহা যেমন সবকিছু ভেঙ্গে চুৱমাৰ কৰে তেমনি সেই রাজ্য অন্য সব রাজ্যকে ভেঙ্গে চুৱমাৰ কৰবে। আপনি স্পন্দে সে পায়েৰ পাতা ও পায়েৰ আঙুলগুলোৰ কিছু অংশ মাটি ও কিছু অংশ লোহা নিয়ে তৈৰি দেখেছিলেন তা আসলে একটা ভাগ কৱা রাজ্য। তবে আপনি যেমন মাটিৰ সঙ্গে লোহা মেশানো দেখেছেন, তেমনি সেই রাজ্য ও লোহাৰ মত কিছু শক্তি থাকবে। পায়েৰ পাতা ও আঙুল যেমন মেশানো ছিল তেমনি সেই রাজ্যেৰ কিছু অংশ হবে শক্তিশালী ও কিছু অংশ দুৰ্বল। লোহাৰ সঙ্গে মাটি মেশানোৰ অৰ্থ রাজ্যেৰ লোকৰা হবে যেমনো এবং লোহা যেমন মাটিৰ সঙ্গে মেশে না, তেমনি তাৰও এক হয়ে থাকবে না। ঐ সব বাদশাহৰ সময় বেহেশ্তেৰ আল্লাহ এমন একটা রাজ্য স্থাপন কৰবেন, যেটা কখনো ধৰণ হবে না কিংবা অন্য লোকেৰ হাতে যাবে না। সেই রাজ্য ঐ সব রাজ্য চুৱমাৰ কৰে শেষ কৰে দেবে, কিন্তু সেই রাজ্য চিৰকাল থাকবে। এটা হল সেই পাহাড় থেকে কেটে নেওয়া পাথৰ যেটা মানুষেৰ হাতে কটা হয়নি। পাথৰটা লোহা, ব্ৰোঞ্জ, মাটি, কপা ও সোনাকে টুকৰা টুকৰা কৰে ভেঙ্গে ফেলেছিল।

ভবিষ্যতে যা ঘটবে, তা এইভাবে আগ্নাহ তালা মহারাজকে দেখিয়ে দিয়েছেন। (বাইবেল সোসাইটি ২০০০: ১২৫)

দানিয়েল পঞ্চমরের স্পন্দের সঙ্গে আহমদ ছফার দানিয়েল চরিত্রের অনেক খাতির দেখা যায়। দানিয়েলের বন্ধু অর্চনাদেবী। তার এক দূর সম্পর্কীয় দাদা এসেছেন ফ্রাঙ থেকে। তিনি এক সময় অনুশীলন দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তারপর নেতৃত্ব সুভাষ বোসের সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজে ঘোগ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন:

পরিস্থিতি যে রকম দেখা যাচ্ছে, পাকিস্তান ভেঙে পড়তে রাখ্য। বাংলাদেশে একটি ভাগাভিত্তিক জাতীয় রন্ধন হিসাবে জন্ম নিতে যাচ্ছে। এ কথা যদি বলি, আশা করি অন্যায় হবে না। বাংলাদেশ সাধীন হবেই। তারপর ভারতকে একই সন্দেরে মুখোমুখি দোড়াতে হবে। আর্কলি, জাতিগত, ধর্মীয় এবং ভাষাগত বিজিত্ততার দায় মেটাতে গিয়ে ভারতবর্ষের কর্তৃব্যক্তিদের হিমশিম পেতে হবে। এমনকি ভারতের একাও বিপন্ন হতে পারে। (ছফ ২০০১: ১০৪)

ওমেদবাবু নামের এই জানীলোকের যুক্তি ও অভিন্ন:

ভারতবর্ষের বাপারে একজাতিত্ব এবং দ্বিজাতিত্ব কোনটাই যাটে না। আসলে ভারতবর্ষ বহু জাতি এবং বহু ভাষার একটি মহাদেশ। (ছফ ২০০০: ১০৪)

৬

এই প্রবন্দের অঞ্চল পরিসরে আমার কথাটি আপত্তি ফুরোল। ১৯৯৫ সালে খ্যাতনামা উপন্যাসিক আখতারজামান ইলিয়াস অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে যে মন্তব্য করেছিলেন, তার একটা জবাব না দিলে আমার মনের অশ্বাসিটা যাবে না। ইলিয়াস বলেছিলেন:

অনেক সন্তুষ্ণ নিয়েও অন্তর্ভুক্ত কোন উপন্যাসের বস্তুর একটি অংশ বলেই ধৃণ্য হয়, বড়মাপের একটি শিল্পকর্মের মর্যাদা পায় না। (ইলিয়াস ১৯৯৫: ৯)

ইলিয়াসের এই বক্তব্যের ক্ষেত্রে তিনি আমি খুঁজে পাই নাই। তিনি লিখেছেন:

ওকার-এ যেখানে একেকজন ব্যক্তিকে ছফার উর্ধীর্থ করেন বহু মানুষের সংজ্ঞবক্ত শক্তিতে, কেবের কাছে আত্মসমর্পণ করে অন্তর্ভুক্ত উপন্যাসে দেখানে একেকজনের টুকরা অংশগুলোকে ঝুঁড়ে দিয়ে শিল্পী হিসাবে নিজের মাপটিকেই কি তিনি শাট করে ফেলেন না? (ইলিয়াস ১৯৯৫: ৯)

আমার বরং মনে হয় ইলিয়াস নিজেই বিকুল। মীর মশাররফ হোসেনের বিয়দ-সিদ্ধুর সঙ্গে যদি তিনি আহমদ ছফার অন্তর্ভুক্ত উপন্যাসের তুপন্থ দিতেন, একটা যোগ্য কাজ করতেন। মীর যেখানে বাট্টের ভূমিতে মানুষের বাসনার ট্রাইজেডি লিখেছেন,

আহমদ ছফার সেখানে মানুষের বাসনার জমিতে বাট্টের গড়ন ও চলন ব্যাখ্যা করেছেন। মীরের যুগ ও জগৎ আর ছফার যুগ ও জগৎ আলাদা—এ কথা মানি। কিন্তু মীরের পর একমাত্র নজরগুলকে বাদ দিলে আহমদ ছফাই সন্তুষ্ট সবচেয়ে মহান বাঙালি মুসলমান দেখেক।

শ্রাবণ ১৪০৮ || জুনাই ২০০১

বোধিনী

1. Thus, to take nihilism seriously is to commit suicide, to cease completely to act and—consequently—to live. But the radical skeptic does not interest Hegel, because, by definition he disappears by committing suicide; he ceases to be, and consequently ceases to be a human being, an agent of historical evolution. Only the Nihilist who *remains alive* is interesting. (Kojève 1969: 54)
2. সচরাচর ক্রয়েডের মতবাদ বলে বাসনার যে অর্থ প্রচার করা হয় আমরা তা যথার্থ মনে করি না। আমাদের ব্যাখ্যার ভিত্তি ফরাসি মনেবিভাজক পঞ্জিত জাক লাকুর রচনাবলি। (লাকু ২০০৬)

দোহাই

1. আহমদ ছফা, অলাভচক্র (চাকা: শ্রীগ্রুকাশ, ২০০৭)।
2. আখতারজামান ইলিয়াস, ‘ভূমিকা’, আহমদ ছফার পাঁচটি উপন্যাস (চাকা: সুডেন্ট ওয়োজ, ১৯৯৫)।
3. বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, কিতাবুল মোকাদস (চাকা: বি.বি.এস., ২০০০)।
4. Alexandre Kojève, *Introduction to the Reading of Hegel*, Lecture on the Phenomenology of Spirit, assembled by Raymond Queneau, J. H. Nichols, Jr., trans., Allan Bloom, ed. (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1969).
5. Jacques Lacan, *Écrits*, B. Fink, trans. (New York: Norton, 2006).
6. Tamise Van Pelt, *The Other Side of Desire: Lacan's Theory of the Registers* (Albany, NY: State University of New York Press, 2000).
7. Jean-Jacques Rousseau, ‘Discourse on the Sciences and Arts (First Discourse) and Polemics,’ in *Collected Writings of Rousseau*, vol. 2, R.D. Masters and C. Kelly, eds. (Hanover: University Press of New England, 1992).

পরিশিষ্ট

Glories and Ignominies
On Strategies of the Bangladesh Liberation War
1971

Salimullah Khan

1. Whatever happened to the *Muktijuddha*?

The baby sleeps, and all the countryside's at rest,
but the *bargis* have invaded our country.

The *Bulbulis* have eaten all the rice up
How can we pay the tax?

— Gangaram (1965: xxi, translation modified)

The Maratha invasions, or so-called *bargi* raids, of the mid-18th century (April 1742–May 1751) are remembered in all Bengali speaking countryside at least in nursery rhymes, to this day. To the peoples of Bangladesh memories of *bargi* raids are next to nothing compared to the horrors unleashed by the conquering Pakistan army in 1971.

I myself was only 13, growing up in a corner of a small island on the south-eastern coast of Bangladesh, in that fateful year. I still vividly remember the scenes of country people fleeing rape and murder, looting and destruction of the Pakistan army, the fire of their burning homes illuminating the evening sky. In their blood-thirsty and brutal savagery the invading Pakistan army did beat the 17th century Arakan pirates who, in the words of Bernier:

suppressed and carried away the entire population of villages, and married the poor gentiles, and other inhabitants of this quarter at

their assemblies, their markets, their festivals, and weddings, seizing slaves, both men and women, small and great, perpetrating strange cruelties and burning all that they could not take away. (Bernier 1891: 182)

Today, the pejorative Bengali idiom *mager mulluk*—whence the North American vocable ‘mugging,’ a Portuguese contribution to the English language—keeps that memory living. Today’s state of Bangladesh stands indeed a testimonial to the resistance people offered to the depredation and the devastation of an occupation army.

The emergence of Bangladesh as a new state is arguably the most important single development in the history of South Asia since the great European colonial power withdrew, in 1947, from this ancient habitat of mankind. What distinguishes this emergence is the *Muktijuddha*, as the war of liberation of Bangladesh is popularly called.

Pundits and politicians from Pakistan, even today, can hardly understand a thing of whatever happened in 1971. It is because of their obsession with India. A supposed liberal like Benazir Bhutto, on this question too, remains a dutiful daughter of Zulfiqar Ali Bhutto’s. A putative radical of Tariq Ali’s fame continues to call it a ‘civil war.’ (Ali 1983: 91)

In 1971, Hare Krishna Konar, a leader of the CPI (M), condemned All India Radio for calling it a war between East and West Pakistan. (Ghosh 1983: 85) Essentially, as the CPI(M) correctly perceived, it was a confrontation not between the peoples of the two ‘wings’ of Pakistan but between the ruling clique of West Pakistan and the peoples of Bangladesh.

Indian pundits, on the other hand, typically underestimate the role of popular forces in the armed struggle for independence. Sucheta Ghosh summarizes the ruling class viewpoint in India:

There is possibly no denying the fact that without India’s support, co-operation and active help, Bangladesh could not become independent. (Ghosh 1983: 250)

The argument that the liberation of Bangladesh was virtually achieved by the *Mukti Bahini* and that the Indian army only delivered the *coup de grace* is condescendingly brushed aside. (Ganguly 1986: 122)

Yet, the birth of Bangladesh is an outcome of a protracted national struggle, of an immensely popular resistance, an event of revolutionary proportions. A self-reliant national liberation for Bangladesh was not very welcome to India—herself a ‘prison house of nationalities’ and full of fissiparous tendencies. India welcomed, however, developments in Bangladesh as an historical opportunity to let Pakistan disintegrate but much more was at stake.

“The national struggle of Bangladesh,” as Ahmed Sofa said later, “portends the future of many a national struggle in India.” (Sofa 1988: 19) On June 10, 1972 the *New York Times* quoted a Kashmiri leader as saying, “Like the people of Bangladesh we are also struggling to keep our identity as a nation.” (Burke 1973: 409) The ultra-communal *Jana Sangha* of India, which had never accepted the fact of partition and never gave up the hope of reunification, used to view the Bangladesh struggle largely in that light. Hindu communalists and many ideologues of the secularist Congress Party too agreed in their observation that Bangladesh proved the ‘untenability of the two-nation theory’ on which the claim for the Partition of the sub-continent was based.

Bangladesh, as a matter of fact, negated the theory that India was a single nation as clearly as it refuted Jinnah’s two-nation hypothesis. Bangladesh spoke of, possibly, a ‘theory of many nations’ in the sub-continent. If that nascent state fell in the hands of the lefties, or worse in the hands of the pro-Chinese, it could be a disaster. India, thus, had to intervene!

If, with all the brakes on, the birth of Bangladesh is a revolution, then the sum of whatever happened in a couple of decades afterwards is surely counter-revolutionary. The counter-revolution usurped the state and pushed society back behind its point of departure.

What seems to have been overthrown in Bangladesh now is not successive dictatorships but those democratic concessions which were rung from the ruling order by a protracted national struggle, by a national war of attrition. It remains to be explained—to paraphrase Marx—how a nation of so many millions can be surprised and delivered unresisting into captivity by so few swindlers? That is the question pursued here.

An intrepid historical analysis of the national movement that arose in East Bengal after 1947 as well as the armed struggle for national liberation in 1971 is a condition *sine qua non* before we can even hope to understand post-liberation developments. Rumors to the contrary notwithstanding, we would maintain, in analyzing the historical experience of Bangladesh, Marx's and Engels' statement—‘the history of all hitherto existing society is the history of class struggles’—remains a very useful guiding thread. In particular, we would argue, the present maladies of Bangladesh are the direct and indirect outcomes of latent class struggles within the national liberation movement and in course of the armed struggle for national liberation.

Indian intervention proved decisive not for the attainment of independence as such, but for ensuring the dominance of those forces in the Bangladesh struggle who were decisively pro-Indian, anti-Pakistani as well as anti-communist. Indian military intervention hastened Bangladesh's birth process—so goes the thrust of the argument in favor of her intervention. It seemed, for a while, that such a hastening was in the interest of the Awami League, the leading bourgeois party in the national movement. “The values for which the victorious Awami League stood” said Indira Gandhi in a parliamentary speech on 27 March, 1971, “were our values.....” (Gandhi 1972: 9–10)

2. National struggle: A tale of two currents

Some most remarkable things about the national movement in East Bengal were, first, that it was a movement for the rights of the majority of a country's population suppressed by a ruling clique representing an ethnic minority. Secondly, the movement grew very early in the history of the unfortunate post-colonial state of Pakistan.

“A feeling is growing among East Pakistanis,” it was said in the Pakistan Constituent Assembly Debates, as early as 24 February 1948, “that East Pakistan is being neglected and treated merely as a colony of Western Pakistan.” (Ghosh 1983: 13) Confrontation on the question of state language was a part of that growing feeling. In the beginning it was the Pakistan National Congress and the Communist Party of Pakistan, both

of which where minority parties, took up the cause of national rights of East Bengal.

Though the Awami Muslim League was formed at the initiative of the peasant leader Maulana Bhasani yet many communists did not agree to work within the party because its name still smacked of communalism. Growth of a non-communal (secular) concept of culture and of the state was *concomitant* with the growth of the national movement in East Bengal.

The communist forces had been in the vanguard of the anti-communal forces in undivided India as well as in Pakistan and India after Partition. In the 1950s and 1960s the national movement acquired a ‘secular’ character mostly because of the communists. Communist dominated organizations, the Youth League, *Ganatantri Dal* etc. and followers of Maulana Bhasani in the Awami League played a leading role in the United Front that routed the Muslim League in 1954.

The dismissal of the United Front ministry of A.K. Fazlul Huq took place on an alleged ground of the Chief Minister's statement that ‘independence’ of East Pakistan would be one of the first tasks to be taken up by his ministry. Fazlul Huq claimed he actually spoke of ‘autonomy.’ (Ghosh 1983: 40)

The well known theory of ‘two economies in Pakistan,’ first expounded by the East Bengal Government's chief statistician A. Sadeque at the Chittagong Conference of Pakistan Economic Association in 1956, insisted that each region of Pakistan should be allowed to have control over its own revenues and foreign exchange earnings and should be permitted to enter into trade pacts with other countries and to adopt monetary and fiscal policies consistent with the growth of its own economy. It was specifically suggested that to remove disparities, resources should be allocated not only on the basis of population, but of population weighted by the inverse ratio of *per capita* income. The population and *per capita* income ratios, around that time, being supposed to have been 54:46 and 1:1.25 respectively, the development resources claimed to be made available to the East was $54 \times 1.25 = 67.5$. (Sayeed 1967: 202)

Maulana Bhasani in his speech at the Awami League Council at the historic *Kagmari* Conference (February 1957) warned if

the exploitation of East Pakistan was not brought to an end the people might at one stage rally for separation. He demanded regional autonomy and establishment of naval headquarters in East Pakistan. (Sen Gupta 1974: 103)

A non-treasury member, Prof. Muzaffar Ahmed, moved a regional autonomy motion in the East Pakistan Provincial Assembly on 3 April 1957. The motion was adopted unanimously on the next day.

On the same day the motion was passed, H.S. Suhrawardy, Prime Minister of Pakistan and one of the senior leaders of the Awami League's described the resolution on provincial autonomy as an act of 'stunt.' He called upon the peoples of Pakistan to resist if anyone forced the issue. He did not agree that provincial autonomy was a demand of the peoples of East Pakistan. "What do the people care to know about this when their own leaders can not define it?" asked Suhrawardy. (Sen Gupta 1974: 108)

On 5 April, Maulana Bhasani placed on the table before pressmen a written pledge given by Suhrawardy on 26 April 1955. Suhrawardy had promised in that pledge that he would abide by the 21 Points programme of the United Front in which the demand for East Bengal's regional autonomy was included. (Sen Gupta 1974: 109)

Sheikh Mujib's role as the cudgel of Suhrawardy's at that point was to force the Maulana, the Awami League President, to form a new party in order to be able to agitate on issues of regional autonomy and of anti-imperial military pacts. Isn't it a strange irony of history that in less than a decade, the cudgel of an erstwhile anti-autonomist Suhrawardy should now appear as the champion of a Bengali nationalism recharged and redeployed and that an old unbending Maulana Bhasani would now be opposing him on the same ground? Jyoti Sen Gupta notes:

The role that Suhrawardy played during his short tenure as Prime Minister was suicidal to him, damaging to the Awami League and fatal to the democratic forces of Pakistan. ... If Suhrawardy pulled courage and identified himself with the mass sentiment, autonomy or even independence for East Pakistan could have been won earlier. (1974: 101-102)

As Sheikh Mujib and Manik Mian, two of Suhrawardy's worthy lieutenants, learnt from Bhasani's militant nationalism, the Maulana, in his turn, unlearnt some of his own lessons under the spell of an anti-imperialist politics dangerously misinterpreted. From the time of his October 1963 visit to China through the conclusion of the Tashkent Treaty between Pakistan and India, Maulana Bhasani regrettably repeated some of Suhrawardy's capitulations to the ruling clique of Pakistan. "If at the present moment you continue your struggle against the Ayub Government," Mao told him as Bhasani reminisced, "it will only strengthen the hands of Russia, America and India." (Ali 1970: 140)

The split in the ranks of the national movement for self-determination in 1957 on the grounds of Suhrawardy's betrayal was now complete with only the roles reversed. According to Sucheta Ghosh, "the interests of India were clearly involved in the struggle which arose in East Pakistan between nationalism and Maoism." (Ghosh 1983: 31) The fact that India didn't invade East Pakistan in 1965 was interpreted differently by the two currents. 'The NAP (National Awami Party led by Maulana Bhasani, thought,' writes Pran Chopra,

that India did not attack the East in 1965 because of fear of a counter intervention by China. The Awami League thought India was acknowledging in this way that she expected and desired friendly relations with East Bengal when it came to its own as India expected it would one day. (1973: 63)

India's Sinophobia led to various conspiracy theories of the Maoist communists including a plan to set up a 'People's Republic of Bengal' comprising the eastern states of India and the eastern wing of Pakistan. Indian ruling classes, in turn, grew particularly apprehensive of a possible collaboration between the Maoist revolutionaries of East Pakistan and those of the eastern states of India.

Pradip Bose, known as a nephew of the legendary Subash Bose, vented the Indian fantasy in a booklet titled *Sino-Pak Collusion and East Pakistan* in 1966. Bose wrote: "...the most important goal of Communist China, and which is not widely known, is to acquire a foothold in East Pakistan." Summarizing the fear of Indian ruling classes Bose fantasizes:

If East Pakistan could not be kept under their control, then they (the Pakistanis) would prefer that the control should shift [the] to pro-Chinese rather than to [the] pro-Indian elements. (Bose 1966: 17; Ghosh 1983: 30)

"With this plan in view" continued Bose, "the doors of East Pakistan were opened up for the Chinese influence to come in." (Bose 1966: 18; Ghosh 1983: 30) Pradip Bose along with Ajit Roy, a veteran comrade of Subash Bose's, founded in 1968 an organization called 'Purba o Pashchim Bangla Sampriti Samiti' "with obvious support of the Indian Government" and put out, among other things, a journal called *Epar Bangla Opar Bangla*. (Ghosh 1983: 32)

When in March 1966 Sheikh Mujib took Maulana Bhasani's fallen banners up and articulated demands of the rising national movement in the shape of the justly famous Six Points programme, Ayub Khan lost no time in discovering a conspiracy to found a 'Greater Sovereign Bengal' there and put Sheikh Mujib behind the bars without delay. Ayub tried both to suppress the national movement and to confound the Indian ruling classes by that single stone of Greater Bengal.

Knowing Sheikh Mujib as he did, the Maulana suspected the existence of an imperialist intrigue. The Maoist revolutionaries of East Bengal characterized, I would think correctly, the Six Points programme as representing interests of the emerging bourgeoisie in East Pakistan. But at the same time they incorrectly condemned the effort condemned it as an attempt to disintegrate Pakistan. Bhasani realized his mistake soon and joined the anti-Ayub fray.

In January 1968, the Agartala Conspiracy Case—so called because it was supposed to have been organized at Agartala (in the Eastern Indian State of Tripura) by Indian officers Lt. Col. Mishra, Major Menon *et al.* in touch with the Indian High Commission in Dhaka—was lodged implicating Sheikh Mujib and many others, mostly civil servants and army officials, from East Pakistan. Maoist revolutionaries believed, in the existence of that conspiracy and believed moreover, that the US, besides India, was involved. (Saha 1973: 94)

The movement launched jointly by the Student Fronts of the Awami League and the communists under the banner of

an 11 Points programme—Maulana Bhasani blessed it—forced Ayub to release Mujib. The Sheikh quickly picked up the 11 Points. Nationalization clauses along with sundry radical demands of the 1970 Awami League manifesto were, it is believed, injected there right from the 11 Points programme. Many in the Awami League actually "had risen up the ladder under the benediction of the Ayub regime" and "felt the need to restore their political cover and sought to buy their way into the party" (Sobhan and Ahmed 1980: 87) And thus the bandwagon rolled on.

Soon after the elections, more than three months ahead of the so called military crackdown, that genocidal attack by the Pakistan army on the unarmed population of East Pakistan, Maulana Bhasani announced his decision to organize a movement for an independent East Pakistan. (Ghosh 1983: 94)

The Awami League was partly financed by members of the East Bengal bourgeoisie but in course of the 1969 mobilization the party gained a substantial foothold among the rural population and the urban petty bourgeoisie. In 1971, the Bengali bourgeoisie, mainstay of the Awami League, had owned about 900 qualified industrial enterprises (with assets up to 2.5 million rupees each) out of the 3,130 existing in the country, as well as about 100 construction and a few other firms. (Gonkovsky 1974: 223) About 40 large Bengali groups with assets of over 25 million rupees and half of them with assets of over 50 million rupees were active. (Gonkovsky 1974: 223) Many of them, however, collaborated with the Pakistan army during the war.

By the end of the 1960s a rural upper crust, or the *Kulaks*, in Bangladesh numbered 190,000 families owning land ranging from 12-25 acres and 20,000 families owning land from 25-50 acres. A relatively small group of land owners—about 4,600 families, owning land from 50-150 acres, appeared in the wake of Ayub Khan's anti-reforms measures in 1959. Along with the *Kulaks* this group of mostly absentee landowners was, right up to 1971, the principal social support of the Pakistani ruling class. (Gankovsky 1974: 221)

In the late 1940s, the countryside was dominated by about 14,000 families of zamindars and by about 200,000 families of

various rent receiving interests. Most, but not all, were Hindus. The Hindu landed gentry migrated to India but Muslims, immigrants and others, settled down in the towns. In the 1960s, most of this landed gentry displayed an oppositional sentiment and served on the right flank of the national movement.

3. Two Strategies

The basic political line of the Awami League was the demand for full regional autonomy and the party could not overcome its own indecision over the question of going any further until the fateful night of 25 March 1971.

Despite knowing fully well that the Pakistani rulers were taking absolute preparation for an attack and despite being approached for guidance on three separate occasions between 3 and 25 March by Bengali members of the armed forces who had no illusions about what was coming, Sheikh Mujib could not chalk out any course of action. (Mascarenhas 1971: 97)

Suggestions to the effect that the Awami League leader delivered himself into captivity for fear of greater reprisals may not be entirely naive but it makes a lot more sense to assume that he could not give up the hope to pull off some kind of a deal with Islamabad until it was too late.

"If they take the decision to fight I shall be pushed out of power and the Naxalites will intervene in my name. If I make too many concessions, I shall lose my authority," said the Sheikh in an interview published on 31 March 1971 in *Le Monde*. (Ali 1984: 90)

The indecision and the lack of coordination were clearly manifest in the declaration of independence by a junior Bengali officer from Chittagong, namely Ziaur Rahman, who formed a government with himself as Head of State on 27 March 1971 and invoked the authority of Sheikh Mujibur Rahman the next day. (Hasan 1986: 5)

The first phase of resistance—lasting from March to May—was marked by spontaneity, positional warfare and the inevitable retreat toward the Indian border. The need for resorting to guerilla warfare by the Bengali members of the

armed forces, who numbered about 10,000, was realized in this phase. Resistance groups were organized regionally throughout the country through the efforts of sundry political workers, armed forces personnel and the local administration. Though the common name *Mukti Fouj* was used in the first couple of months, there was no coordination with the provisional government formed by Awami League leaders.

There was no clear idea about the strategy and tactics of fighting either. Arms and ammunition supply fell far short of need. The main method of fighting employed was the destruction of lines of transport and communication hindering movement of the marauding soldiers. Maoist peasant revolutionaries in Northern Bangladesh reportedly did a much better job of guerrilla warfare even in the early period. (Ali 1983: 92) But some Maoists chose not to fight.

The Awami League proved itself totally helpless in organizing the task of resistance. Moreover, it seemed happy about being able to rely on India. A new government was formed 'at a secret conclave somewhere in Bangladesh' on 10 April. This government superseded Ziaur Rahman's provisional government. Within a mile of the Indian Border Security Force's outpost at *Hridaypur* lies the village of *Bhaberpara* (*Baidyanathitala* as per some accounts, e.g., Shamsuzzaman 1986; Puchkov 1989) in what was then the Kushtia district. It was there that the new government was formally launched.

The demand for formation of a National Liberation Front raised by non-Awami League pro-liberation parties, was not conceded; instead a 'Five Party Consultative Committee' was announced on 8 September.

A number of left groups which did not acknowledge the leadership of the Awami League formed on 15 July a 'National Liberation Struggle Co-ordination Committee' pledged to carry on the armed struggle relentlessly and to resist all compromise in their pursuit of the partisan war. This move was denounced by the Awami League and the provisional government. (Ghosh 1983: 95) The *Mukti Fouj* was by now renamed the *Mukti Bahini*.

During the second phase of the struggle—i.e. from June to October—a Central Command was created, the entire country was divided into various sectors, and the question of strategy was hotly debated, politically as well as militarily. In this phase,

formidable political difficulties arose. V. Puchkov, a Soviet observer, wrote:

the leadership of the Awami League tried to take under its full control both the military as well as the ideological training of the volunteers in the camps, in this way aiming at creating armed forces loyal to their party. (Puchkov 1989: 13)

Formidable obstacles were placed on the way of young people willing to join the *Mukti Bahini* and elements of the left were weeded out mercilessly. Arguments placed in favor of adopting a strategy of protracted guerilla warfare by some of the sector commanders (Abu Taher for example) was repressed.

The decision to raise a regular army of conventional type to be supplemented by guerrilla units was taken. More than 250,000 volunteers were undergoing training at this period, more than 100,000 of whom actually took part in operations inside Bangladesh. (Moniruzzaman 1980: 113, 55)

The formation of a special force—*Mujib Bahini*—under the command of India's military intelligence agencies raised serious questions about the aims of the host government and posed considerable threat to the unity and integrity of the liberation forces. It was, anyway, understood to be an elite force raised to face the eventualities of a war of attrition where the communists traditionally had a better chance to dominate.

The training of non-Awami League groups were kept under strict surveillance. As it turned out, by November, the number of pro-Soviet left fighters reached 15,000 and that of the pro-Chinese forces, according to what the Indian General B.N. Sarkar later told the world, only 2000 to 3,000. (Hasan 1986: 107)

The most formidable danger in this phase came, however, from the right wing of the Awami League High Command. Foreign Minister of the provisional government Khondoker Mushtaq Ahmed's attempts to persuade the Awami League rank and file and goading them to withdraw the demand for independence in the name of saving the *Bangabandhu*'s invaluable life proceeded on from as early as 30 July with the help of the American Consulate in Calcutta. State Department files obtained later confirmed the conspiracy. (Lifschultz and Bird 1979: 114-117; Sission and Rose 1990: 193-194)

The third phase of the liberation war saw the *Mukti Bahini* advancing from resistance to offensive, forcing the enemy to confinement within the safety of the barracks. By November, nearly 30,000 fighters were active in the Dhaka region and its surroundings alone. According to certain sources, over 25,000 Pakistani soldiers and officers were killed between April and November. (Puchkov 1989)

The successes of the *Mukti Bahini*, habitually underestimated by Indian observers (e.g. Ganguly 1986), were formidable however. Siddiq Salik, an officer of the occupation army, writes:

They (the *Mukti Bahini*) were fairly active both on the borders and in the interior, backed by Indian troops and artillery, they mounted pressure on the border outposts and fomented trouble in important towns and cities. This dual attack overtaxed our resources and our mental energies. (Salik 1977: 100)

The Indian invasion comes precisely at the moment when the *Mukti Bahini* was making greatest advances. According to Abu Taher, commander of the 11th sector until November when he gets seriously injured in combat, "16 December did not appear as a natural victory to the *Muktijoddhas*."

To Taher, "the 16th day of December was an outcome of the impatience of bankrupt politics." (Taher 1981) It may be that it is in their own class interest that the bankrupt politics let the liberation war of Bangladesh turn into what Pran Chopra later mused as 'India's second liberation.'

4. Results and Prospects

Whatever happened to the liberation fighters afterward's is legion. The provisional government's decision to form a national militia comprising all freedom fighters, listed as well as unlisted, besides the conventional armed forces and the decision to form an 11 member National Control Board for the militia proved truly provisional. The Control Board formed on 2 January 1972 included the four non-Awami League members of the Five Party Consultative Committee—Maulana Bhasani, Moni Singh, Muzaffar Ahmed and Monorjon Dhar. Two representatives of

the *Mujib Bahini*—Tofael Ahmed and Abdur Razzaque—were also included.

Together with other major policy directions of the Tajuddin government, such as its stand on not welcoming United States 'aid,' development of a coalition approach to national reconstruction, this decision too was reversed before long. The national militia was now replaced by a *Rakkhi Bahini*, a kind of surrogate *Mujib Bahini*, soon after Sheikh Mujib's return from Pakistan. Freedom fighters got disarmed and were instead offered a Welfare Trust, some trade licenses and an uncertain social order.

In both his speeches made at the Dhaka airport on 22 December 1971 and at the Government Secretariat the next day, the provisional government's Prime Minister Tajuddin Ahmed declared that the reconstruction programme of the country would be guided along by the three principles of Socialism, Democracy and Secularism, whatever he might have meant by these signifiers. (Hasan 1986: 254)

It seems that the principle of nationalism—the would be first principle—was a contribution of Sheikh Mujib's. The bandwagon now becomes the snob. It rolled on for a while before heeting its first holiday resort.

Voice of Bangladesh, Vol. 1, No. 1
New York, March 1993.

References

1. Tariq Ali, *Pakistan: People's Power or Military Rule?* (London, 1970).
2. Tariq Ali, *Can Pakistan Survive?* (Harmondsworth, 1983).
3. François Bernier, *Travels in the Mughal Empire*, A. Constable, trans. (Westminster, 1891).
4. Pradip Bose, *Sino-Pak Collusion and East Pakistan* (Calcutta, 1966).
5. S. M. Burke, *Pakistan's Foreign Policy* (Karachi, 1973).
6. Pran Chopra, *India's Second Liberation* (Delhi, 1973).
7. Indira Gandhi, *India and Bangladesh* (New Delhi, 1972).
8. Gangaram, *The Maharastra Puran* (1748), E. C. Dimock, Jr. and P. C. Gupta, eds. and trans. (Honolulu, 1965).

Glories and Ignomries

9. Sumit Ganguly, *The Origins of War in South Asia* (Boulder, CO, 1986).
10. Y. V. Gankovsky, 'The Social Structure of Society in the People's Republic of Bangladesh,' *Asian Survey*, Vol. xiv, No. 3, 1974).
11. Sucheta Ghosh, *The Role of India in the Emergence of Bangladesh* (Columbia MO, 1983).
12. L. Lifschultz with K. Bird, *Bangladesh: The Unfinished Revolution* (London, 1979).
13. T. Maniruzzaman, *The Bangladesh Revolution and its Aftermath* (Dhaka, 1980).
14. A. Mascarenhas, *The Rape of Bangladesh* (Delhi, 1971).
15. V. P. Puchkov, *Political Development of Bangladesh, 1971-1985* (New Delhi, 1989).
16. R. Sisson and L. Rose, *War and Cessation: Pakistan, India, and Bangladesh* (Berkeley, CA, 1990).
17. R. Sobhan and M. Ahmed, *Public Enterprise in an Intermediate Regime* (Dhaka, 1980).
18. Siddiq Salik, *Witness to Surrender* (Karachi, 1977).
19. K. B. Sayeed, *The Political System of Pakistan* (Lahore, 1967).
20. J. Sen Gupta, *History of Freedom Movement in Bangladesh: 1947-1973* (Calcutta, 1974).
21. মন্দদল হাসান, মুলধারা '৭১ (ঢাকা, ১৯৮৬)।
22. ইন্দু সাহা, পূর্ব বাংলার গণ আন্দোলন ও শেখ মুজিব (কলকাতা, ১৯৭৩)।
23. কে. শামসুজ্জামান, আমরা আধীন হলাম, ২য় সংস্করণ (ঢাকা, ১৯৮৬)।
24. আহমদ ছফত, শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য প্রবক্ত (ঢাকা, ১৯৮৮)।
25. আবু তাহের, 'মুক্তিযোদ্ধারা আবার জয়ী হবে,' যে তাহের জনতার সে মরে নাই (ঢাকা: ১৯৮১)।